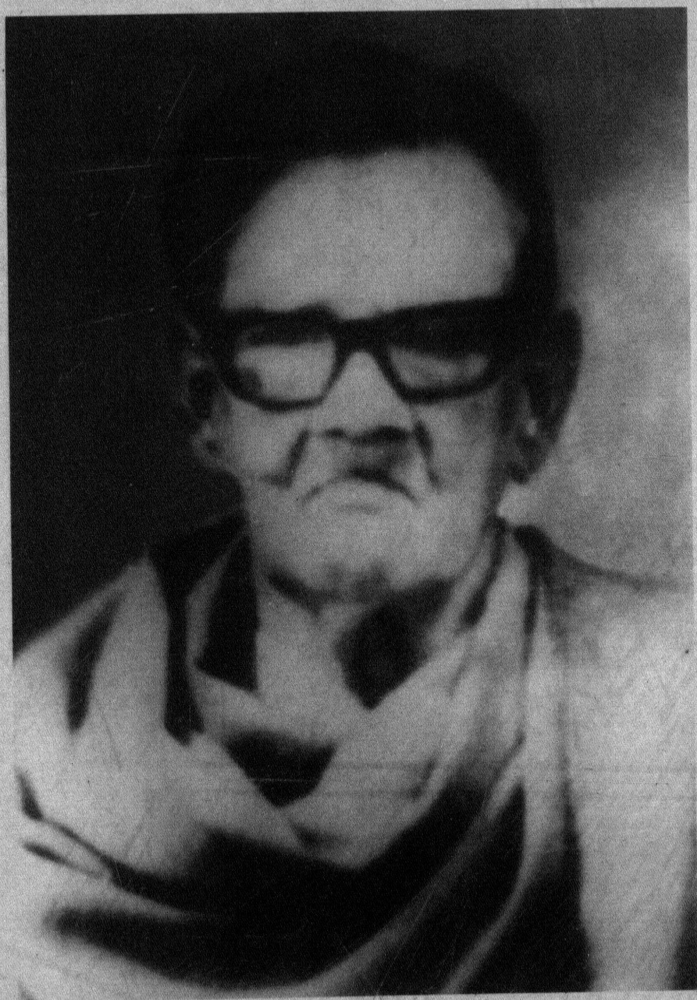


তারাপদ লাহিড়ী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম
ও
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

তাবাপদ লাহিড়ী

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৮৬

প্রকাশক ঃ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২
টাইপসেট ঃ অভিনব মুদ্রণ
৭২, শরৎ বসু রোড, কলকাতা-৭০০০৬৫
মুদ্রক ঃ দেজ অফসেট
৩/২, মঠেশ্বরতলা রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬

উৎসর্গ

আমার প্রিয়তমা সহধর্মিণী
শ্রীমতী কল্যাণী লাহিড়ীকে
আমার বাধাবিঘ্নসঙ্কুল কর্মপথে
তাঁর সেবা প্রেম ভালবাসা মিশ্রিত
নিয়ত ও অকুণ্ঠ সাহচর্যের স্মারক স্বরূপ
আমার এই লেখনীর ফসল।

শ্রী তারাপদ লাহিড়ী

সূচীপত্র

ভূমিকা

ইউরোপের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে উক্ত মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলিতে ন্যাশনালিজ্‌মের জোয়ার আসে নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায়। বিশেষত যখন তিনি সম্রাট বলে নিজেকে অভিষিক্ত করেন ও বিভিন্ন বিজিত দেশে নিজের আত্মীয়দের রাজসিংহাসনে বসান। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদ সেখানেই তার প্রতিবাদস্বরূপ জাতীয়তাবাদ। থীসিস যদি হয় ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ তবে অ্যান্টিথীসিস হচ্ছে ন্যাশনালিজ্‌ম্।

কুইন ভিক্টোরিয়াকে যখন ভারতের এমপ্রেস্ বলে ঘোষণা করা হয় তখন ব্রিটিশ শাসনের ইম্পিরিয়ালিস্ট চেহারা প্রকট হয়। তার কিছু দিন পরেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। সূচনা থেকেই কংগ্রেস হচ্ছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের অ্যান্টিথীসিস। আর কংগ্রেসের মতবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিপরীত জাতীয়তাবাদ। ইংলন্ডের প্রথা অনুসারে অপোজিশনই একদিন গভর্নমেন্টের আসনে বসে। অপোজিশন মানেই অল্টারনেটিভ গভর্নমেন্ট। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ধরে নিয়েছিলেন, যে-নিয়ম ইংলন্ডে খাটে সে-নিয়ম ভারতেও খাটবে। ক্ষমতার হস্তান্তর নির্বিবাদেই ঘটবে। ইংরেজ যাবে, কংগ্রেস আসবে, তৃতীয় কোন পক্ষ উত্তরাধিকার দাবি করবে না, তার জন্যে লড়বে না। ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের বন্দোবস্তই যথেষ্ট। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই স্যার সৈয়দ আহমদ্ বেসুরো আওয়াজ তোলেন। কংগ্রেস হচ্ছে বাঙালী হিন্দু উকীল ব্যারিস্টারদের প্রতিষ্ঠান। ভারতের মুসলমান কখনো বাঙালী বাবুদের শাসন মাথা পেতে মেনে নেবে না। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন না, তাঁর সম্প্রদায়কেও যোগ দিতে বারণ করেন। তা হলে কি ইংরেজরাই চিরকাল ভারত শাসন করবে? ভারতীয়রা কোনো দিনই স্বরাজ লাভ করবে না? স্যার সৈয়দের মনোভাবটা হলো যেমন করে হোক হিন্দু মেজরিটিকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তার মানে যদি হয় চিরস্থায়ী ব্রিটিশ শাসন তবে তাও শ্রেয়।

ধীরে ধীরে এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। মুসলমান প্রধানরা কংগ্রেসে যোগ না দিলেও মুসলিম লীগ বলে একটা পাল্টা সংগঠন স্থাপন করেন। তাঁদের অবস্থানটা ইংরেজ ও কংগ্রেস এই দুই শক্তির মাঝখানে। তাঁরাও তৃতীয় এক শক্তি। তাঁরা এক হাতে ইংরেজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবেন, আরেক হাতে কংগ্রেসের সাথে বন্দোবস্ত করবেন। কোনো পক্ষের সঙ্গেই লড়বেন না। না ইংরেজের সঙ্গে, না কংগ্রেসের সঙ্গে। কংগ্রেস যদি কিছু আদায় করে তবে তাঁরাও তাতে ভাগ বসাবেন। কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেবেন না।

এই যে বেড়ার উপর বসে থাকার নীতি এর কিছুটা পরিবর্তন হয় জিন্না সাহেবের উদ্যোগে। তিনি কংগ্রেসেরও সভ্য, মুসলিম লীগেরও সভ্য। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি কংগ্রেসে আছেন কেন?' এর উত্তরে তিনি বলেন, 'ভারতীয়দের জাতীয় স্বার্থে।' আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তাহলে আপনি মুসলিম লীগে আছেন কেন?' এর উত্তর, 'মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থে।' জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে জিন্না সাহেব গান্ধীজী বা জওহরলালজীর মতোই

সচেতন ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় নাছোরবান্দা। কংগ্রেস থেকে তাঁর সরে যাবার কথা নয়। তিনি গেলেন, যখন কংগ্রেস পার্লামেন্টারি রাজনীতি ছেড়ে কারাবরণের পন্থা অবলম্বন করে।

লোকমান্য তিলকের সঙ্গে মিলে জিন্না সাহেব ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে যে কংগ্রেস-লীগ চুক্তির ঘটকালী করেন, সেই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন। ইংলন্ডে এ জিনিস নেই। কিন্তু ভারতে এ জিনিস অত্যাবশ্যক। এই হল জিন্না সাহেবের মূলনীতি। এই নীতিতে তিনি আজীবন অটল ছিলেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরবর্তী ধাপ কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন। জিন্না সাহেব প্রত্যাশা করেছিলেন যে তার আগে আরো একবার কংগ্রেস-লীগ চুক্তি হবে ও তিনিই করবেন ঘটকালী। যদিও কংগ্রেসের নবপর্যায়ে তিনি তার সদস্য নন।

তিনি যদি কংগ্রেসের ভিতরে থাকতেন তা হলে কী হতো না হতো তা কল্পনা করা বৃথা। কিন্তু কংগ্রেসের বাইরে গেলেও তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে শত্রুতা করবেন না। কেন্দ্রীয় আইন সভায় একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি। তার সভ্যদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন, পার্শীও ছিলেন, মুসলমান তো ছিলেনই। এঁরা কখনো কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিতেন। কখনো সরকার পক্ষে ভোট দিতেন। পার্লামেন্টারি রাজনীতির বাইরে যেতেন না। মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র একটা রাষ্ট্রের চিন্তাও করতেন না। জিন্না সাহেবের অবস্থান ছিল আগের মতোই। তিনি জাতীয় স্বার্থে সরকারের সঙ্গে আইনসভায় লড়তেন। আর সাম্প্রদায়িক স্বার্থে চৌদ্দ দফা দাবি ইত্যাদি পেশ করতেন। আর ওদিকে কংগ্রেস আইনসভার বাইরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অহিংস উপায়ে লড়ছে। সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনগণকে জাগাচ্ছে। বছরের পর বছর কারাগারে কাটাচ্ছে। মার খাচ্ছে। জরিমানা দিচ্ছে। লীগ বহির্ভূত বহু মুসলমান কংগ্রেসের কৃচ্ছ্রসাধনায় যোগ দেন। জেলে যান, মার খান, জরিমানা দেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এঁদের প্রতিপত্তি লীগপন্থীদের চেয়ে বেশী। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারেও এঁদের খাতির কম নয়।

চাকা ঘুরে যায় ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়। জিন্না সাহেব ইতিমধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করেছিলেন। তিনিই তার দলপতি। লীগের টিকিট পাওয়া প্রার্থীরা কংগ্রেসের টিকিট পাওয়া মুসলিম প্রার্থীদের কাছে বহু ক্ষেত্রে হেরে যান। মন্ত্রিমন্ডলী গঠনের সময় কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের স্থান দিতে কংগ্রেস নীতিগতভাবে বাধ্য। অথচ জিন্না সাহেবের দাবি হলো কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র লীগপন্থী মুসলমানদেরই স্থান দিতে হবে। কংগ্রেস-লীগ চুক্তির সব আশাই এই পাহাড়ের গায়ে ঠেকে চূর্ণ হলো।

কংগ্রেস-লীগ চুক্তি না হলে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন হবে কী করে? তা হলে কি কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন কোনোদিনই হবার নয়, ইংরেজ শাসনই চিরস্থায়ী হবে? জিন্না সাহেব উপলব্ধি করেন যে সেটাও বাঞ্ছনীয় নয়। তা হলে কোনটা বাঞ্ছনীয়? মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান। হিন্দুদের জন্যে হিন্দুস্থান। পাকিস্তান চাইলেই তো পাওয়া যায় না। আন্দোলন করতে হবে। মুসলিম লীগ যুদ্ধের মাঝখানে আন্দোলন চালায়। যুদ্ধের শেষে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে পাকিস্তানের ইস্যুতে প্রায় সব ক'টা মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে জয়লাভ করে। পাকিস্তানের দাবি দুর্বার হয়ে ওঠে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম অবশেষে সফল হয়। কিন্তু সাফল্যের পূর্বক্ষণে দেখা গেল জাতীয়তাবাদবিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আর সেই সংগ্রামের নেতা আর কেউ নন, একদা জাতীয়তাবাদী জিন্না। তাঁর মতে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তার মুখোশ। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জাতি বলে কোনো জাতি নেই, আছে হিন্দু জাতি ও মুসলিম জাতি। হিন্দু জাতীয়তাবাদ যদি থীসিস হয় তো মুসলিম জাতীয়তাবাদ হচ্ছে অ্যান্টিথীসিস। এই অভিনব থীসিসের সঙ্গে অভিনব অ্যান্টিথীসিসের সংগ্রাম সেইদিনই সমাপ্ত হবে যেদিন ভারত দুই পক্ষের মধ্যে বিভক্ত হবে। একভাগ হিন্দুস্থান ও অপরভাগ পাকিস্তান। পাকিস্তানের জন্যে তিনি এইসব প্রদেশ দাবি করেন যেসব প্রদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তার সঙ্গে ওয়েটেজ হিসাবে জুড়ে দেন আসাম, যেখানে হিন্দু ও উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই যে ওয়েটেজ নামক বস্তুটি এটি জিন্না সাহেবের পেটেন্ট উদ্‌ভাবন। তিনিই এটিকে নিয়ে আসেন ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও লীগ দুই দলের পাশাপাশি অধিবেশনে। যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সে সব প্রদেশে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইনসভায় ওয়েটেজ দেওয়া হয়। তেমনি, যেসব প্রদেশে অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সে সব প্রদেশে অমুসলমানদের প্রতিনিধিদেরও দেওয়া হয় আইনসভায় ওয়েটেজ। সেটা ছিল প্রাদেশিক স্তরের ব্যাপার। কেন্দ্রীয় স্তরের নয়। কেন্দ্রীয় স্তরের কথা তখনো কারো মাথায় আসেনি। কেউ কমিটমেন্ট করেনি।

বিশ বছর পরে যখন কেন্দ্রীয় স্তরে ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা দেখা দিল তখন ওয়েটেজ বস্তুটা হয়ে যায় একতরফা। কংগ্রেসই ওয়েটেজ দেবে, লীগ শুধু নেবে। একটা কেন্দ্র না হয়ে যদি দুটো কেন্দ্র হতো তা হলে কংগ্রেসও লীগের কাছ থেকে ওয়েটেজ পেত। লীগই যে শুধু নিত তা নয়, সেও দিত। আদান প্রদানের দুটি মুখ খোলা রাখার জন্যেই দুটি কেন্দ্রের আবশ্যকতা অনুভব করেন জিন্না। একটি কংগ্রেসশাসিত কেন্দ্র, অপরটি লীগশাসিত কেন্দ্র। একটিতে মুসলমানরা পাবে ওয়েটেজ, অপরটিতে অমুসলমানরা পাবে ওয়েটেজ। বলা বাহুল্য, এর নাম কালনেমীর লঙ্কাভাগ। মাথার উপরে ব্রিটিশ রাজ রয়েছে, তাকে সরাবার দায়িত্ব মুসলিম লীগ কোনোদিন নেয়নি, কোনোদিন নেবেও না। সরাবার দায় কংগ্রেসের। জেল, জরিমানা, জমি বাজেয়াপ্ত, লাঠিচার্জ, গুলীবর্ষণ সমস্ত দুর্ভোগ কংগ্রেসপন্থী হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি জনগণের। কংগ্রেসের নীতি আগে স্বাধীনতা, তারপরে ভাগ বাঁটোয়ারা, যদি সেটা না হলেই নয়।

রাউন্ডটেবিল কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে গান্ধীজী দেখেন ওয়েটেজ কেবল মুসলমানরা নয়, প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ই চায় আর সেটা হিন্দুদেরই খরচে। সবাইকে ওয়েটেজ দিতে গেলে হিন্দুরা নিজেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। হিন্দুদের তরফ থেকে অমন একটা কমিটমেন্ট করতে তিনি নারাজ হন। কিন্তু জিন্না নাছোড়বান্দা। ওয়েটেজ থেকে তিনি আরো এক কদম এগিয়ে যান। দাবি করেন প্যারিটি। তাঁর দ্বিতীয় পেটেন্ট উদ্‌ভাবন। মুসলমান অমুসলমানের প্যারিটির ভিত্তিতে মিটমাট হলে দেশ অবিভক্ত থাকবে। নয়তো বিভক্ত হবে। দাঙ্গাহাঙ্গামায় নাস্তানাবুদ হয়ে কংগ্রেস নেতারা হৃদয়ঙ্গম করেন যে পার্টিশনই হচ্ছে 'লেসার ইভিল', কম মন্দ। তাঁদের শর্ত দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশভাগও করতে হবে। তাই হয়, কিন্তু আরো মন্দের মধ্যে।

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিপ্লবের কোনো নজির নেই। বিপ্লবের ধারণা আমরা পেয়েছি

ইউরোপ আমেরিকার ইতিহাস থেকে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্য নাম আমেরিকান রেভোলিউশন। সেটা ছিল পলিটিকাল রেভোলিউশন। তার পরে ও তার প্রেরণায় ঘটে ফরাসী বিপ্লব। এটা কিন্তু পলিটিকালের চেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে । বিপ্লবীরা রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, খ্রীস্টিয় পুরোহিততন্ত্র বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদির ওলট-পালট ঘটিয়ে দেশের ইতিহাস নতুন করে শুরু করতে চায়। বর্ষ, মাস, সপ্তাহ সব বদলে দেয়। ঈশ্বরের স্থান দেয় যুক্তির দেবীকে। ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকা যুক্তির যুগ। কয়েকজন ছেলে ছোকরা বোমা বা রিভলভার দিয়ে কয়েকজন রাজপুরুষ হত্যা করলেই বিপ্লব হয় না। কিংবা অস্ত্রাগার লুট করলেই। ইতিহাসে তাই একে চিহ্নিত করা হয় বিপ্লববাদ বলে নয়, সন্ত্রাসবাদ বলে। রুশবিপ্লবের পর বিপ্লবের সংজ্ঞা আরো বেশী বদলায়। বিপ্লব বলতে বোঝায় মার্কসপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তার জন্যে জানতে হয় মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিনের ডায়ালেকটিকাল তর্কপদ্ধতি। শাস্ত্র না পড়ে শস্ত্র ধারণ করলে শাস্ত্রোক্ত ফললাভ হয় না। শস্ত্রে রুচি যেমন সুলভ শাস্ত্রে রুচি তেমন বিরল। পরিস্থিতি পরিপক্ক না হলে বিপ্লব হয় না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পর সাঁইত্রিশ বছর কেটে গেছে। একটি সামগ্রিক সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। সেটি সংস্কারমুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক হওয়া চাই। সাধারণত আমরা আত্মসমালোচনা দেখতে পাইনে। স্বপক্ষের ভুলভ্রান্তির হিসাব-নিকাশ যদি না থাকে তবে সমীক্ষা হয়ে যায় এক তরফা বিচার। ব্রিটিশ শাসনকাল স্থিতিশীল ছিল না। ছিল অন্যান্য আমলের তুলনায় গতিশীল। মোটের উপর প্রগতিশীলও বলা চলে। অন্তত আইনের শাসনের দিক থেকে অগ্রসর। কতকগুলি বিষয় ওরা বরাবরের মতো স্থির করে দিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ থাকবে : শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ ও বিধানবিভাগ। তিনটিকেই নিয়ন্ত্রণ করবে দেশের সংবিধান। সেই সংবিধানে সিভিলের আসন মিলিটারির উপরে। সিভিল পাওয়ার মিলিটারি পাওয়ারের উর্ধ্বে। নাগরিকদের ভোটেই শাসকরা নির্বাচিত। তাদের কাছেই জবাবদিহির দায়। ইংরেজরা যে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠন করে যায় তার উদ্দেশ্যই হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্বোধন, বুরোক্রাটিক ব্যবস্থার অবসান।

এই গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রী তারাপদ লাহিড়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতরের লোক। আমি বাইরের লোক। তিনি এগারো বছর বন্দী হয়ে কাটিয়েছেন। কখনো বিপ্লবীরূপে, কখনো সত্যাগ্রহীরূপে। আইনসভায় না গেলেও আইনজ্ঞ। তিনি অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী, সূক্ষ্মদর্শী। আমাদের সাম্প্রদায়িক কর্কটরোগ থেকে মুক্ত। মুসলমানদের প্রতি দরদী। এমন সব মানুষ থাকা সত্ত্বেও দেশ কেন বিভক্ত হলো, প্রদেশ কেন বিদীর্ণ হলো, উত্তর পুরুষ এটা জানতে চাইবে। তিনি জিজ্ঞাসার সেই উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এটাই প্রথম পর্ব আমরা দ্বিতীয় পর্বের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করব। যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু কেন হয়েছে, কেমন করে হয়েছে এসব জানে খুব কম লোক। জানাবার ভার নিয়েছেন গ্রন্থকার। কোনো কোনো জায়গায় তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তাঁর কাছে অনেক শিখেছি। ভিতরের খবর তিনি না জানালে আমি জানবই বা কি করে?

অন্নদাশংকর রায়

প্রকাশকের নিবেদন

বিপ্লবী মণীষী তারাপদ লাহিড়ীর লেখা *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি* গ্রন্থের অখন্ড সংস্করণ প্রকাশিত হল। বইটির প্রথম পর্ব (প্রথম হইতে সপ্তম অধ্যায়) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। প্রথম পর্বে সাম্প্রদায়িকতার উৎস থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল, অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বইটির পরবর্তী পর্ব (অষ্টম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়) দেশভাগের সময় পর্যন্ত বিধৃত হয়ে পান্ডুলিপি আকারে রক্ষিত ছিল। এই দুই পর্ব মিলিয়ে এর অখন্ড সংস্করণ প্রকাশিত হল।

লেখক একজন বিদগ্ধ মণীষী ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর কলমে এক অজানা ও গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে বইটির ছত্রে ছত্রে। সাধারণ পাঠক ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আগ্রহী গবেষকদের কাছে এই মূল্যবান বইটি সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

বইটির প্রথম পর্বের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রয়াত অন্নদাশংকর রায়। দ্বিতীয় পর্বের আমরা কোন ভূমিকা রাখলাম না। পাঠকই এই দায়িত্ব পালন করবেন।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে লেখকের সহধর্মিনী শ্রীমতী কল্যাণী লাহিড়ীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই লেখকের পরিবারের সদস্যদের, যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

প্রকাশক

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

'সাম্প্রদায়িকতা' বলতে কি বোঝায়, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে কতকগুলি অশুভ প্রবণতাকে আমরা সমষ্টিগতভাবে 'সাম্প্রদায়িকতা' বলে চিহ্নিত করে থাকি। কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বা ঐরূপ কোন জনগোষ্ঠীর নামে অত্যুগ্র গোষ্ঠীপ্রেম বা গোষ্ঠীস্বার্থচেতনার ভিত্তিতে সাঙ্ঘিক উন্মাদনা সৃষ্টি—যা অপর এক বা একাধিক সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণশীল, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা আহরণের প্রয়াস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে উত্তেজনা সৃষ্টি করে অশান্তি বিস্তার, অপরাপর সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর প্রতি সৌভ্রাত্রবোধের অভাব, গোষ্ঠীগতভাবে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা-সৃজন ইত্যাদি অসামাজিক প্রবণতা সমূহকে সমষ্টিগতভাবে 'সাম্প্রদায়িকতা' বা Communalism বলে আখ্যাত করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িকতা বলতে শুধু ধর্মীয় গোষ্ঠীগত 'সাম্প্রদায়িকতাই' লক্ষ্য করা হয়েছে, যদিও আঞ্চলিকতাভিত্তিক, প্রজন্মভিত্তিক বা আর্থিক স্বার্থের বনিয়াদেও উক্ত প্রকার অশুভ প্রবণতাসমূহ দেখা দিতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা

ধর্মীয়সম্প্রদায়গত ঐক্যের ভিত্তিতে যে কোন সাঙ্ঘিক প্রয়াস যে সাম্প্রদায়িকতা বলে চিহ্নিত হবে—এমন কথা আমরা বলছি না। ধর্মীয় বন্ধনে, বা অপর কোন প্রকার সমস্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ কোন জনগোষ্ঠীর স্বকীয় আত্মবিকাশ বা আত্মোন্নতির প্রয়াস অপরের প্রতি আক্রমণশীল না হলে তাকে 'সাম্প্রদায়িকতা' বলা যায় না। ঐরূপ সাঙ্ঘিক প্রয়াসের অধিকার সকলেরই আছে। যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগত আপন সম্প্রদায়ের বিকাশ, বিশুদ্ধি বা উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ গঠন ও সঙ্ঘ পরিচালনা করতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের প্রয়াস অপর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণশীল অথবা পারস্পরিক সৌভ্রাত্রবোধের ক্ষয়কারক না হচ্ছে অথবা ভারতবাসিগণের সামগ্রিক জাতীয়তাবোধের প্রতিকূল ভূমিকায় অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রয়াস সাম্প্রদায়িকতার পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে না।

ভারতবর্ষে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ও ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী জনগণের ব্যাপক ও স্থায়ী বসতি বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে, যে সকল ভারতবাসীই ধর্মবিষয়ে সমমতাবলম্বী ছিলেন—একথা বলা যায় না। বৃহত্তর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে নানা ধর্মীয় উপসম্প্রদায়ের মধ্যে অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং এখনও পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নানা উপসম্প্রদায় রয়েছে এটা ঐতিহাসিক সত্য। ভারতবাসী কালক্রমে মুসলমান রাজশক্তির বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল সন্দেহ নাই। মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাতাগণ

ভারতে মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা

বহিরাগত ছিলেন এবং মুসলমানগণের ধর্ম ও ধর্মীয় আচরণসমূহ ভারতবাসীর চোখে ছিল সম্পূর্ণ নূতন। অগন্তুক সম্প্রদায় শুধু যে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম ও জীবনচর্যার নূতন রীতিপদ্ধতি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তাই নয়, তাঁরা এলেন সাম্রাজ্যস্থাপনকারী বিজেতার বেশে। সেই প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই রাষ্ট্রশাসন ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। শাসনদন্ড যখন যাঁর হাতে থাকতো, তিনি মনে করতেন তিনি যে ধর্মের অনুরাগী সেই ধর্মের পোষণ ও প্রসার তাঁর পবিত্র কর্তব্য। তার ফলে মুসলিম শাসকগণের মধ্যে অনেকে ভারতবর্ষে ইস্‌লাম ধর্মের প্রসার সাধনের জন্য অতিশায়িত উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অপর ধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক পন্থা অবলম্বন করেছেন। আবার কোন কোন দূরদর্শী শাসক স্বয়ং তাঁর আপন ধর্মের সম্পূর্ণ অনুরাগী থেকেও রাজ্যশাসন ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষতা অনুসরণে প্রয়াসী হয়েছেন।

একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে বিজেতা জাতির শাসকবর্গের অনেকের মধ্যে যে অতিশায়িত ধর্মীয় উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছিল, তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থের তাগিদ সেই উন্মাদনায় অনেকখানি ইন্ধন জুগিয়েছিল। কোনো একটা দেশে বহিরাগত রাজশক্তিকে যদি স্বকীয় সিংহাসনের নিরাপত্তা অর্জন করতে হয়, তাহলে বিজিতদেশে বিজেতা-রাজশক্তির সমর্থক একটি স্থায়ী সম্প্রদায় সৃষ্টি করবার প্রয়োজন স্বভাবতই অনুভূত হবে। যেখানে আগন্তুক বিজেতা শাসকের স্বধর্ম বিজিত দেশের প্রচুরতম অধিবাসীর ধর্ম থেকে পৃথক, সেখানে দেশীয় জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে ধর্মান্তরিত করে শাসককুলের দ্বারা আচরিত ধর্মে দীক্ষিতকরণ সে যুগে যোগ্যতম রাজনৈতিক কৌশল বলে বিবেচিত হত। ইংরেজরাও ভারতবর্ষে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সুদৃঢ় ও নিরাপদ করবার স্বার্থে সুপরিকল্পিতরূপে ভারতবাসীর একাংশের খৃস্টানীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। সুদূর ইংলন্ড থেকে যদি ভারতবর্ষের মত একটি বৃহদায়তন ভূখন্ডকে শাসন করতে হয়, তা হলে ভারতের দেশীয় অধিবাসিদের মধ্য থেকে ইংরেজের অনুগত একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ধর্মীয় ঐক্যের বন্ধন যে আনুগত্যের বন্ধন রচনার পক্ষে একটা সহজলভ্য সূত্র ইংরেজদের তাৎকালিক মানস অতি সহজেই সে তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি বশত এদেশে ধর্মযাজক প্রেরণ ও খৃস্টানীকরণের অভিযান যে গ্রেট ব্রিটেনের তৎকালীন সরকারের প্রণীত সুপরিকল্পিত কর্মসূচী অনুসারেই পরিচালিত হয়েছিল তার নানা দালিলিক প্রমাণ উপস্থিত করেছেন বিখ্যাত ইতিহাস লেখক মেজর বামনদাস বসু তাঁর স্বলিখিত *History of Education under East India Company* নামক পুস্তকে।

ভারতে মুসলমানগণের বিজয় অভিযান ও ইংরেজদের বিজয় অভিযান—এ দুইয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তি এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপার থেকে আগত মুসলিম রাজশক্তি—এই দুয়ের ভারত বিজয় অভিযানের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজের বিজয় অভিযান যখন আরম্ভ হয়, তখন গ্রেট ব্রিটেনের পুঁজিবাদী রূপান্তরের সূচনাকাল। ইংরেজের দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদনকাল তখন দ্রুত সম্প্রসারণের অভিমুখী। প্রয়োজনীয় নগদ পুঁজির অভাবে ইংলন্ডের শিল্পোদ্যোগ তখন অগ্রসর হতে পারছে না। নগদ পুঁজির

সন্ধানে তখন ইংলন্ডীয় বণিকেরা পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। 'টাকা চাই', 'টাকা চাই' বলে উচ্চরবে আর্তনাদ সুরু করেছে ইংলন্ডের হবু বুর্জোয়া নায়কেরা। উইলিয়াম ডিগবী তাঁর *Prosperous British India* পুস্তকে শিল্পোদ্যোগ সম্প্রসারণকামী ইংলন্ডের পৃথিবী-ব্যাপী অর্থান্বেষণ অভিযানের বর্ণনা দিয়ে বলেছেনঃ 'at last money was found in India!' সুতরাং নিজ দেশের পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যোগের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের স্বার্থেই ইংরেজদের ভারত বিজয় অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর *Social Statics* নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পরে অনেকগুলি জাহাজ বোঝাই স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য (ship loads of gold and gems) বাংলা ও কর্ণাটক থেকে সমুদ্রপথে ইংলন্ডে পৌঁছোয়। তারই ফলে পলাশীর যুদ্ধের পরে তিন বছরের মধ্যে ইংলন্ডের 'শিল্প বিপ্লব' (Industrial Revolution) শুরু হয়। নগদ পুঁজির সমস্যা মিটলেই পুঁজিবাদী উৎপাদনের সকল সমস্যা মেটে না। একটা দেশে পুঁজিবাদের জয় সম্পূর্ণ করতে সেই দেশের দখলে আর পাঁচটা অনুন্নত (অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন বর্জিত) দেশ থাকা চাই। তাই ইংরেজের ভারত বিজয় অভিযানের লক্ষ্য ছিল—লুণ্ঠনের দ্বারা নগদ পুঁজি সংগ্রহ, সুবিধায় কাঁচামাল ক্রয় ও শিল্পজাত মাল বিক্রয়ের জন্য একটি একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি এবং পুঁজি রপ্তানীর একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র অধিকার করা। ভারতবর্ষ জয়ের পরে বিজিত দেশে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে, ভারতীয়ত্ব বরণ করে রাজ্য শাসন করবার কোন লক্ষ্য ইংরাজ বিজেতাগণের ছিল না। নিজ দেশের অর্থিক সমৃদ্ধিবর্ধনের জন্য পরদেশ লুণ্ঠন—এই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক লক্ষ্য এবং পুঁজিবাদী যুগে দিগ্বিজয়ের এটাই স্বাভাবিক লক্ষ্য।

পক্ষান্তরে, ভারতে মুসলিম সমরনায়কগণের বিজয় অভিযানের লক্ষ্য ও চরিত্র ছিল ভিন্নতর। গোড়ার দিকে আরবীয় ও তুর্কী অভিযাত্রীদের পৌনঃপুনিক আক্রমণের মধ্যে সাম্রাজ্য স্থাপনের কোন অভিপ্রায় পরিলক্ষিত হয় না। অর্থ ও সম্পদ লুণ্ঠনই আরব ও তুর্কী আক্রমণকারিগণের মৌলিক লক্ষ্য ছিল—একথা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনাকাল থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন ১২০২ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় থেকে ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকেরা কোন বিদেশীয় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধিরূপে এ দেশে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন নাই। তাঁরা ভারতে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে নিজেদেরকে ভারতীয়রূপে পরিচিত করতে যত্নবান হয়েছেন। শাসনতান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এটা বুঝতে পারা যাবে যে ভূমিনির্ভর অর্থনীতির অধীনে শাসক যদি অধিকতর লাভবান হতে ইচ্ছা করেন তা হলে তিনি যে দেশের শাসক সেই দেশের অভ্যন্তরে বসতি করা তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে 'ভূমি'—যার স্থানান্তরীকরণ সম্ভব নয়। উৎপাদন কর্ম যেখানে পরিচালিত হচ্ছে তার যত কাছে সামন্ততান্ত্রিক শাসক বাস করবেন, রাজকর আহরণ তাঁর পক্ষে তত বেশী সুবিধাজনক হবে। পুঁজিবাদী উৎপাদনকলার সাথে যেহেতু সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনকলার চরিত্রগত পার্থক্য দুস্তর, সেইহেতু সামন্ততান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতি থেকে পুঁজিবাদী শোষণ পদ্ধতি ভিন্নতর হতে বাধ্য। পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থায় পৃথিবীর কোন এক ক্ষুদ্র অংশে পুঁজি নিয়োগ

করে সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে শোষণের জাল বিস্তার সম্ভব। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদেই বহিরাগত রাজশক্তির ভারতীয়করণ ঘটেছে।

কুতুবউদ্দিন আইবেক থেকে শুরু করে যে সাড়ে পাঁচ'শো বছর মুসলিম রাজশক্তি ভারতের সিংহাসন অধিকার করেছেন তাঁদের সকলকেই ভারতীয়ত্ব বরণ করতে হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদেই মুসলিম শাসকগণ অনুভব করেছেন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য ভোগ করতে হলে ভারতের মাটিতে স্থায়ী বসতি স্থাপন শাসককুলের পক্ষে একটি অপরিহার্য সর্ত।

বহিরাগত শাসকরা যখন এদেশে স্থায়ী বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা অনুভব করলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর সংখ্যক স্বধর্মাবলম্বীকে বিদেশ থেকে নিয়ে এসে তাদেরকেও ভারতে স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত করে সিংহাসনের ছত্রছায়ায় একটি বিশ্বাসী ও রাজানুরাগী সম্প্রদায় গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সাথে লড়াই করে তাদের হটিয়ে নূতন শাসকগণকে রাজ্য দখল করতে হয়েছে। সুতরাং পরাজিত দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শক্তি স্বাভাবিক ভাবে নূতন শাসকগণের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। নূতন শাসকেরা শুধু যে বহিরাগত ছিলেন, তাই নয়, এদেশের সাধারণ লোকের ধর্ম নূতন শাসকদের ধর্মের চেয়ে পৃথক ছিল। পক্ষান্তরে এদেশের সাধারণ মানুষের ধর্ম ও পরাজিত দেশীয় রাজাদের ধর্ম এক। ধর্মীয় ঐক্যের বন্ধনে পরাজিত রাজগণ ও এদেশীয় জনগণ ছিল একসূত্রে বাঁধা। সুতরাং নূতন শাসকগণ সহজে এদেশের দেশীয় জনমন্ডলীর আনুগত্য অর্জন করতে পারবেন না এটা তাঁরা বুঝেছিলেন। তাছাড়া শাসনকার্যে যে প্রচুর সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন হয়, তারা অবিশ্বাসী হলে রাজশক্তির অবস্থা হয়—'স সর্পে চ গৃহে বাসঃ'-র শামিল। সুতরাং বিদেশ থেকে স্বধর্মাবলম্বীদের নিয়ে এসে সিংহাসনের রক্ষক একটা রাজানুরাগী সম্প্রদায় সৃষ্টি করা ছাড়া নূতন শাসকদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাজকীয় দিগ্বিজয় অভিযানে, যেখানেই আক্রমণকারী পক্ষ ও আক্রান্ত পক্ষ পরস্পর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সেখানেই দিগ্বিজয়ের ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সকল ক্ষেত্রে, আক্রমণকারীপক্ষ যেমন ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে তাঁর স্বপক্ষীয়গণকে ক্লেশবরণ ও প্রাণবিসর্জনে উৎসাহিত করতে পেরেছেন, আক্রান্তপক্ষ সেই প্রকার তাঁর স্বদেশীয় জনমন্ডলীকে ধর্মের নামে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য চরমতম ত্যাগ স্বীকারে উৎসাহিত করতে পেরেছেন।

মুসলিম শাসকগণ দ্বিবিধ উপায়ে ভারতবর্ষে তাঁদের নিয়ত-সহায়ক এবং বিশ্বাসী এক জনগোষ্ঠী সৃজনে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথমত, ভারতের সীমান্তের ওপারে যেসব ইস্‌লামিক দেশ ছিল সেখান থেকে স্বধর্মাবলম্বীদের নিয়ে এসে নানা সুযোগ-সুবিধা দান করে ভারতে চিরস্থায়ীভাবে বাসস্থাপনে তাদেরকে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত, এদেশীয় অ-ইস্‌লামিক জনশ্রেণীর একাংশকে ইস্‌লামধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করা। সামন্ততান্ত্রিক যুগের একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে কোন রাষ্ট্রের বা রাজ্যের শাসক স্বয়ং যে ধর্মের অনুরাগী, সেই ধর্মের প্রসার ঘটানোর কাজকে তিনি রাজকীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। 'আমার ধর্মই একমাত্র ঈশ্বরানুমোদিত সত্য ধর্ম, অপরাপর ধর্ম ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। সুতরাং ভ্রান্তবুদ্ধিবশত

যারা ভিন্ন ধর্মে অনুরক্ত তাদেরকে ঈশ্বরানুমোদিত সত্যধর্মের আশ্রয়ে নিয়ে আসা—এটা আমার ঈশ্বরনির্দিষ্ট কর্তব্য এবং এইরূপ কার্য সাধনের দ্বারা আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে পারবো বা ঐরূপ কার্য আমার আত্মার মুক্তি অর্জনের সহায়ক হবে'—এইরূপ ধারণা অধিকাংশ সামন্ততান্ত্রিক শাসক পোষণ করতেন। এইরূপ ধারণার যুক্তি-যুক্ততা কতদূর বা আদৌ এরকম ধারণা যুক্তিসম্মত ছিল কি না, তা নিয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই। শুধু এইটুকু বুঝতে হবে যে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক শাসকগণ ঐরূপ ধারণা পোষণ করতেন—এটা নির্মম ও অকাট্য সত্য।

ভারতে মুসলিম জনবসতির বিস্তার ও ভারতবর্ষে এক ধর্মীয়তার যুগের অবসান

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাগুলির প্রচারণার দ্বারা কেহ যদি স্বীয় ধর্মের প্রতি অপরকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন, তা হলে কারও কোন আপত্তি হওয়া উচিত নয়। ঐরূপ প্রচারণার অধিকার সকলেরই থাকা উচিত। কিন্তু মুসলিম শাসকগণ সকলেই যে ইস্‌লাম প্রচারে এই প্রকার শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। কোন কোন শাসক অতিশায়িত ধর্মীয় উৎসাহবশত ভারতের অ-ইস্‌লামিক জনমন্ডলীকে ধর্মান্তরীকরণের ব্যাপারে হিংস্রপথ অথবা জোর-জুলুমের পথ গ্রহণ করেছেন। এর অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনায় সে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। মুসলিম শাসকগণ তাঁদের স্বকীয় নিরাপত্তার তাগিদেই রাজকার্যে এবং অন্যান্য ব্যাপারে স্বধর্মাবলম্বীগণকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা দান করতে বাধ্য হয়েছেন। তার ফলে এদেশে জায়গীরভোগী বা অন্য প্রকার সুযোগ সুবিধাভোগী এক নূতন মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। এই নূতন অভিজাত শ্রেণী শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে বসতি বিস্তার করেছে—শাসন ব্যবস্থার নানা স্তরে তাদের প্রভাব থাকার ফলে, তারা সেই প্রভাবের সুযোগ নিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপরে জোর-জুলুম করেছে। এই জোর-জুলুমের ফলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। আবার সুবিধার লোভে অনেক অমুসলমান স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম বরণ করেছে, যদিও এইরূপ ধর্মান্তর গ্রহণের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় তত্ত্বোপলব্ধির কোন স্থান ছিল না।

আরও একটি বিশেষ পরিস্থিতি ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার পুষ্টি-সাধনে সহায়তা করেছে। বিদেশাগত সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ পদ্ধতি রাজশক্তির সমর্থন পুষ্ট হয়ে দ্রুত গতিতে প্রচলিত দেশীয় ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণের চতুর্দিকে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে—এ দেশে তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু সমাজের সমাজপতিগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন। এই ভাঙ্গন প্রতিরোধের উপায় হিসাবে তাঁরা আপন সমাজের চারিদিকের বেড়া ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর রূপে শক্ত করতে শুরু করে দিলেন। মুসলমানগণের আগ্রাসী সম্প্রসারণ যত প্রবল হতে লাগলো হিন্দুসমাজপতিগণ তাঁদের সামাজিক বাঁধন তত বেশি শক্ত করে তুলতে লাগলেন। সামান্য বিচ্যুতি যা সহজেই ক্ষমা কিংবা উপেক্ষা করা যায়, সেগুলিও ক্ষমা বা উপেক্ষালাভ করলো না। স্বেচ্ছায় অসতর্কতাবশত বা ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে যে কেউ হিন্দু আচার-আচরণের গোঁড়ামীর বাইরে একবার একটু পা ফেলেছে, তাকে কাছে টেনে নেওয়ার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেওয়াই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ালো। গোঁড়ামীর গন্ডীর বাইরে পদক্ষেপ করলেই তার ভাগ্যে পতিত এবং সমাজ থেকে বহিষ্কার ঘটবেই। এই

ভাবে হিন্দু সমাজ বহুজনকে বাইরে ঠেলে দিয়েছেন। সেই সব তথাকথিত অপরাধীদের সামনে মুসলিম সমাজভুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না। মুসলমান সমাজ এইসব তথাকথিত অপরাধীদেরকে সাদরে আশ্রয় দান করেছে। প্রাক্-মুসলিম যুগে যে উদারতা ও মানসিক শক্তির বলে এদেশীয় হিন্দুগণ নানা বিদেশগত বিজেতাজাতিকে নিজের সাথে মিশিয়ে নিতে পেরেছে মুসলিম যুগ শুরু হওয়ার পূর্বেই হিন্দুসমাজ সেই উদারতা ও মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম যুগে সঙ্কীর্ণতাবাদের শক্ত গ্রন্থিকেই হিন্দু সামজপতিগণ আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এ ছাড়া নিম্নবর্ণের দরিদ্র ও অবহেলিত হিন্দুদের উপরে উচ্চবর্ণের হিন্দু ভুস্বামিগণের এবং পুরোহিত শ্রেণীর নানাবিধ নির্যাতনমূলক ব্যবহার মুসলিম জনসংখ্যার পুষ্টি সাধনে সহায়তা করেছে।

এইভাবে বিদেশাগত ও দেশীয় মুসলমানগণ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রাজকার্যে, ব্যবসা-বাণিজ্য, নানারূপ কারিগরি বৃত্তিতে ভূস্বামীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সর্বস্তরে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানগণও তাঁদের স্থান করে নিতে সমর্থ হন। বিদেশাগত মুসলমানগণও কালক্রমে দেশীয় জনমন্ডলীর সাথে একত্রিত হয়ে যান এবং ভারতবর্ষের নির্ভেজাল হিন্দুত্ব ঘুচে গিয়ে ভারত হিন্দু-মুসলমানের দেশে পরিণত হয়। ((বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের একটি শাখা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে)

এই নূতন সামাজিক সংস্থিতি সম্পর্কে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চন্ডীকাব্য* থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য পাই। *চন্ডীকাব্য*-এর রচনাকাল কাব্যে উল্লিখিত না হলেও কাব্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে মনে করা যেতে পারে যে গ্রন্থখানির বয়স ৪০০ বছরের কাছাকাছি। কালকেতু কর্তৃক নগর নির্মাণের এক বর্ণনা দিয়েছেন কবি মুকুন্দরাম। বর্ণনাটা যদিও কাল্পনিক তথাপি তৎকালীন নগরগুলির জন-বসতির চিত্র অনুসরণ করেই কবি কাল্পনিক নগর নির্মাণের ছবি এঁকেছেন এটা অনুমান করা যায়। নগরে সর্বজাতির লোক পৃথক পৃথক পাড়ায় বসতি স্থাপন করেছে তারমধ্যে নগরের পশ্চিমাংশে মুসলমানেরা বসতি গড়ে তুলেছে। মুসলমান সে সময়ে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এটা বোঝা যায়। মুসলমানদের নানা শাখা এবং তাদের মধ্যে নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন মুকুন্দরাম। যথা, জোলা, মুকেরী (চাষী), পিঠারি, কাবাড়ি (মৎস্যজীবী), তাঁতি, পটুয়া, কাগচী, রংরেজ, হাজাম, দর্জি প্রভৃতি। সুতরাং একথা অনুমান করা যায় যে অন্তত ষোড়শ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে গ্রামীণ বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মুসলমান।

পারস্পরিক সহনশীলতা ও সহযোগিতা—সম্মিলিত ভারতীয় জাতির বনিয়াদ

প্রজাসাধারণের মধ্যে যদি বিপুল সংখ্যক লোক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয় তা হলে রাজশক্তি যতই বলবান হোক না কেন, শুধু বলপ্রয়োগের দ্বারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাগণকে দীর্ঘকাল বশ্যতাবদ্ধ রাখা যায় না। কারণ রাজশক্তি যদি প্রজাসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত আনুগত্য অর্জন না করতে পারেন তা হলে দেশে অশান্তি লেগে থাকে এবং সেরূপ ক্ষেত্রে রাজকোষ থেকে অযথা

অর্থব্যয় ঘটে ও রাজস্ব সংগ্রহের কাজে বাধা পড়ে দেশে উৎপাদনের ঘাটতি ঘটে—তার ফলে রাজকোষে অর্থাগম সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং রাজ্য শাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয়দান রাজার পক্ষে অনিষ্টকর। দূরদর্শী মুসলমান শাসকেরা এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরা তাই রাজ্যশাসন ব্যাপারে যথাসম্ভব সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং হিন্দু ও মুসলমান প্রজাসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও মৈত্রীবোধ উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। আবার অনেক অদূরদর্শী শাসক ধর্মোন্মাদনাকে বেশী প্রাধান্য দান করে আপন সিংহাসনকে দুর্বল করে তুলেছেন। ধর্মোন্মাদনার ব্যাধিগ্রস্ত শাসকগণ, নিজেদেরকেও বিপন্ন করেছেন, জন সমাজকেও দূষিত করেছেন।

কিন্তু শহরে ও গ্রামে গঞ্জে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক পাশাপাশি বাস করতে করতে নিজেদের তাগিদেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও মৈত্রীবোধ সংগঠিত করেছে। তাঁদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছে এইভাবে। সাধারণ মানুষ নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেও দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে একে অন্যের সহযোগী হয়েছেন। গ্রামে গঞ্জে হিন্দু-মুসলমানের একপ্রকার যৌথ সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সাথে একথাও সত্য যে সেই শান্তিপূর্ণ যৌথ সামাজিক জীবন গত ২০০ বছর ধরে সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুর্বুদ্ধির অ.ঘাতে পুনঃপুনঃ বিপর্যস্ত হয়েছে। এবং আজ পর্যন্ত সেই দুর্বুদ্ধির অপসারণ আমরা ঘটাতে পারিনি। এই দুর্বুদ্ধি সামাজিক দেহে এক যন্ত্রণাকর কন্টক এবং জাতিদেহ থেকে এই কন্টকের নিষ্কাসনের ব্যাপারে আমরা এযাবৎ ব্যর্থ হয়েছি। কেন এই অশুভ পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সজ্জনগণের ঐকান্তিক প্রয়াস পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হচ্ছে — এ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতে হবে ইতিহাসনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুনঃপুনঃ বাইর্দেশীয় জাতির আক্রমণের নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল আক্রমণ অনেক ক্ষেত্রেই রক্তাক্ত ও বিধ্বংসী হিংস্র অভিযানের রূপ নিয়েছে। কিন্তু সেই সকল আক্রমণের লক্ষ্য ছিল প্রধানত সম্পদলুণ্ঠন অথবা রাজ্যবিস্তার এবং পৃথিবীর সর্বত্রই এই জাতীয় আক্রমণে নির্মম ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। এই সকল অভিযানে যদিও বিশেষ এক সম্প্রদায় কর্তৃক দেশীয় অধিবাসীগণ উৎপীড়িত হয়েছে তথাপি এগুলিকে 'সাম্প্রদায়িকতা' বলে বর্ণনা করা যায় না। কারণ লুণ্ঠন বা দিগ্বিজয়ের ব্যাপারে ধর্মোন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক অভিমান কিংবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির প্রাধান্য থাকে না। এতে প্রাধান্য থাকে ধনলোভের অথবা রাজ্যবিস্তার প্রবণতার। দস্যুতার দ্বারা সম্পদ লুণ্ঠন ও রাজ্যবিস্তারের প্রবণতা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক লক্ষণ। সুতরাং মুসলিম সমর-নেতাগণ কর্তৃক লুণ্ঠনের কিংবা রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযানসমূহে যে সকল নিষ্ঠুরতা বা হিংসাত্মক ব্যাপার ঘটেছে সেগুলিকেও আমরা আলোচনার বাইরে রাখছি। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রচার অভিযান বৌদ্ধমতাবলম্বীদের সাথে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগীদের যে সকল রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটেছে—আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে সেগুলি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। সেইরূপ কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শতাব্দব্যাপী ইংরেজ অধিকারের আমলে ধর্মোন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক অভিমান বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় ভারতবর্ষে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সে সকল পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘটেছে, যেগুলিকেও আমরা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বলে চিহ্নিত করি।

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান, শিখ, পার্শী, খৃস্টান—প্রভৃতি নানা ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর স্থায়ী নিবাস থাকলেও, এদের মধ্যে, জনসংখ্যার-বহুলতার নিরীখে, হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে কোন কোন সময়ে শিখ-মুসলিম বা হিন্দু-শিখ বৈরিতাবোধ হিংসাত্মক রূপ গ্রহণ করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সামগ্রিক জাতীয় রাজনীতিতে ঐ ধরণের ঘটনা কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি এবং জাতীয় জীবনে এরূপ ঘটনার যদি কোন প্রভাব বিস্তৃত হয়েও থাকে তা আঞ্চলিকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। খ্রিস্টান ধর্ম যদিও বহিরাগত ধর্ম তথাপি এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে ভারতীয় খ্রিস্টানদের সাথে ভারতীয় হিন্দু বা মুসলমানদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। সুতরাং ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা সাম্প্রদায়িক প্রতিকূলতার কথা বলতে প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিরোধই লক্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও এই সকল বিরোধের মূলে ছিল ভ্রান্তবুদ্ধি ও অতিশয়িত ধর্মোন্মাদনা

হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক বৈরিতায়লিপ্ত হয়েছে প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়

তথাপি এই বিরোধ যে আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, রাজনীতি ও সমাজজীবনকে পুনঃপুনঃ পঙ্কিল করে তুলেছে, অগণিত নিরাপরাধের প্রাণহানি ঘটিয়েছে, সাময়িকভাবে প্রচুর সংখ্যক সুস্থ মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে, অত্যাচারী ও লুণ্ঠক বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের হাত শক্ত করেছে এবং পরিণামে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু-মুসলমানকে চরমতম দুর্ভাগ্যের অতলগর্ভে নিক্ষিপ্ত করেছে— এ এক নিষ্ঠুর অবিতর্কিত ও যন্ত্রনাদায়ক সত্য।

সাম্প্রদায়িক বৈরিতা ভারতীয় সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক ভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্যহীন।

যে সকল ব্যাপারকে আশ্রয় করে বৈরিতার বিষবাষ্প পুনঃপুনঃ ভারতের হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক সম্পর্ক বিষাক্ত করে তুলেছে সেই ব্যাপারগুলিকে একটু সুস্থ মনে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে দুই প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ ধরণের বৈরিতা স্বাভাবিক ছিল না। পূর্বেই বলেছি হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায় গ্রামে, গঞ্জে ও শহরে পাশাপাশি বাস করতে থাকায় তাদের মন থেকে আদিমকালের প্রতিকূলতাবোধ কালক্রমে অপসৃত হয়ে যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন মুসলমান শাসক 'বিশ্বাসী' (অর্থাৎ মুসলমান) প্রজার প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক অনুগ্রহ বিতরণ করেছেন অথবা 'কাফির' (অর্থাৎ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী)-দের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বমূলক সর্ত আরোপ করেছেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তাঁর চতুর্থ পুত্র মুয়াজ্জিন্ নিজ ভ্রাতা আজম শাহকে যুদ্ধে নিহত করে শাহ আলম্ বাহাদুর শাহ (প্রথম বাহাদুর শাহ) নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি তাঁর আচরণ অনেকখানি উদার ও পক্ষপাতশূন্য ছিল। তিনি হিন্দু প্রজার বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ কিংবা তাদের উপাসনার স্থান অপবিত্রকরণ বা মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি সমর্থন করতেন না। কিন্তু তাঁর আমলে পাল্কী ব্যবহার, আরবী ও ইরাকী অশ্ব এবং হস্তী, রথ ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ পুনপ্রচারিত হয়।[১] এগুলি রাজকীয় বিপথগামিতা ও রাজকীয় খামখেয়ালী বলেই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। মুসলমান সম্প্রদায়কে এই পক্ষপাতিত্বের সাথে যুক্ত করা যায় না।

শহরেই হোক্ আর গ্রামেই হোক্ যারা স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করে পাশাপাশি বাস করছে, প্রাত্যহিক যাতায়াতের জন্য একই পথঘাট ব্যবহার করছে, একই হাটে-বাজারে প্রত্যহ পণ্য ক্রয়বিক্রয় করছে, একই মাঠে ভূমি চাষ করছে, স্নান ও পাণীয় জলের জন্য একই জলাশয় বা জলাধার ব্যবহার করছে, প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্যের ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শুভ ও অশুভ ফল একসাথে ভোগ করছে—তারা দীর্ঘকাল পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আচার-আচরণের ছোটখাটো গোষ্ঠীগত পার্থক্যগুলি কতক স্বাভাবিক নিয়মে অপসৃত হয়। বাকী কতকগুলি সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সমঝোতা ও সহনশীলতা গড়ে ওঠে। তাই মুসলমান শাসকদের আমল থেকেই হিন্দু-মুসলমানে প্রতিবেশিত্ব-সুলভ সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সৌহার্দ ও সহনশীলতা ক্রমাগতরূপে পুষ্ট হয়েছে, দৃঢ়ীভূত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের হিন্দু পরিবার ও মুসলিম পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের অনুরূপ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এবং সে সম্পর্ক পুরুষানুক্রমে স্থায়ী হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের

মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্প্রদায়গত রীতিপদ্ধতির লেনদেন ঘটেছে। সামাজিক ও এমন কি ধর্মীয় উৎসবাদিতে, আহারে, পরিচ্ছদে, ভাষায়,ভাষণে দান-প্রতিগ্রহ চলেছে পরস্পরের মধ্যে। মুসলমানের পায়জামা ও হিন্দুর উত্তরীয় উভয়ের দেহের শোভাবর্ধন করেছে। হিন্দুর পিঠা-পায়স মুসলমানের পাকশালায় স্থান পেয়েছে, মুসলমানের পোলাউ, কালিয়া হিন্দুর বাড়ীর সামাজিক ভোজের আসরকে সুরভিত করেছে। লৌকিক জীবনে রামায়ণ-গান, কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান, পদকীর্তন, মনসার ভাসান, জারীগান সারিগান প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমানে মিলেমিশে উপভোগ করেছে—অনেক সময়ে এই লৌকিক সংস্কৃতির পরিবেশনায় হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেছে। চিত্রাঙ্কনে সঙ্গীতবিদ্যায়, স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলমান পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্যে নূতন নূতন মিশ্ররীতির উদ্ভাবন করে ঐ সকল কলাবিদ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে। হিন্দুর বাড়ীর উৎসব অনুষ্ঠানে মুসলমান ওস্তাদেরা পরম সমাদরে আমন্ত্রিত হয়ে কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। মুসলমান নর্তকীরা হিন্দুবাড়ীর বিবাহে, পূজানুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। গ্রামীন হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় ব্যাপারেও গোঁড়ামির বন্ধনকে শিথিল করে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গঠন করে নিয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান আপন আপন ধর্মাচরণ বিধি অনুসরণ করেও একে অপরের ধর্মীয় উৎসবাদিতে যোগদান করেছে। রমজানের ঈদ উৎসবে এবং দুর্গাপূজার বিজয়া-মিলনের দিনে হিন্দু-মুসলমান আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছে। ঈদের উৎসবে মুসলমানের হাত থেকে হিন্দুরা শুক্না মিঠাই ও মেওয়া গ্রহণ করেছে —মুসলমান তার হিন্দু প্রতিবেশী বা বন্ধুর গায়ে আতর বা এসেন্স ছিটিয়েছে। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন ঃ

"The Hindus are seen even now assembling in as large number as the Muslims in a *darga* or tomb of a Muslim saint, or on the occasion of Urs fair from all over India at places like the Azmeer Shariff or the Bihar Shariff, Maner Shariff and Phulwari Shariff."[২]

দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাসানের দিনে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নৌকার উপরে বৈঠা ঠুকে ঠুকে সারিগান গেয়ে আমোদ করেছে।

হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠানে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে—মুসলমানের বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুর আচার আচরণের ছাপ পড়েছে। দীপাবলীর রাত্রে হিন্দু ও মুসলমান প্রদীপ দিয়ে আপন আপন গৃহে আলোকসজ্জা রচনা করেছে। ১৯১৭ সালে তৎকালীন সরকারি উদ্যোগে সঙ্কলিত ময়মনসিংহ জেলার ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে নিম্নলিখিত রূপ তথ্য লিপিবদ্ধ আছে ঃ

"Strictly speaking only *Shias* observe the Moharram, but many *Sunnis*, and Hindus take part in the holiday and enjoy the noise, just as Mahommadans join in the Durgapuja processions and the Manasapuja boat races, ...On the other hand Hindus sometimes make offering in the mosque after winning a case or when their cows first give milk. The habit of joining the Doljatra or Holi festival is going out."[৩]

হিন্দুরা সন্তানের কল্যাণে ফকীরের থানে, পীরের দরগায়, চিনি, বাতাসা ভোগ পাঠিয়েছে,

মুসলমানেরা চিনি দিয়েছে গ্রামের রক্ষাকালীতলায় পুত্র-জন্ম-কামনায় ছাগ মানত করেছে হিন্দুর গ্রাম-দেবতার কাছে।

মুসলমান শাসকেরা হিন্দুর মঠ মন্দির তীর্থস্থানের জন্য বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করেছেন—এ রকম বহুতর দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করা যায়। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন ঃ

"In actual practice any number of instances may be found of Muslim kings endowing temples and *Maths* and granting *Jagirs* to pious Hindus and *Pandits* learned in the Hindu lore."[৪]

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর গ্রন্থে মুসলমান শাসক কর্তৃক হিন্দুর দেবস্থানের জন্য অর্থ বা জায়গীর দানের এবং হিন্দু ভূস্বামী কর্তৃক মুসলমানের ধর্মস্থানের সংরক্ষণ বা উন্নতির জন্য অর্থ বা ভূমিদানের প্রচুর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধৃত করছি।

দক্ষিণ ভারতে আদিলশাহী, কুতুবশাহী ও আসফশাহী বংশীয় শাসকগণ হিন্দু দেবস্থানসমূহের সংরক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান করেছেন—এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাস গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুশাসকেরা দিল্লীর বাদশাহের সাথে যুদ্ধরত থেকেও মুসলিম ধর্মস্থানের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য প্রচুর বিত্ত দান করেছেন। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ বুদ্ধগয়া তীর্থের মোহন্তকে মস্তীপুর তারাদি নামক একখানি গ্রাম দান করেন। ঐ গ্রামখানি বুদ্ধগয়া তীর্থের অন্তর্গত। কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবেদিন প্রায়শই অমরনাথ ও সারদাদেবীর মন্দির দর্শন করতে যেতেন এবং শেষোক্ত স্থানে তিনি একটি যাত্রীনিবাস নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। নাজিবাবাদের পাঠান নবাব হরিদ্বার তীর্থে একটি যাত্রীনিবাস নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, এটি এখনও বর্তমান আছে।[৫] হায়দারাবাদের নিজাম ঐ শহরে সীতারামের মন্দিরের জন্য একটি জায়গীর দান করেন। তিনি উত্তর প্রদেশের মাহোরে আর একটি মন্দিরের জন্য এমন একটি জায়গীর দান করেন যার বার্ষিক আয় ষাট হাজার টাকা। নিজাম শিখগুরুদ্বারকেও একটি জায়গীর দান করেন যার বার্ষিক আয় ছিল কুড়ি হাজার টাকা। ফার্সীভাষায় লিখিত একখানি ফার্মান থেকে জানা যায় আহ্‌মদ্ শাহ্ গাজী নামক এক ভূস্বামী আকবরাবাদ জিলায় কস্‌বা আছরেনা নামক স্থানে ঠাকুরজীর মন্দিরের দেবতার ভোগ ও নৈবেদ্যর ব্যয়নির্বাহার্থ দেবতার সেবাইত শীতলদাস বৈরাগীকে সতেরো বিঘা ভূমি দান করেছিলেন।[৬] বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব এলাহাবাদের বিখ্যাত মহেশ্বরনাথের মন্দিরের পুরোহিতকে একটি জায়গীর দান করেছিলেন। সুলতান মুরাদবক্স উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকাল মন্দিরের ঘৃতদীপ জ্বালানোর উদ্দেশ্যে দৈনিক চার সের ঘৃত সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা করবার অভিপ্রায়ে ১১৫৩ হিজ্‌রী সনে একটি জায়গীর দান করেছিলেন।[৭]

হিন্দু রাজা বা ভূস্বামীগণ মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করেছেন এবং মুসলমান শাসক ও ভূস্বামীগণ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেছেন ও উভয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কর্মচারীদের উপরে নির্ভরশীল থেকেছেন, তার অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এ কথা সত্য যে হিন্দু ও মুসলমান যে একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন, উভয় সম্প্রদায়ের পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা তা ভাল চোখে দেখেননি। কিন্তু গ্রামীণ হিন্দু ও মুসলমান, গোঁসাই ভট্টাচার্য ও মোল্লা-মৌলবীদের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে একে অপরের ধর্মীয় উৎসবে আনন্দে অংশগ্রহণ করবার

ব্যাপারকে একটি চিরাচরিত প্রথায় পরিণত করেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি তাদের পারস্পরিক আনন্দ সম্ভোগ ও মৈত্রীবন্ধনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। গ্রামীণ মানুষ পুঁথিগত ধর্মের গোঁড়ামি অনায়াসে পরিহার করে পারস্পরিক উদারতা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে নিজেদের জন্য এক লৌকিক ধর্ম রূপায়িত করে নিয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ধর্মের প্রাণবস্তু শোষণ করে নিয়ে তাকে কঙ্কালে পরিণত করে। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য মানুষের জীবনকে পরিমার্জিত করা, তাকে মহৎ করে তোলা, সামাজিক ন্যায় ও সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা করা। পুরোহিত শ্রেণীর হাতে পড়ে কি হিন্দুধর্ম, কি ইসলামধর্ম, কি অপরাপর ধর্ম, সবই কতকগুলি বাঁধাধরা আচার অনুষ্ঠানের বোতলে বন্দী হয়েছে। পুরোহিতেরা ধর্মের শাঁসকে বিসর্জন দিয়ে খোসা নিয়ে মাতামাতি করবার শিক্ষা দান করে অল্পবুদ্ধি সরল মানুষদেরকে বিপথে চালিত করেছেন, তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন। এই বিভ্রান্তিই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জন্মদান করে, তাকে পোষণ করে। সেই ভেদবুদ্ধি ধর্মের নামে হিংস্রতাকে প্ররোচিত করে।

গ্রামাঞ্চলের লৌকিক ভাষাগুলি হিন্দু বা মুসলমান কোন এক সম্প্রদায়ের ভাষা নয়। হিন্দু আমলের তৎসম, তদ্ভব শব্দবহুল বাংলা ভাষার মধ্যে অজস্র ফার্সী ও উর্দু শব্দ অনায়াসে মিশে গিয়েছে—এমন ভাবে মিশেছে যে আমরা কেউ কখনও মনেও করিনা যে সেগুলি বাংলা শব্দ নয়। আমরা 'রোজ রোজ' 'মেহনৎ' করে 'রুজি' 'রোজগার' করছি, 'আদালতে' যাচ্ছি, সেখানে 'উকীল' নিযুক্ত করে 'আরজি বা দরখাস্ত' করছি, 'হাল' সনের 'খাজানা' দিতে 'জমিনদারের' 'কাছারীতে' ধর্ণা দিচ্ছি হাজার গন্ডা 'ফ্যাসাদ' হাজার 'খেজালত' সামলাতে নিত্য 'হয়রান' হচ্ছি, জানালার পর্দা ছিঁড়ে গিয়ে, শোবার ঘরটা 'বে-আব্রু' করে দিয়েছে, বে-আদপ ছোঁড়াগুলোর 'নজর' ভাল নয়। শুনছি, আজ নাকি বাজারে একটা 'তাজ্জব' কান্ড ঘটে গেছে। আমার 'বরাত' খারাপ—আজ বাজারে যাওয়ার 'ফুরসুৎ' হয়নি। কাশীবাবু 'দিল্'-খোলা মানুষ, 'দেন্দারের' উপর 'জুলুম' করেন না। নায়েব মশায়ের 'রোকা' নিয়ে 'পেয়াদা' এসেছিল—এ জাতীয় ভাষাও আমরা 'হরবখ্ত' বলছি, শুনছি। কোন্ 'হারামীর' এমন 'তাকত্' আছে যে বাংলার গ্রামীণ মানুষের 'ভাষা' থেকে এ সকল মুসলমানী 'বয়ান্' 'খারিজ' করে দেবে?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষেরা একটা সরল সহজ লৌকিক ভাষা তৈয়ার করে নিয়েছে যার মধ্যে হিন্দুর 'বয়ান' ও মুসলমানী 'বয়ান' পরস্পরে দোস্তি করে জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে। এটা হিন্দুর ভাষাও নয়, মুসলমানের ভাষাও নয়। এটা হিন্দু-মুসলমানের চলতি ভাষা, যা কথ্যভাষার খোলস খুলে ফেলে ইদানীং সাহিত্যের আঙ্গিনাতেও সমাদৃত হচ্ছে।

সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে হয়ত এমন এক সংস্কৃতি রচিত হয়েছিল যাকে বিশুদ্ধ 'আর্য-সংস্কৃতি' বলে চিহ্নিত করা যায়। সেই সুদূর অতীতে হিন্দু বলে কোন সম্প্রদায় ছিল না, হিন্দু শব্দটিরও তখন জন্ম হয় নি। 'হিন্দু' শব্দটি মুসলমানের দান। 'সিন্ধু' শব্দ থেকে 'হিন্দু' শব্দব্যুৎপন্ন হয়েছে একথা ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতমন্ডলীর দ্বারা স্বীকৃত। ভারতে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব থেকেই এদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী ইস্‌লামিক দেশগুলির সাথে সিন্ধুনদ ও তার

ভারতীয় সংস্কৃতির মিশ্ররূপ

অববাহিকাগুলির দাক্ষিণ্যপুষ্ট ভারতের উত্তরে পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, এটা সহজেই অনুমান করা যায়। খুব সম্ভবত পারসীক, আফগান এবং তুর্কীজাতির লোকেদের মুখে 'সিন্ধু' শব্দটির উচ্চারণ হত—'হিন্দু'। প্রথম যুগের মুসলিম আক্রমণকারীগণ সেই হিসাবে ভারতবর্ষকে 'হিন্দু' এবং তার অধিবাসীগণকে 'হিন্দু' বলতেন। তখন 'হিন্দু' শব্দ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হত না। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন :

"জাতিবাচক 'হিন্দু' নাম প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। মুসলমানেরা ভারত অধিকার করার পর বিজিত ভারতবাসীকে এই নামে অভিহিত করে এবং এদেশের অধিবাসীদের সকলেরই ধর্মকে 'হিন্দু' এই সাধারণ সংজ্ঞা দেয়। .... মোটের উপর 'হিন্দু' কোন একটি বিশিষ্ট ধর্মের নাম নহে।"[৮] মুসলিম জাতির প্রখ্যাত জননায়ক স্যার সৈয়দ আহমদ্ প্রথম জীবনে জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং সে সময়ে তিনি 'হিন্দুজাতি' বলতে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জাতি বোঝায়, এইরূপ বিবেচনা করতেন। এ বিষয়ে প্রমাণ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিম্নলিখিত উক্তি :

"He (Sir Sayed Ahmed) was a nationalist and a believer in the Hindus and Muslims constituting one nation which he called 'the Hindu nation' on account of both being inhabitants of Hindustan."[৯]

ভারতীয় আর্যগণ সভ্যতার প্রথম যুগে হয়ত বিশুদ্ধ আর্য সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির এই অবিমিশ্র আর্যিকরূপ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ঋগ্‌বেদে যাদেরকে 'দাস', 'দস্যু' বা 'অসুর' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের একাংশ ছিল প্রাগার্য সিন্ধু-সভ্যতার ধারক আর একাংশ ছিল আদিম আরণ্যকগোষ্ঠী, এদেরকে সমষ্টিগতভাবে 'অনার্য' আখ্যায় অভিহিত করা হত। বহুতর দুর্ধর্ষ সংঘর্ষের পর সিন্ধু-সভ্যতার ধারকেরা পরাজিত হয়ে আর্যদের দ্বারা প্রবর্তিত প্রাগ্রসরণশীল কৃষি-অর্থনীতির শরিক হয়ে কালক্রমে আর্যদের সাথে মিশে যায়। ঋগ্‌বেদীয় যুগের পর থেকেই এই মিশ্রণ-প্রক্রিয়া শুরু হয়। অনার্যদের আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই আর্য ও অনার্য উভয় সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা আচার-আচরণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির লেনদেন চলতে থাকে। বহুতর অনার্য আচার-আচারণ আর্যদের সমাজে গৃহীত হয়। অনার্য দেবদেবীর আর্যীকরণ ঘটে। এইভাবে বৈদিকোত্তর যুগে ভারতবর্ষে যে জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা আর্য ও অনার্যদের মিশ্র সংস্কৃতি। ডঃ অতুল সুরের মতে পরলোকে বিশ্বাস, পিতৃপুরুষদের পূজা, পৌষপার্বণ, নবান্ন প্রভৃতি উৎসব, মেয়েদের দ্বারা পালিত অনেক ব্রত, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসাবে চাউল, দুর্বা, কলাগাছ, কলা, পান সুপারি ও হরিদ্রার ব্যবহার ও হুলুধ্বনি আর্যেতর জাতিসমূহের নিকট থেকে আর্যরা গ্রহণ করেছেন। উপাস্য-দেবতা হিসাবে শিলা, বৃক্ষ ও শিশ্নপ্রতীকের উপাসনা আর্যেতর জাতির সংস্পর্শে আর্যদের ধর্মীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিবলিঙ্গপূজা আদিতে আর্য-উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অনার্য অথবা আল্পীয় আর্যগোষ্ঠীভুত প্রাক্-বৈদিক এক আর্যগোষ্ঠীর হাত দিয়ে লিঙ্গপূজা বৈদিক আর্যদের সমাজে প্রবেশ করেছে। ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি নারীদেবতারাও আর্যীকৃত অনার্যদেবতা।[১০]

প্রাচীনযুগে যেমন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংশ্লেষের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি রূপায়িত হয়েছে, মধ্যযুগে অর্থাৎ মুসলমান শাসকদের আমলেও সেইরূপ হিন্দু সংস্কৃতির সাথে মুসলিম সংস্কৃতির সংশ্লেষের ফলে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতি নবরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এই মিশ্রণ এমনভাবে এবং এত বেশী পরিমাণে হয়েছে যে এখন আর তার মধ্য থেকে উপকরণ বাছাই করে নিয়ে ভারতবর্ষীয় হিন্দু সংস্কৃতি ও ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতি নামক দুটি পৃথক সংস্কৃতির পৃথক পৃথক চেহারা উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। 'এক বস্তা বালিমিশ্রিত গুঁড়া চিনি কারও সামনে ঢেলে দিয়ে যদি বলা যায়—এ থেকে চিনি আর বালি বাছাই করে দুটি পৃথক পৃথক বস্তায় ভর্তি কর'— তা হ'লে সেটা যেমন বাতুলের ফরমাইস বলে মনে হবে, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ভারতীয় সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি নামক দুটি বিষয়ে পৃথক ভাগে বিভক্ত করার প্রয়াসও তেমনি বাতুলের প্রয়াস বলে মনে হবে। সাম্প্রদায়িকতা প্রভাবিত এক শ্রেণীর মুসলমান বুদ্ধিজীবী আরব, পারস্য, আফ্‌গান ও তুর্কী দুনিয়ার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেন—ঐ ত আমাদের সংস্কৃতি—ইস্‌লামিক সংস্কৃতি। বলা বাহুল্য ঐসব দেশেও সংস্কৃতির চেহারা পৃথক পৃথক। সংস্কৃতি শুধু ধর্মের বনিয়াদে রূপায়িত হয় না। ধর্ম ছাড়া আরও নানা উপাদান নিয়ে বিশেষ বিশেষ দেশের ও কালের সাংস্কৃতিক কাঠামো রচিত হয়।

বিরোধ-বিসম্বাদের হেতু ও প্রকৃতি

হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের সৃষ্ট একই যৌথ সংস্কৃতির ক্রোড়ে লালিত হয়েছেন, একই আর্থিক রীতির আশ্রয়ে তুল্য ভূমিকায় জীবিকা-অর্জনে রত থেকেছেন, যুগ যুগ ধরে পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তুলেছেন; একই স্থানে এক শাসনব্যবস্থার অধীনে বসবাসের ফলে তাঁদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থসমূহ অপরিহার্য সামাজিক নিয়মে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় অভিষিক্ত হয়েছে (have been bound with each other with ties of unavoidable inter-dependence of individual and multitudinal interests) । তা হ'লে মাঝে মাঝেই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদের নানা কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করলো কিসের প্রভাবে? এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির আলোকে ঐ সকল অবাঞ্ছিত বিরোধের হেতু (cause) ও প্রকৃতি (character) নির্ণয় করতে হবে।

মানুষে মানুষে বিরোধ-বিসম্বাদ সর্বদেশে সর্বকালেই ঘটে থাকে। হিংসাদ্বেষশূন্য, স্বার্থপরতাশূন্য, অসাধুতা ও অবিচার থেকে মুক্ত একটা সার্বিক শুভবুদ্ধিমণ্ডিত মানবসমাজ পৃথিবী আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেনি। সেরূপ আদর্শ সমাজ আজ পর্যন্তও মানুষের কল্পনার আধারেই লালিত হচ্ছে। সর্বশুভময় আদর্শ সমাজ মানুষের চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা। পূর্ণতার সন্ধানে মানুষ ছুটেছে নানা পথে সভ্যতার জন্মকাল থেকে। কিন্তু কতদিনে মানুষের সমাজ সেই পূর্ণতায় উপনীত হবে তা কেউ বলতে পারে না।

আলোর অপর পিঠ যেমন অন্ধকার, ভাল'র অপর পিঠ যেমন মন্দ, তেমনি বন্ধুত্বের অপর পিঠ বৈরিতা, সম্প্রীতির অপর পিঠ বিরোধ-বিসম্বাদ। শ্রেণী-সমাজ অবলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থার হেরফের হবে না। ততদিন পর্যন্ত মানুষের কাজ অশুভকে প্রতিরোধ করা, যা শুভ তাকে রক্ষা করা, তাকে বলীয়ান করা।

পূর্বেই বলেছি যে ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ধর্মোন্মাদনার প্রভাব তাড়িত কোন কোন মুসলমান শাসক এ দেশীয় হিন্দু অধিবাসীদের উপরে নানা নির্যাতনমূলক আচরণ করেছেন বলে ইতিহাসে যে সকল নজির আছে সেগুলি রাজকীয় বিপথগামিতা, সেগুলির জন্য সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণকে দায়ী করা যায় না। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মোন্মাদনা এক প্রকার ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রকোপে ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক সদ্বুদ্ধি লোপ পায়। যে সকল শাসক ইস্‌লামের নামে কাফেরদের নির্যাতন করেছেন, শাসক হয়েও হিন্দু প্রজার উপরে পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন, বলপূর্বক হিন্দুগণকে ধর্মান্তরিত করেছেন কিংবা অন্যবিধ হিংস্র আচরণ করেছেন—ধর্মান্ধতাবশত তাঁদের চিত্তে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে ইস্‌লামের সেবক হিসাবে ঐরূপ কার্য তাঁদের পবিত্র কর্তব্য—কারণ ইস্‌লামই একমাত্র সত্যধর্ম এবং যেন তেন প্রকারেণ কোন ব্যক্তিকে ইস্‌লামের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে পারলে ঐ ব্যক্তির ঐহিক ও পারত্রিক মুক্তি হবে। হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসও ঐরূপ ধর্মান্ধতা প্রযুক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল। কারণ পৌত্তলিকতা (অর্থাৎ তাঁরা যাকে পৌত্তলিকতা বলে মনে করতেন সেই প্রকার ধর্মাচরণ) ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং রাজা হিসাবে আল্লাহ্‌-এর অনভিপ্রেত কার্য বন্ধ করা তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার কার্যের মূল প্রেরণা 'হিংসা' নয়। এখানে মূল প্রেরণা ধর্মান্ধতা প্রযুক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস। এঁরা যে সকল ন্যায়বিরোধী কার্য করেছেন তাকে ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির কার্য বলে মনে করা যায়। বস্তুত আলাউদ্দিন খল্‌জি, ফিরোজশাহ্‌ তুঘলক ও সিকন্দর লোদী প্রভৃতি যে সকল শাসক হিন্দুপীড়নের জন্য কুখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের ধর্মীয় বিবেক একান্তভাবে উলেমাদের (অর্থাৎ মুসলিম পুরোহিত শ্রেণীর) কবলিত ছিল। আর উলেমারা প্রায়শই ছিলেন ধর্মান্ধ—ইস্‌লাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মকে তাঁরা অধর্ম বলে মনে করতেন। ঐতিহাসিক অতুলচন্দ্র রায়ের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি ঃ

সুলতানী যুগ ও মুঘল যুগের শাসকবর্গ

"মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিলে হিন্দুদের নিকট তিনটি পথ খোলা ছিল। ধর্মান্তর গ্রহণ, জিজিয়া কর প্রদান অথবা মৃত্যু। .... সুলতানগণ অত্যন্ত কঠোরতার সহিত হিন্দুদের নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায় করিতেন এবং ইহাকে ইসলাম ধর্মের এক প্রধান অনুশাসন বলিয়া মনে করিতেন। .... হিন্দু নির্যাতন মুসলমান আইনজ্ঞগণ-কর্তৃক সমর্থিত হইত।"[১১] অতুলচন্দ্র রায় আরও লিখেছেন, কাজী মুঘিস উদ্দিন নামক এক উলেমার কাছে আলাউদ্দিন খল্‌জী প্রশ্ন করেন—'হিন্দুদের উপরে কিরূপ আচরণ করা উচিত।' উত্তরে কাজীসাহেব বলেন 'হিন্দুদের একমাত্র কর্তব্য করপ্রদান। রাজস্ব কর্মচারী রৌপ্যমুদ্রা চাহিলে হিন্দুদের উচিত কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা। ঈশ্বর হিন্দুদের জন্য চরম দুর্দশা ও দুঃখই বিধান করিয়াছেন।'[১২] যে সকল ধর্মান্ধ শাসক উলেমাদের উপদেশ ঈশ্বরবাক্যের ন্যায় পবিত্র বলে মনে করতেন, তাঁরা ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসবশে হিন্দু নির্যাতন করেছেন—ধর্মকার্য করছেন মনে করে। সুতরাং আলাউদ্দিন খল্‌জী প্রভৃতির হিন্দু নির্যাতন বিবাদ, বিরোধ বা হিংসার মনোভাব-প্রসূত ছিল না। 'ঈশ্বরের তুষ্টিজনক ধর্মাচরণ করছি' এই মনোভাবই এঁদের বর্বর আচরণের প্রেরণা ছিল। সুলতানী (পাঠান) আমলের শাসকেরা প্রায়শই হিন্দুদের প্রতি অনুদার নীতি বলম্বন করেছেন (মহম্মদ বিন তুঘলক উদ্ধত ও খামখেয়ালী ছিলেন, কিন্তু ধর্মান্ধতা তাঁর

ছিল না)। কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর দিল্লীর সিংহাসনে পাঠান সুলতানগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ভারতে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। রাজসভার বাইরে, একত্র বসবাসের ফলে হিন্দু-মুসলমানে খানিকটা সমঝোতা ও সহনশীলতার সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুগল শাসক বাবরের সিংহাসনারোহণের সময় থেকেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বাবরই সর্বপ্রথম উদারচিত্ত মুসলমান শাসক। বাবর তাঁর গোপন 'উইল'-এ পুত্র হুমায়ুনের প্রতি যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ করে রেখে যান, তা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। উপদেশগুলির সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হল ঃ

"পুত্র! ভারতরাজ্যে নানা ধর্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ঈশ্বরের অসীম করুণা যে এইরূপ একটি রাজ্যের অধিপতিত্ব তুমি লাভ করেছ। হৃদয় থেকে সর্বপ্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি অপসৃত করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। যার ধর্মে যেরূপ বিধিনির্দেশ আছে, সেই অনুসারেই তার প্রতি ন্যায়বিচার করবে। বিশেষ করে, গোবধ পরিহার করবে, তাহলেই তুমি হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হবে এবং এ দেশীয় প্রজাগণ তোমার প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। রাজকীয় শাসন যারা স্বীকার করে নিয়েছে তারা যে ধর্মাবলম্বীই হোক্ না কেন তুমি তাদের মন্দির ধ্বংস করবে না কিংবা তাদের তীর্থস্থান কলুষিত করবে না.... অত্যাচারের তরবারির চেয়ে (প্রজাদের) আনুগত্যের তরবারি দিয়ে ইস্‌লামের সেবা উৎকৃষ্টতররূপে করা যায়। সিয়া ও সুন্নীদের বিবাদে মাথা গলাবে না—ঐ রূপ বিবাদ ইস্‌লামের দুর্বলতাই প্রকট করে।"[১৩] বাবরের পুত্র হুমায়ুন হিন্দুদলনের পথ গ্রহণ করেননি। হুমায়ুনের রাজত্বের মাঝখানে ছয় বছর পাঠান সমরনায়ক শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন, এবং রাজ্যশাসন ব্যাপারকে উলেমাদের প্রভাবমুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। হুমায়ূনের পুত্র বাদশাহ আকবর ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষ। ইতিপূর্বে বাবরের যে 'উইল'-এর কথা বলা হয়েছে, সেই উইলে লিখিত পিতামহের উপদেশ সমূহের তাৎপর্য আকবর ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্প্রীতি ও আনুগত্য লাভ করতে না পারলে ভারতবর্ষে সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্যশাসন যে প্রায় অসম্ভব, পিতামহের এই দূরদর্শিতার উত্তরাধিকার আকবর ভালভাবেই বহন করেছিলেন। বস্তুত রাজ্যশাসন ব্যাপারকে সম্প্রদায়িকতামুক্ত ও পুরোহিত শ্রেণীর অর্থাৎ উলেমাদের প্রভাবমুক্ত করতে আকবর যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সে সকল উদ্যোগের ফলে মুগলদের যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হয়। আকবর চৌদ্দ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং একটু সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েই ২০ বৎসর বয়সে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর প্রথা রহিত করেন। এর পূর্বেই তিনি হিন্দুদের উপর আরোপিত 'তীর্থকর' রহিত করেন। আকবরের সময় থেকেই হিন্দুরা আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন না করে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। বাদশাহ আকবর ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মস্থানের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য অনেক জায়গীর দান করেন। তিনি শিখগুরু রামদাসকে ৫০০ বিঘা জমি জায়গীর দান করেন। সেই জমির উপরে রামদাস 'অমৃতসর' নামে এক বিশাল সরোবর খনন করেন। বর্তমান অমৃতসর নামক শহর তার স্মৃতি বহন করছে। উচ্চপদে হিন্দু রাজকর্মচারী নিয়োগও আকবরের আমল থেকেই চালু হয়। বিচার ব্যবস্থাতেও আকবর হিন্দুদের মামলা মোকর্দমার বিচারের ভার হিন্দু বিচারকদের হাতে

ন্যস্ত করেন। ধর্মের ব্যাপারে আকবর ছিলেন উদার মতাবলম্বী। তিনি সার্বজনীন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সকল ধর্মের মানুষের জন্য একটি সার্বজনিক উপাসনালয় বা 'এবাদৎখানা' নির্মাণ করিয়েছিলেন আকবর। তিনি উলেমাদের প্রভাব খর্ব করেন। তাদের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে হিন্দুধর্ম, ইস্‌লাম ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের সারবস্তু নিয়ে 'দীন্ ইলাহি' নাম দিয়ে এক নূতন ধর্মমত প্রচারের চেষ্টা করেন। আকবর হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থসমূহের ফার্সীভাষায় অনুবাদ করানোর জন্য একটি অনুবাদ বিভাগ স্থাপন করেন। আকবরের উদার ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নীতি মুগল সিংহাসনের প্রতি হিন্দুদের আনুগত্য অর্জনে সমর্থ হয় এবং তার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তার ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হয়।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহের চরিত্রে নানা দুর্বলতা থাকা সত্বেও ধর্ম সম্পর্কে তিনি গোঁড়ামিমুক্ত এবং পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। সুতরাং বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উদার নীতির ঐতিহ্য বাবরের প্রপৌত্র জাহাঙ্গীরের কাল পর্যন্ত অটুট ছিল। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে এই নীতিতে ফাটল ধরে। শাহজাহানের চরিত্রে নানা গুণ ও নানা দোষ একত্র সম্বদ্ধ ছিল। তাঁর চরিত্রে আকবরের উদারতা ও আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণতার একত্রমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি হিন্দু বিদ্বৎমন্ডলীর সমাদর করতেন, উচ্চ রাজপদে হিন্দুদের নিয়োগে তাঁর কৃপণতা ছিল না, আবার অন্যদিকে তিনি হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণে উৎসাহ দিতেন। তাঁর আদেশে কাশীধামের অনেক হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা হয়। বাদশাহ আলমগীর বা আওরঙ্গজেব ছিলেন নৈষ্ঠিকভাবে গোঁড়া মুসলমান। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ইস্‌লাম অনুমোদিত চারিত্রিক শুচিতার আদর্শ নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন, মদ্য স্পর্শ করতেন না, বিলাসবহুল আমোদ-প্রমোদের প্রতি তিনি নিস্পৃহ ছিলেন, আহারে ও পরিচ্ছদে সংযত ছিলেন, নিরামিষ আহার গ্রহণ করতেন, রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গ্রহণ করতেন না, বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত অন্য নারীর সংসর্গ সযত্নে পরিহার করতেন। কিন্তু অপরের ধর্মমত সম্পর্কে তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু এবং শত্রুভাবাপন্ন। তিনি ছিলেন প্রকাশ্যত হিন্দুবিদ্বেষী। তিনি বিশ্বাস করতেন ইস্‌লামের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে কাফিরদের উদ্ধার করা (অর্থাৎ ধর্মান্তরিত করা), অন্যথায় তাদের নির্যাতন করা, ধর্মীয় নির্দেশ। ইস্‌লামের আদর্শবিরোধী যাবতীয় ধর্মীয় আচার যথা দেবমূর্তির উপাসনা, সর্বপ্রকার পূজার্চনা ইত্যাদি বিনষ্ট করা তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য। ইস্‌লামী মতের মধ্যেও আওরঙ্গজেব ছিলেন 'সুন্নী' সম্প্রদায়ভুক্ত। এজন্য তিনি হিন্দুদলনের সাথে সাথে 'সিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের উপরেও দলননীতি চালিয়েছেন। আকবর যে 'জিজিয়া' কর রহিত করেছিলেন, আওরঙ্গজেব তা পুনঃপ্রবর্তন করেন। আওরঙ্গজেবের আমলে উচ্চ প্রশাসনিক পদে হিন্দুদের নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শতকরা পাঁচ টাকা হারে এক বিশেষ শুল্ক আদায়ের আদেশ প্রদান করেন আওরঙ্গজেব (জিজিয়া করেরই অপর এক রকমফের)। তিনি হিন্দুদের বিদ্যালয় ও দেবমন্দিরসমূহ ধ্বংস করবার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রতি হুকুমনামা জারী করেন। ঐতিহাসিক অতুল রায় লিখেছেন : "এক বৎসরের মধ্যে একমাত্র মেবারেই ২৪০-টি মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল।"[১৪] ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুদের সমস্ত ধর্মমেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়। "কথিত আছে যে জিজিয়া করের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে সম্রাটের আদেশে বহু হিন্দুকে হত্যা করা হয়।"[১৫] আওরঙ্গজেব এরূপ হুকুম জারী করেন যে হিন্দুদের 'হোলি' 'দেওয়ালী' প্রভৃতি উৎসব একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই অনুষ্ঠিত হতে পারবে, এবং সেরূপ অনুষ্ঠান হবে রাজকর্মচারীর (অর্থাৎ মুসলমান রাজকর্মচারীর) নিয়ন্ত্রণাধীনে। আওরঙ্গজেব 'বহু হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেন।'[১৬] শিখদের প্রতিও আওরঙ্গজেব দলননীতি প্রয়োগ করেন। তাঁর আদেশে গুরু তেগ্‌বাহাদুরের শিরচ্ছেদ করা হয়।

আওরঙ্গজেবের অতিশয়িত ধর্মীয় গোঁড়ামি মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল নড়িয়ে দেয়। প্রকৃত পক্ষে আওরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্যের কবর খোঁড়ার কাজ সম্পূর্ণ করে রেখে যান। তাঁর পরে প্রথম বাহাদুর শাহ্ থেকে সুরু করে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ পর্যন্ত যাঁরা সম্রাটের পোষাক পরিধান করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন, শাসন করবার মত কোন 'সাম্রাজ্য' তাঁদের দখলে ছিল না। আর ছিল না অর্থবল ও সৈন্যবল। সুতরাং তাঁদের কথা আলোচনার বাইরে রাখছি।

বাবর প্রবর্তিত ধর্মীয় উদারতার নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ শক্ত করেছিল—তার বিপুল সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল। বাবরের পুত্রের প্রপ্রৌত্র ধর্মীয় গোঁড়ামির ভূতগ্রস্ত হয়ে সেই সুবিশাল ও সুদৃঢ়-সাম্রাজ্যের কবর রচনা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর আয়ু শেষের সাথে সাথে মুঘলবংশের গৌরবসূর্য্যও অস্তমিত হল। ক্রমাগত খামখেয়ালী সামরিক অভিযানে রাজকোষ শূন্য হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সকল গ্রন্থি শিথিল হয়ে গেল। বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাত-আট বছরের মধ্যেই দিল্লীর মানুষ দেখতে পেলো দিল্লীর রাস্তার ধারে সরাবখানা থেকে মাটির ভাঁড়ে মদ নিয়ে গলায় ঢেলে রক্ষিতা লাল কুঁয়রের গলা ধরে প্রকাশ্য রাস্তায় ধেই ধেই করে নাচছে—সম্রাট শাহজাহানের প্রপ্রৌত্র, সম্রাট আলমগীরের প্রৌত্র মাস্তান- সম্রাট জাহান্দর শাহ্!

ধর্মীয় গোঁড়ামির কাছে আত্মসমর্পণের এই পরিণতি! ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মোন্মাদনা কদাচ শুভফলপ্রদ হয় না। ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষকে অ-মানুষ করে, মনুষ্যত্বকে পঙ্কিল করে, সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করে, রাষ্ট্র ধ্বংস করে, বিশাল সাম্রাজ্য ছারখার করে দেয়।

মানুষে মানুষে বিরোধ-বিসম্বাদ মনুষ্যসমাজে সততই ঘটছে। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থবোধ, কোন কোন মানুষের মনের গঠন, অসামাজিক কর্ম, পাপকর্মের প্রতি কোন কোন মানুষের সহজাত প্রবণতা, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত মান-অপমানের ব্যাপার—ইত্যাদি মানবমনের নানা ছিদ্রপথে, বিদ্বেষ, বিরোধ, কলহ ও হিংসাত্মক সংঘর্ষ ঘটে থাকে, সুস্থতা এবং ব্যাধিগ্রস্ততা—দুই যেমন মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তি, তেমনি সম্প্রীতি ও বিরোধ মানবসমাজের স্বাভাবিক ব্যাপার। ব্যাধি জিনিষটা যেমন কারও বাঞ্ছিত ব্যাপার নয়, তেমনি বিবাদ বিসম্বাদও কোন সামাজিক মানুষের অভিপ্রেত ব্যাপার নয়। তথাপি মানুষ ব্যাধির কবলিত হয়, মানুষে মানুষে বিবাদ বাধে, সে বিবাদ হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে হতে পারে। আবার হিন্দুতে মুসলমানেও হতে পারে। শুভে অশুভে স্থাপিত পাদপীঠের উপরে যে সমাজসৌধ অবস্থিত রয়েছে তার স্বাভাবিক রীতিতে এ সকল বিরোধ, বিসম্বাদ ও সংঘর্ষ ঘটে থাকে। সুতরাং হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হলেই সেটা সাম্প্রদায়িক বিরোধ হবে এরূপ চিন্তা অসঙ্গত। সমাজের স্বাভাবিক রীতি অনুসরণ করে একই পরিবারের মধ্যে, দুই ভ্রাতার

মধ্যে, পিতৃব্যে-ভ্রাতুষ্পুত্রে, দুই বন্ধুর মধ্যে, এমন কি পিতাপুত্রে, কি স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদ দেখা যায়। সম্পত্তির দাবি নিয়ে, ভূমির সীমানা নিয়ে, দুজনের আভিজাত্যের মান নিয়ে—নানা ব্যাপার নানা সূত্র আশ্রয় করে যে সকল নিত্যনৈমিত্তিক বিরোধ হয় তার পরিমন্ডল থাকে ক্ষুদ্র, তাদের প্রভাব হয় ক্ষণস্থায়ী। বিরোধ হয়, দু'-দিন পরে আবার মিটে যায়।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধের চরিত্র ভিন্ন প্রকার। কোন একজন ব্যক্তির খড়ের ঘরে দৈবাৎ আগুন উড়ে এসে পড়লে তার ঘরখানা জ্বলে ওঠে। গ্রামের লোক ছুটে আসে আগুন নেভাতে, কারণ তারা জানে আগুন বিস্তৃত হওয়ার আগে আগুন নিভিয়ে না ফেলতে পারলে সে আগুন গ্রামবাসীর সকলের ঘর গ্রাস করতে পারে— সকলের ঘর দগ্ধ করতে পারে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও হিংস্রতার সময়ে মানুষের এই শুভবুদ্ধি লোপ পায়। ক্ষুদ্র একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে— সে আগুন নেভাতে কেউ ছুটে আসে না। সাম্প্রদায়িকতার বিষ মানুষের মনে এমন এক সম্মোহ সৃজন করে যে সম্মোহের প্রভাবে মানুষ মনে করতে থাকে আগুন ছড়ানোই তার পবিত্র কর্তব্য—আগুনের বিস্তারই কাম্য—সে আগুনে যে নিজে এবং তার একান্ত আত্মীয়গণ ভস্ম হয়ে যেতে পারে একথা তার মনে উদয় হয় না। সাম্প্রদায়িক বিরোধ মুহূর্ত মধ্যে প্রচুরতম লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয়। পৈশাচিক হিংসায় মানুষ উন্মত্ত হয়, নিরপরাধের শোণিতে পথের মাটি রক্তপঙ্কে পরিণত হয়। গৃহহীনের ও শোকাতুর নরনারীর হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হয়।

যে ব্যাধি স্বাভাবিক পথে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে তার প্রতিষেধের উপায় থাকে। আরোগ্যেরও নানা সহজ উপায় থাকে। কিন্তু ব্যাধির বীজ যখন কৃত্রিম উপায়ে সুকৌশলে মনুষ্যদেহে অনুপ্রবিষ্ট করা হয় তখন তার প্রতিষেধ ও প্রতিকার দুইই দুরূহ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে, কিংবা পঙ্গু করে দেওয়ার দুরভিসন্ধি প্রযুক্ত হয়ে অপর কোন ব্যক্তি যদি সুকৌশলে তার দেহে মারণ বিষ সংক্রমিত করে, তা হলে প্রায়শই সেই বিষের ক্রিয়া সর্বপ্রকার চিকিৎসাকে হার মানায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সাম্প্রদায়িকতার বিধ্বংসী শক্তিও অতি প্রবল হয় এবং তা দুশ্চিকিৎসা হয়ে থাকে। এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতা জাতির দেহকে দুশ্চিকিৎসরূপে বিষজর্জর করে তোলে। ভারতবর্ষে ইংরাজেরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের তাগিদে একদল শ্রেণীস্বার্থপরায়ণ প্রতিষ্ঠালোলুপ রাজনৈতিক নেতাকে বশীভূত করে তাদের মাধ্যমে সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল ধরে ভারতীয় জাতিদেহে সাম্প্রদায়িকতার বিষ অনুপ্রবিষ্ট করেছে। তারই পরিণতিতে ভারতবর্ষ হয়েছে দ্বিখন্ডিত, রক্ত ও অশ্রুর প্লাবনের মধ্য দিয়ে।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধের আপাত দৃষ্ট উৎস সমূহ

ব্রিটিশ শাসনের আমলে সাম্প্রদায়িক হিংসার পৌনপুনিক তান্ডবে ভারতবর্ষ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে-সকল সংঘটনকে উপলক্ষ করে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে সেগুলি প্রায়শই গুরুত্বহীন তুচ্ছ ব্যাপার। মুসলমানদের মসজিদের সামনে হিন্দুগণ কর্তৃক বাজনা বাজানো এবং মুসলমানগণ কর্তৃক খাদ্যের জন্য বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য গো-বধ, এ-দুটি ব্যাপার অনেক সময়ে যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু জনতার মনে সাম্প্রদায়িক হিংসার উত্তেজনা যুগিয়েছে। ক্বচিৎ কখনও কোন অজ্ঞাতনামা দুষ্ট লোক ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, সে ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ পক্ষ অপর সম্প্রদায়কে সমষ্টিগতভাবে ঐ অপকর্মের জন্য

দায়ী করেছেন। তাই নিয়ে বাদবিতণ্ডায় উভয় সম্প্রদায় উত্তপ্ত হয়েছে। পরিণামে এই বিতণ্ডা ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হিংস্রতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। কখনও নিতান্ত ব্যক্তিগত কলহ, বা একের প্রতি অপরের ব্যক্তিগত অন্যায় অচরণের দায়িত্ব অন্যায়কারী যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের উপর আরোপ করবার ফলে বিস্ফোরণোম্মুখ (Explosive) পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে যা পরিণামে রক্তক্ষয়ী হানাহানিতে পর্যবসিত হয়েছে। কখনও বা নিছক ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাম্প্রদায়িক বৈর সঞ্জাত হয়েছে। পরিণামে সে বৈর সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন উদ্গীরণ করেছে।

ভাবতে গেলে আবাক লাগে যে এই দুটি ব্যাপার (মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো এবং গো-বধ)—যা অতি সহজেই মীমাংসা করে নেওয়া যেতে পারে, তা কি করে দীর্ঘকাল ধরে পৌনঃপুনিক অমানুষিকতাপ্রসূত সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের কারণ হচ্ছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কেন স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে এই সকল সামান্য ব্যাপার নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিতে পারছেন না? যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে যুগ যুগ ধরে একই এলাকায় একত্র বসবাস করতে হচ্ছে, সেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই অপর সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অবশ্য কর্তব্য। গীতবাদ্য যদি ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ কর্ম বলে গণ্য হয়, তা হলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা প্রত্যহ দেখতে পাচ্ছি, মুসলমানেরা সম্প্রদায় হিসাবে সে নিষেধ মেনে চলেন না। গান বাজনার প্রখ্যাত ওস্তাদগণ বেশীর ভাগই মুসলমান এবং মুসলমান নবাব-বাদশাহ জমিদারদের অকৃপণ আনুকুল্যের দ্বারা পুষ্ট হয়েই সঙ্গীতকলার অপরিমেয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। গীতবাদ্যের চর্চা ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির এক প্রধান অংশ। জনমনোরঞ্জনকারী বিদ্যার এক প্রধান শাখা গীতবাদ্য এবং এই কলাবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মুসলমানদের অবদান অসামান্য। আকবর বাদশাহ থেকে সুরু করে অনেক বাদশাহ, লক্ষ্ণৌ-এর নবাববংশ এবং আরও অনেক মুসলিম শাসক ও অভিজাত মুসলমান গীতবাদ্যের অনুশীলনের পৃষ্ঠপোষকতা করে গিয়েছেন। উচ্চ-শব্দবহুল যে সকল বাদ্যভাণ্ড উৎসবাদিতে জনমনকে আমোদিত করে, (যেমন ব্যাণ্ডবাদ্য, জয়ঢাক, বাঁশী, ব্যাগ্‌পাইপ প্রভৃতি) তার পরিবেশকদের শতকরা আশীভাগ মুসলমান। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানেরাই কলাবিদ্যার এই শাখাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সুতরাং সুদূর অতীতের নিষেধবাক্য মুসলমানগণের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বন্যাস্রোতে ভেসে গিয়েছে। অথচ সঙ্ঘর্ষের অছিলা খুঁজতে গিয়ে মুসলমানগণের নিত্যনৈমিত্তিক আচরণের দ্বারা অসমর্থিত বহু শতাব্দী পূর্বের একটি বিস্মৃতপ্রায় শাস্ত্র নির্দেশকে কাজে লাগানো হয়। অবশ্য মসজিদে উপাসনার সময়ে মসজিদের সামনে যে কোন প্রকার হৈহল্লা নিন্দনীয়। হিন্দু বাড়ীতে যখন কোন হিন্দু ধ্যানরত রয়েছেন, কিংবা পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, কিংবা চণ্ডীপাঠ বা গীতাপাঠ করছেন, তখন যদি অপর কোন হিন্দু সেখানে গিয়ে বাদ্যভাণ্ড সহকারে উদ্দামনৃত্য করতে থাকেন কিংবা ঢাক পেটাতে থাকেন, তা হলে যে কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু ঐরূপ কার্য্যকে তিরস্কার করবেন। হিন্দুর বাড়ীর উপাসনাকালে হিন্দুরা যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন—মুসলমানের বাড়ীতে কিংবা ধর্মালয়ে উপাসনা চলতে থাকাকালে তার প্রতিও অনুরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য। এক শহরে বা এক গ্রামে যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক পাশাপাশি বাস করেন তাহলে পরস্পরের ধর্মস্থান এবং ধর্মীয়

কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সেই একত্র বসবাসের একটা আবশ্যিক সর্ত্ত। এই শ্রদ্ধা বর্জিত হলে তা মর্মান্তিক সামাজিক অকল্যাণের কারণ হয়। পক্ষান্তরে, পূর্বোক্ত রূপ শ্রদ্ধার অনুশীলনের দ্বারা আমরা ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবেও একে অপরের সৌহার্দ অর্জন করতে পারি। হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি জাতির জীবনকে উন্নত করতে পারে। উভয় সম্প্রদায়ের লোকের সুখ, শান্তি ও কর্মশক্তি প্রবর্দ্ধিত হয়, জীবনে নিরাপত্তা আসে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মসজিদের সামনে গীতবাদ্যের সমস্যা সুবিবেচনা সম্পন্ন হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকেরা অনায়াসে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহনশীলতার মধ্য দিয়ে মীমাংসা করে নিতে পারেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে অতীতকে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, আপৎকালে সকলেরই বিবেক জড়তার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়।

অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে যে দুই সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সময়োপযোগী তৎপরতার অভাব ও সঙ্কটকালে তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা প্রচন্ড হিংসাত্মক সঙঘর্ষের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মানুষকে যে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার তান্ডব প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে তার মূলে ছিল একটি ক্ষুদ্র ঘটনা। ঐ সময়ে মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের ব্যবস্থানুসারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন ছিল প্রত্যাসন্ন। পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচন—যা ১৯২৩-এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার ফল ইংরেজশাসক সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে যায়—কারণ সেই নির্বাচনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দ্বারা পরিচালিত স্বরাজ্য দল নির্বাচনযোগ্য আসনসমূহের অধিকাংশ লাভ করে এবং ৩৯-টি নির্বাচনযোগ্য (elective) মুসলিম আসনের একুশটি প্রাপ্ত হয় স্বরাজ্যদল। এই ঘটনা ইংরেজ শাসকবর্গের এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতাদের সবিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। ইংরেজ শাসক ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম রাজনীতিক—এ দুইয়ের পারস্পরিক মেলবন্ধনের উপরেই উভয়ের শক্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করছিল। ১৯২৩-এর নির্বাচন প্রমাণ করলো যে মুসলমান ভোটদাতাগণের গরিষ্ঠাংশ ইংরেজবিরোধী ও কংগ্রেস সমর্থক। সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা প্রমাদ গুণলেন—তাঁরা দেখলেন তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। এতদিন তাঁরা ইংরেজের কাছে সুযোগসুবিধা লাভ করে আসছেন এই দাবির উপরে যে, মুসলিম জনমত তাঁদের পক্ষে রয়েছে, তাঁরাই মুসলিম সমাজের ন্যায়সম্মত প্রতিনিধি। ১৯২৩-এর নির্বাচনের ফল তাঁদের এই দাবিকে ধূলিসাৎ করলো। ইংরেজরাও প্রমাদ গণলেন। তাঁরা দেখলেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতি (Policy of divide and rule) যা ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের ধারকস্তম্ভ রূপে বিবেচিত হত, সেই স্তম্ভে বিরাট ফাটল ধরেছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী (অতএব রাজভক্ত) মুসলমানদেরকে সামনে ঠেলে দিয়ে ভারতবাসীদের জাতীয় স্বাধিকার লাভের অন্দোলনকে তাঁরা এতদিন প্রতিরোধ করে আসছেন—সে প্রতিরোধ-প্রাচীর বুঝি এবারে ধূলিসাৎ হয়।

১৯২৬ সালের কলকাতার দাঙ্গা ও তার পশ্চাৎপট

অতএব, পরবর্তী অর্থাৎ ১৯২৬-এর নির্বাচনের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের কিছুকাল পূর্ব থেকে সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, মুদ্রিত ইস্তাহার, পীর ও উলেমাগণের নামাঙ্কিত 'ফতোয়া' ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমান জনতার মধ্যে অজস্র ধারায় উগ্র-সাম্প্রদায়িকতাবোধের বিষবারি

বর্ষণ শুরু হল। মোল্লা, মৌলানা ও ইংরেজের অনুগ্রহজীবী রাজনীতিকগণ গ্রামে, গঞ্জে 'ধর্মসভা' ডেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে লাগলেন। এই দূরভিসন্ধিপ্রযুক্ত ও সুপরিকল্পিত বিষ ছিটানোর অভিযানের পশ্চাতে যে শাসক ইংরেজের গোপন হস্তের সক্রিয়তা ছিল, তা সহজেই অনুমেয়—কারণ আসন্ন নির্বাচনে ১৯২৩-এর বিপরীত ফল অর্জন করতে না পারলে দুই পক্ষেরই ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিতরূপে বিপন্ন হবে। এ সম্পর্কে জনৈক বিদেশী গবেষকের মন্তব্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন ঃ

"The Bengal Government had given sufficient inducement to obtain Muslim support: however this would not be of any practical advantage unless the community had sufficient unity and political organisation to ensure the election to the Legislative Assembly of representatives who would vote consistently with the Government.... In the latter half of 1925, the Government decided to take a hand in this work of organisation."[১৭]

এই লেখক আরও লিখেছেন ঃ

"From 1924 to 1926 the Government of Bengal used its power to ensure that there was no such compromise* in its province. Sir Abdur Rahim, a communalist to the core, called the pace and he was aided and abetted by shortsighted British officials."[১৮]

সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও ইংরেজের অনুগ্রহজীবী মুসলিম নেতাদের সমকালীন মনোভঙ্গীর প্রমাণস্বরূপ ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে স্যার আবদুর রহিম কর্তৃক প্রদত্ত 'সভাপতির ভাষণটি'ও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ ভাষণ সম্পর্কে মিঃ ব্রুম্‌স্‌ফিল্ড মন্তব্য করছেন ঃ ".....he told his community that time had come for an organised fight for Muslim rights. The political existance of the community was endangered by Hindu ambitions, and the muslims must resist their achievement with every weapon available. The Hindus were a menace to the British and the Muslim alike. If the British would willingly concede the Muslims' just demands, they will have the Muslim community as their ally in the coming battle."[১৯]

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯২৬-এর সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হওয়ার কালে ইংরেজ রাজশক্তি ও সাম্প্রদায়িকতাপন্থী ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতাদের একটা অশুভ আঁতাত রূপায়িত হচ্ছে। শাসকেরা জাতীয় স্বাধিকারের আন্দোলনের প্রতিপক্ষ রূপে এই মুসলিম রাজভক্তগণকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে 'যুদ্ধজয়ের' সহজ পথ উদ্ভাবন করেছেন। ইংরেজভক্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন—

* ঐ সময়ে জাতীয় পর্যায়ে মুসলিম সমাজে দাবি নিয়ে একটা সমঝোতার চেষ্টা চলছিল। 'such compromise' বলতে লেখক সেই প্রয়াসকে লক্ষ্য করেছেন।

'ইংরেজ ও মুসলমানগণের যৌথশত্রু' (common enemy) হিন্দুদের (অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের) দমন ও দলনের ব্যাপারে, আর সেই সাথে এই নেতারা মুসলিম জনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁক ছাড়ছেন—'হিন্দুদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে.... যে কোন হাতিয়ার ব্যবহার করে এ বিপদ রোধ করতে হবে।'—'যে কোন হাতিয়ার' (every weapon available) কথাটিও গভীর তাৎপর্যমন্ডিত। নির্বাচনের আগে হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য প্রকাশ্যে ডাক দেওয়া হয়েছে।

মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণার ফলে মুসলিম জনতার মন যখন প্রায় বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে সেই সময়ে আরও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। ১৯২৩-এর জানুয়ারী মাসে স্যার আবদুর রহিম একটি উপনির্বাচনের মাধ্যমে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে *হানাফী* নামক সংবাদপত্রে মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে স্যার আবদুর রহিমের একটি বার্তা (message) প্রকাশিত হয়। মুসলিম লীগের আলিগড় অধিবেশনের প্রদত্ত বক্তৃতার মত তাঁর এই বার্তাও ছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ এক বিষভান্ড। এই বার্তা প্রকাশের পরে মুসলিম সংবাদপত্রসমূহে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারিত হতে থাকে।

এই অবস্থায় ২রা এপ্রিল ১৯২৮ তারিখে আর্যসমাজের বার্ষিক শোভাযাত্রা বাহির হয়। ঐ শোভাযাত্রায় জয়ঢাক ও অন্যপ্রকার বাদ্যভান্ডের আয়োজন ছিল, হ্যারিসন রোড দিয়ে বাদ্যভান্ড সহকারে শোভাযাত্রা অগ্রসর হতে থাকে। হ্যারিসন রোডে দীনু মিঞার মসজিদের সামনে শোভাযাত্রা পৌঁছোলে মসজিদ থেকে কিছু সংখ্যক মুসলমান বেরিয়ে এসে বাজনা বন্ধ করতে বলেন। বেশীর ভাগ বাদ্যকর তাঁদের অনুরোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বাজনা বন্ধ করে। কিন্তু সামনের দিকে কয়েকজন বাদ্যকর ঐ অনুরোধ অমান্য করে জয়ঢাক বাজাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। বাত্যাতাড়িত অগ্নিশিখার মত দাঙ্গা অল্প সময়ের মধ্যে সারা সহরে ছড়িয়ে পড়ে। একটানা ১৪ দিন হানাহানি চলতে থাকে। ৫০ জন নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়, আহতের সংখ্যা ৭০০-তে পৌঁছোয়। বহু গৃহ ও ধর্মস্থান লুণ্ঠিত হয়। মিঃ ব্রুমস্ফিল্ড লিখছেন : "Shops were looted and burnt; Temples, Mosques and Gurdwaras were razed"[২] ১৫ই এপ্রিল অবস্থা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু ২৪শে তারিখে রাজরাজেশ্বরী প্রতিমার ভাসানের দিন পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয় এবং আরও দুই সপ্তাহ চলে। আরও ৭০ জন নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়।

এই ঘটনার মধ্য থেকে দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত। প্রথমত, আপাত দৃষ্টিতে মসজিদের সামনে বাজনা ঐ মর্মান্তিক ঘটনার কারণ বলে প্রতীয়মান হলেও ঐ ক্ষুদ্র ব্যাপারকে ঘটনার কারণ বলে বর্ণনা করা ঠিক হবে না। বিশেষ শক্তিশালী দুটি পক্ষ পরস্পরের সহযোগিতায় এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে অল্পবুদ্ধি, সরল এবং ধর্মোন্মাদনা-প্রবণ মুসলিম জনতার সামনে ক্রমাগত উত্তাপ পরিবেশনের দ্বারা তাকে বারুদের স্তূপে পরিণত করেছিল এবং এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যে কোন রকমে আগুনের একটি স্পর্শ পেলেই তা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। হিংস্র সঙ্ঘর্ষের প্রস্তুতি পিছন থেকে সম্পন্ন করে রেখেছিল স্বার্থসম্পন্ন দুটি পক্ষ—মসজিদের সামনে বাজনা একটা দৈবাগত উপলক্ষমাত্র। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িকতার

বিষাক্ত মদ্যপানে বিবদমান দুই পক্ষেরই সাধারণ সুবিবেচনা লোপ পেয়েছিল--তা না হলে ঘটনার এতদূর অগ্রগতি ঘটতো না--সূচনাতেই মিটমাট হয়ে যেতে পারত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাঙ্গায় যারা লিপ্ত হয় তারা ছায়াবাজীর পুতুলের মত যবনিকার অন্তরালবর্তী কোন দুষ্ট হস্তের দ্বারা চালিত হয়--দাঙ্গার ফলে নিহত হয়, আহত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ--দাঙ্গার সাথে প্রায়শ তাদের কোন যোগ থাকে না, শুধু হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্যই তারা নিহত হয়, আহত হয়, নিঃস্ব হয়।

আলোচ্য ঘটনায় আর্যসমাজের নেতারাও তাঁদের সামাজিকদায়িত্ব পালনে শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রচার কার্যের ফলে মুসলিম মানস বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে রয়েছে, এটা তাঁরা জানতেন। তৎসত্ত্বেও মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্যভান্ড সহকারে মিছিল নিয়ে যাওয়া তাঁদের ঘোরতর অবিমৃষ্যকারিতার কাজ হয়েছে। তা ছাড়া মসজিদের সামনে মিছিল পৌঁছোনোর কিছু আগেই বাজনা বন্ধ করে দেওয়া যেতো। তৃতীয়ত, যে কয়জন বাদ্যকর জিদ্ করে জয়ঢাক বাজাচ্ছিল তাদেরকে নিবৃত্ত করার দায়িত্ব ছিল মিছিলের পরিচালকগণের। সে কর্তব্য তাঁরা পালন করেন নি। আর্যসমাজীদেরও মুসলমানদের মতই ধর্মীয় গোঁড়ামি আছে, সম্প্রদায়গত জাত্যভিমান আছে। সম্ভবত সেই অভিমানই সাময়িকভাবে তাঁদের শুভবুদ্ধি বিলোপ ঘটিয়েছিল। মুসলমানদের মন আগে থেকেই উত্তপ্ত হয়েছিল। তথাপি তাঁরা যদি মনে রাখতেন যে দাঙ্গা বাধলেই তার ফল হয় ভয়াবহ —তাহলে এক শোচনীয় ধ্বংসলীলাকে প্রতিরোধ করে তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। জাত্যাভিমান মানুষের বুদ্ধিলোপ ঘটায়। নরম হলে বা নত হলে অনেক সময়েই অনেক কুৎসিত বিপর্যয় প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা নরম হতে পারি না। আমাদের মনের মধ্যে থেকে দুষ্টসরস্বতী বা শয়তান আমাদের ধমক দেয় আর অমনি আমরা মনে করি—'আমি কেন আগে ছোট হব', একটুখানি নরম হলে বা নত হলে যদি বহু মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যায় তবে সেখানে নত হওয়া এক মহৎ কার্য্য। যথোচিত কালে মাথা নত করবার মত মনোবল যিনি আয়ত্ব করতে পারেন, পরিণামে তাঁর মাথাই সবচেয়ে উঁচুতে ওঠে।

দাঙ্গা যখন ঘটে তখন সেটা যার দোষেই ঘটুক না কেন দাঙ্গায় কোন পক্ষেরই জয় হয় না। উভয় পক্ষই পরাজিত হয়। আর সবচেয়ে নির্দোষ মানুষেরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯১৭ সালের বিহার প্রদেশের দাঙ্গা

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বিহারে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। বকরঈদ্ উৎসবে গো-বধ নিয়ে দাঙ্গা সুরু হয়। এই দাঙ্গাতেও বহুতর হিন্দু-মুসলমান হতাহত হয় ঃ

"২৮ শে সেপ্টেম্বর শাহাবাদ (আরা) জেলায় ইহা আরম্ভ হয়। ২রা অক্টোবর সর্বত্র দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়ে। ছয়দিন অরাজকতা চলে। ৯ই অক্টোবর গয়া জেলায় ত্রিশখানি গ্রাম লুটপাট হয়। প্রায় ১০০০ লোক ধরা পড়িয়া নানাভাবে শাস্তি পায়। ইতঃপূর্বে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এমন ব্যাপকভাবে কখনও হয় নাই।"[১১] এই দাঙ্গায় বহুলোক হতাহত হয়।

গো-বধকে কেন্দ্র করে অগণিত নরঘাতকযুক্ত প্রচুর সংখ্যক হিংস্র সংঘর্ষ ঘটেছে। একটি গো-জাতীয় পশু যদি কোন ব্যক্তি বধ করে তা হলে তার জবাবে ১০/২০-টি মনুষ্য বধ করা যাবে--এমন কোন বিধান হিন্দুশাস্ত্রের ত্রিসীমানায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। গো-বধ নিয়ে যে

সকল হিংসাত্মক উত্তেজনা ঘটে তারও কোন সমর্থন হিন্দুশাস্ত্রে নেই। গো-বধ অবশ্যই হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী নিষিদ্ধ ও পাপজনক। তেমনি মূর্তিপূজা ইত্যাদি অনেক কিছু হিন্দু আচার আচরণ মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী নিষিদ্ধ ও পাপজনক। এ সব সত্ত্বেও আজ ৮০০ বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান এদেশে একত্রে বসবাস করছে এবং ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত আচার আচরণ সম্পর্কে পারস্পরিক সহনশীলতার রেওয়াজ নিজেরাই সৃষ্টি করে নিয়েছে। ধর্ম সম্বন্ধে যাঁদের অন্ধতা ও নির্বুদ্ধিতা-প্রযুক্ত গোঁড়ামি নেই তাঁরা স্বীকার করবেন যে, কোন শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ চিরস্থায়ী হতে পারে না। যে সময়ে শাস্ত্রগুলি প্রণীত হয়েছে সেই সময়ে যে ধরণের সমাজ প্রবহমান ছিল—তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিধিনিষেধগুলি রচিত হয়েছিল। যে *মনুসংহিতা*-কে হিন্দুদের স্মৃতিশাস্ত্রের বনিয়াদ বলে ধরা হয় তার বয়স হয়েছে আড়াই হাজার বছর। কিন্তু মানুষের সমাজ ত আড়াই হাজার বছর একই অবস্থাপুঞ্জের ঘেরাটোপের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মনুষ্যসমাজ চিরন্তনরূপে চলমান, প্রাগ্রসরণশীল। সমাজের যখন গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায় তখন পুরোনো নিয়মকানুন অচল হয়ে যায় নূতন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নূতন নিয়মকানুন মানুষ তৈরী করে নেয়। একটা মনুষ্যকে যেমন তার পাঁচ বছর বয়সের দেহের কাঠামোর মধ্যে চিরকাল ধরে রাখা যায় না—পাঁচ বছর বয়সের জ্ঞানবুদ্ধির খাঁচায় তার মনকে বন্দী করে রাখা যায় না, তেমনি মনুর যুগে অর্থাৎ কৃষিসভ্যতা যখন কেবলমাত্র তার ব্যাপ্তিশীল উদাত্ত যাত্রা সুরু করেছে সেই যুগে যে সকল সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ তৎকালীন সামাজিক প্রয়োজন সমূহ নিষ্পন্ন করত, আজকের পরিণত পুঁজিবাদের যুগে তার অনেকগুলিই সামাজিক পরিস্থিতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমাজ জীবনের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক (irrelevant) হয়ে গিয়েছে। *মনুসংহিতা* প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে ত হাজার রকমের 'বিধি' 'নিষেধ' লিপিবদ্ধ আছে তার মধ্যে মোট কয়টি 'বিধি' বা 'নিষেধ' আমরা এখন মেনে চলি বা মেনে চলা যায়? *মনুসংহিতা*-র পঞ্চম অধ্যায়ে খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে যে সকল বিধি নিষেধ আছে তার কয়টি নিয়ম আমরা আজকাল পালন করি? মনু—যেমন 'গ্রাম্য কুক্কুট' ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন, তেমনি ঐ একই শ্লোকে হাঁস, চড়ুই, সারস ও ডাহুকের মাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ করেছেন।[১১] কিন্তু গোঁড়া হিন্দুদের মতে মুর্গী খেলে জাত যায়, হাঁসের মাংস নিরুপদ্রবে হেঁসেলে প্রবেশ করে। মনু বলেছেন 'পলাণ্ডু' ও 'লসুন' (রসুন) ভোজন করলে পতিত হতে হয় (অর্থাৎ জাতি যায়)।[১২] আজকাল কতজন হিন্দু এ নিয়ম মানছেন? 'মনু' ত 'বৃথামাংসের' (অর্থাৎ যে পশু যজ্ঞে নিবেদিত হয়নি—শুধু খাদ্যার্থে নিহত হয়েছে, তার মাংসের) ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন। আমরা কতজনে এই নিষেধ আজকাল মেনে চলছি? মনুর নিয়ম মেনে আট থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ কি আমরা দিতে পারছি?

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে প্রত্যহই কষাইখানায় বহু সংখ্যক গো-জাতীয় পশু নিহত হচ্ছে খাদ্যের জন্য, নিত্য প্রকাশ্যে গো-মাংসের ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে আমরা প্রত্যহ চোখে দেখছি। গো-মাংসের দোকানের সামনে দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যাচ্ছি, কই, সে সময়ে ত আমরা এমন উত্তেজনা অনুভব করি না যে লাঠি নিয়ে গো-মাংসের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাথা ভাঙতে যাওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বলে মনে হয়। গো-চর্মে প্রস্তুত পাদুকাও আমরা সতত ব্যবহার করি।

তা হলে অকস্মাৎ কোন একদিন কোন একস্থানের একটি বা দুটি গো-বধকে কেন্দ্র করে মাঝে মাঝেই রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটে কেন? স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে গো-বধকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানে যে সকল রক্তাক্ত সঙঘর্ষ হয় সে সব ক্ষেত্রে মুসলমান কর্তৃক গো-নিধনই সঙঘর্ষের প্রকৃত কারণ নয়। হয় ত কোথাও অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পূর্ব থেকে উত্তাপ সঞ্চিত থাকে। গো-বধ নামক উপলক্ষ সেই উত্তাপকে অগ্নিতে পরিণত করে। কোথাও বা স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত প্ররোচনা ঐ ধরণের সংঘর্ষের কারণ হয়। কোথাও বা দুর্বুদ্ধিপ্রসূত ধর্মীয় অভিমান ও জিদ্ থেকে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। আর সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন একবার প্রজ্জ্বলিত হলে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সেই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও তার নির্বাপন একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আরও বিস্ময় ও কৌতুকের ব্যাপার এই যে. সারা পৃথিবীতে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে গো-মাংস ভক্ষণ প্রচলিত আছে। কিন্তু সংঘর্ষ ঘটে শুধু হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। গো-বধ বা গো-মাংস ভক্ষণের ব্যাপার নিয়ে হিন্দুতে —খ্রিস্টানে সংঘর্ষ হয়েছে এরূপ ঘটনা একান্ত বিরল।

অনেক হিন্দুই হয়ত খবর রাখেন না যে গো-বধ বা গো-মাংস ভক্ষণ চিরদিন হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ ছিল না। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যজ্ঞে গো-বধ হত এবং গো-মাংস খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হত।[২৪] (যদিও গো-হত্যা ও মনুষ্য হত্যা থেকে বিরত থাকবার উপদেশও ঋগ্‌বেদে আছে।[২৫] *বশিষ্ঠসংহিতা*-য় আছে বাড়ীতে সম্মানিত অতিথি এলে—"মহাজং বা মহোক্ষং বা ঘাতয়েৎ" (বৃহৎ ছাগ অথবা বৃহৎ বৃষ বধ করবে)।

মহাভারতে বিচখ্যু নামক এক প্রাচীন রাজার কাহিনীতে বর্ণিত আছে এবং সেখানে বলা আছে তিনি একবার ষাট হাজার গরু বধ করে সেই মাংস রান্না করে বিরাট ভোজ দিয়েছিলেন। কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য *মেঘদূত*-এ রাজা রন্তিদেব কর্তৃক গো-মেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কথা আছে। মনু গো-বধকে মহাপাতকের পর্যায়ভুক্ত করেন নাই। মনুর মতে 'গো-হত্যা' একটা উপপাতক।[২৬] কিন্তু মনুর শাস্ত্র অনুসারে 'সুরাপান', ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীগমন ইত্যাদি 'চারি প্রকার মহাপাতকের' মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[২৭] অথচ সুরাপান বর্তমান কালে হিন্দুদের মধ্যেও বহুল প্রচলিত। ঐ কার্যকে আদৌ পাপ বলে বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু কোন মুসলমান একটি গো-বধ করলে আমরা এতদুর উত্তেজিত হই যে ঐ ক্ষুদ্র ঘটনার প্রতিশোধার্থে বহুলোকের প্রাণবধ, সম্পত্তিলুন্ঠন এবং গৃহদাহ প্রভৃতি সামাজিক পাপের অনুষ্ঠান করতে দ্বিধাবোধ করি না।

ভারতবর্ষে প্রাগ্রসরণশীল কৃষি অর্থনীতির স্বার্থে যখন কৃষিকার্যে অধিকতররূপে পশুশ্রম নিয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখনই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে এ দেশে গো-বধ নিষিদ্ধ হয়েছে। তখন এদেশে মুসলমান ছিল না। অন্যদিকে মুসলমানেরা যে সকল দেশ থেকে এসে ভারতে বসতি স্থাপন করেন, সে সকল দেশ ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশ ছিল না। সে সব দেশে মাংসই ছিল দরিদ্রের প্রধান খাদ্য। আর অন্য মাংসের চেয়ে গরুর মাংসের দর অনেক কম। এই কারণে মুসলমান ও হিন্দু এই দুই সম্প্রদায়ের মনে গো-হত্যার পক্ষে ও বিপক্ষে একটা জিদের ভাব দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

দুঃখের বিষয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কতকগুলি বদ্ধমূল ধর্মীয় ধারণা থাকে, যা

শাস্ত্রবিহিত ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধারণাগুলি এমন, যার পিছনে কোন শাস্ত্রও নেই, যুক্তিও নেই। শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা অসমর্থিত এই সকল ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ নানাবিধ অপকর্মকেও সুকর্ম বলে মনে করে। এই সব ভ্রান্ত অথচ দুরপনেয় লৌকিক ধারণার উপরে আঘাত লাগলে মানুষ চিত্তের স্থৈর্য ও বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং পশুত্বকেও মনুষ্যত্ব বলে মনে করতে থাকে। মসজিদের সম্মুখে বাজনা ও গোহত্যাকে ঘিরে লৌকিক মানসে এইরূপ অনুচিত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে—শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু বা মুসলমান কেহই নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত জনতার মন থেকে এইরূপ ধারণার অপসারণের জন্য উদ্যোগী হননি—যদিও তাঁরা সকলেই জানেন যে এই ধরণের ভ্রান্তবুদ্ধি পুনঃ পুনঃ রক্তাক্ত সংঘর্ষের কারণ হচ্ছে আর সেই সংঘর্ষ জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত করছে।

কিন্তু গত ৮০০ বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান একত্র বসবাস করতে করতে যেমন বহু ব্যাপারে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহনশীলতার কতকগুলি রেওয়াজ নিজেরাই রচনা করে নিয়েছেন, এই ব্যাপারেও সেইরূপ একটি রেওয়াজ বা অলিখিত চুক্তি অনায়াসেই উভয় সম্প্রদায় মেনে নিতে পারেন। ধর্মীয় উৎসবের জন্য বা খাদ্যের জন্য কোন মুসলমান গো-হত্যা করলে—তা যদি কোন প্রকাশ্য স্থানে না করা হয় তা হলে তা হিন্দুদের কাছে আপত্তিকর হওয়া উচিত নয়। যে কার্য খ্রিস্টান বা অন্য কোন সম্প্রদায় করলে হিন্দুরা নির্দ্বিধায় সহ্য করে থাকেন সে কার্য মুসলমান করলেই আপত্তিকর হবে কেন? কোন হিন্দুর মনে অযথা আঘাত দান বা তিক্ততা সৃষ্টির বিরুদ্ধে মুসলমানদেরও সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পরধর্মের প্রতি এবং ভিন্নধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই অবশ্য কর্তব্য। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। বর্তমান জগতে পরমত সহিষ্ণুতা আয়ত্ব করতে না পারলে শান্তিতে বেঁচে থাকা যায় না। একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ধর্ম, রাজনীতি বা সামাজিক আচার আচরণ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন—এতটা আমরা সর্বদাই দেখতে পাচ্ছি। একই বাড়ীতে কেউ নিরামিষাশী, কেউ হয় ত মাংসভোজী, রাজনীতিতে দুইজন হয়ত দুই পরস্পরবিরোধী দলভুক্ত। সে সব ক্ষেত্রে যে সহনশীলতায় আমাদেরকে অভ্যস্ত হতে হয়, হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রেও সেই প্রকার পারস্পরিক সহনশীলতা অভ্যাস করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ গো-রক্ষা সম্পর্কে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন এবং তাঁদেরকে মাঝে মাঝেই গো-রক্ষার আন্দোলনে উৎসাহী হতে দেখা যায়। মুসলমানেরা এই আন্দোলনকে ভাল চোখে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন এ ধরণের আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতাবাদী। 'গো-রক্ষা'-আন্দোলন যদি একটা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত করা হয়, তবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতামূলে সেরূপ আন্দোলন সংগঠিত হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে গো-রক্ষার প্রশ্নটি অর্থনৈতিক প্রশ্ন, তার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে গো-প্রজন্ম অতি নিম্নমানের। অথচ জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থে জাতীয় গো-সম্পদের সুরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আমাদের দেশে চাষের বলদগুলি দুর্বল, তাদের শ্রমক্ষমতা প্রায় নগণ্য, অন্তত বঙ্গদেশে. গাভীদের দুগ্ধদান ক্ষমতাও অত্যন্ত

সীমিত, গো-প্রজননে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা আদৌ মাথা ঘামাই না। গো-পরিচর্যায় হিন্দু বা মুসলমান উভয় সম্প্রদায় প্রায় তুল্যরূপে উদাসীন। জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনার স্বার্থে ও জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে গো-দুগ্ধের সরবরাহ এবং চাষের জন্য সুস্থ ও বলশালী বলদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারে হিন্দু বা মুসলমান উভয়েই সমস্বার্থ-সম্পন্ন। কিন্তু গো-রক্ষা আন্দোলন যখন এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধু গো-বধ-নিরোধের আন্দোলনে পরিণত হয়, তখন তার সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং মুসলমান সমাজেব কাছে স্বাভাবিক ভাবেই সেটা হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে প্রতিভাত হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে গো-রক্ষা আন্দোলন সংগঠন করবার সমস্ত প্রয়াসে ঐ আন্দোলনের সফলতার প্রয়োজনে মুসলমানগণের সহযোগিতা অর্জনের চেষ্টা হওয়া উচিত। কারণ জাতীয় গো-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই কল্যাণকর। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমর্থনযুক্ত মিলিত আন্দোলন সংগঠিত করতে পারলে মুসলমানগণ নিজেরাই খাদ্যের জন্য গো-বধ যথাসম্ভব সীমিত করবার দিকে মনোযোগী হবেন বলে আশা করা যায়—বস্তুত গো-রক্ষা আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় মনোভঙ্গী থেকে মুক্ত করে তাকে নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলন রূপে সংগঠিত করতে না পারলে সে আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে না এবং সেক্ষেত্রে ঐরূপ আন্দোলন সাম্প্রদায়িক অশান্তির কারণ হতে পারে।

পূর্বোক্ত দুটি ব্যাপারকে (অর্থাৎ গো-বধ ও মসজিদের সামনে বাজনা) বাদ দিলে আর যে সকল কারণে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি ব্যক্তিগত কলহ বা ব্যক্তিগত অন্যায়-আচরণের ব্যাপার। সম্পত্তিগত স্বার্থ নিয়ে, কিংবা ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বৈরিতা থেকে, কিংবা কোন ব্যক্তির কোন অন্যায় বা অবিবেচনাপ্রযুক্ত কার্যকে কেন্দ্র করে হিন্দুতে-হিন্দুতে ও মুসলমানে-মুসলমানে বিবাদবিসম্বাদ ঘটে। কিন্তু সেই ধরণের বিবাদে যখন এক পক্ষ হয় হিন্দু এবং অপর পক্ষ মুসলমান, তখন নির্বোধ বা দুষ্টবুদ্ধি লোকের প্ররোচনা অথবা কোন রাজনৈতিক প্রভাব তার মধ্যে অবাঞ্ছিত উত্তাপের সৃষ্টি করে তাকে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে পরিণত করে এবং একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার যখন বাহিরের কৃত্রিম উত্তাপের স্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন এইরূপ ঘটনার ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে যায় এবং উভয় পক্ষে স্বাজাত্যাভিমানই প্রাধান্য লাভ করে; তার ফলে আদিতে যা ছিল ব্যক্তিগত কলহ সেটা সাম্প্রদায়িক কলহের রূপ গ্রহণ করে—আর সে কলহের পরিণতি ঘটে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক হিংসার মধ্য দিয়ে। কখনও বা দুই পক্ষের মধ্যে সম্পত্তিগত স্বার্থদ্বন্দ্ব, কখনও বা উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বাগ্‌বিতণ্ডার সূত্রে এক পক্ষ কর্তৃক বিপক্ষ যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের সম্পর্কে কোন অশালীন মন্তব্য, আবার কখনও বা কোন অসতর্ক বা অবিবেচনাপ্রসূত আচরণ—কখনও বা দুই প্রতিবেশী ছেলেমেয়ের ভালবাসার ব্যাপার—এই সমস্ত থেকেই ঘটনার সূত্রপাত হয়। তারপর সেই কেঁচো দেখতে দেখতে বিষধর সর্পে পরিণত হয়। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির বলেছেন :

"Once a riot occurred when an irate husband threw a plate at his wife. and the plate landed on the head of a passerby. A struggle of individuals for

property and worldly goods has led occassionally widespread conflicts in which communities became involved. Sexual offences have also been a major cause of communal disturbances. In almost all cases the initial canflict is between individuals which in other contexts would have had no large scale social repercussions. ... A scramble for jobs, clashes of economic interests and personal animosities no doubt play their part in communal conflicts, but why is it that communal turn is given to what are essentially cases of private injury."[২৮]

ব্যক্তিগত কলহ বা বিরোধকে সাম্প্রদায়িক কলহ ও বিরোধে পরিণত করবার একটা গুরুত্বপূর্ণ ফল হল এই যে, অন্যায়কারী পক্ষ আর লোকচক্ষে অন্যায়কারী বলে প্রতিভাত হয় না। অন্যায়কারীর কোন শাসন হয় না, অন্যায় কার্যের কোন প্রতিকার হয় না। অন্যায়কারী স্ব-সম্প্রদায়ের দশজনের সাথে মিশে গিয়ে তাদের সহযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যে ব্যক্তির নিন্দিত হওয়া উচিত ছিল, সে স্ব-সম্প্রদায়ের লোকদের প্রশংসা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটাকে আর একটু পরিষ্কার করা যেতে পারে। নারীহরণ অথবা নারী ধর্ষণের ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করা যাক। নারীহরণ ও নারীধর্ষণ যে জঘন্যতম কুকার্য, সে বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ নেই। সকল সমাজেই দুষ্টলোক থাকে, অপরাধপ্রবণ লোক থাকে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রবঞ্চনা (cheating), জালিয়াতি ইত্যাদির মত নারীহরণ নারীধর্ষণের কুৎসিত প্রবৃত্তি বিকৃত, অশুচি ও অসামাজিক মানসেই লালিত হয়। এরূপ জঘন্য কার্যে যার প্রবৃত্তি জন্মে, সে তার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও অসৎ লোক বলে পরিচিত ও ধিকৃত হবে এটাই স্বাভাবিক। সে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই গণ্য হবে না। সভ্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন (isolated) হয়ে যাবে—যে কোন সৎ মানুষ এটাই আশা করবে। তার সংশোধনের জন্য, তার সম্ভাব্য শিকারদের নিরাপত্তার জন্য এবং সামাজকে কলুষমুক্ত করবার জন্য অপরাধীর এইরূপ বিচ্ছিন্নকরণ (isolation of the criminal) একান্ত প্রয়োজন। দুশ্চরিত্র অপরাধকারী এবং তার শিকার—উভয়েই যদি এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, তাহলে পূর্বোক্তরূপ স্বাভাবিক পথে জনমানসে প্রতিক্রিয়া ঘটে, সামাজিক শাসন এবং রাজকীয় বিচারশালার মাধ্যমে অপরাধী ব্যক্তির দন্ডদানের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। কিন্তু অপরাধী ও তার শিকার ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হলে ভিন্নরূপ পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। কোন দুশ্চরিত্র মুসলমান কোন হিন্দুনারীকে হরণ বা ধর্ষণ করলে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোক অবিবেচনা ও মুর্খতাবশত ঐ জঘন্য অপরাধের জন্য সমগ্র মুসলমান সমাজকেই দায়ী করে বসে। যেই এমনটি ঘটলো—অমনি অপরদিকে মুসলমানেদের স্বাজাত্যাভিমানে আঘাত পড়লো। আর সাথে সাথে অপরাধকারী স্বসম্প্রদায়ের আশ্রয়লাভ করলো, তার কুকার্য 'বাহাদুরি'র কাজ বলে প্রশংসিত হতে লাগলো, অপরাধকারী নিন্দিত ও ধিকৃত হওয়ার পরিবর্তে 'হিরো' হয়ে গেল! আর, দাঙ্গা বেধে উঠলো; দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নরঘাতন, লুণ্ঠন, ঘরজ্বালানি চলতে থাকলো অব্যাহত গতিতে। হিন্দুরা বুঝলেন না যে একজন পাপিষ্ঠের ব্যক্তিগত অপরাধের দায়িত্ব সমগ্র মুসলমান সমাজের উপরে আরোপ করে তাঁরা পাপিষ্ঠ ব্যক্তির অনুকূলে একটা গোটা সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জিত

হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। পাপিষ্ঠ দন্ডিত, নিন্দিত বা ধিকৃত ত হলই না উপরন্তু সে সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হল এবং তার ফলে উক্তরূপ কুকার্যের পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তির দ্বার উন্মোচিত হল। তাঁরা যদি পাপিষ্ঠের কুকার্যের সাথে তার সম্প্রদায়কে যুক্ত না করতেন তাহলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অনেক মুসলমান হয়ত অপহৃতা বা ধর্ষিতা নারীর পক্ষাবলম্বন করতেন। মুসলমানেরাও বুঝলেন না যে পাপিষ্ঠকে সামাজিক আশ্রয় দান করে, তার মস্তকে বীরের মুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁরা আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক কুৎসিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যার ফলে তাঁদের সম্প্রদায় বিপন্ন হল। কারণ ঐ ধরণেব কাজ যারা করে তারা সুযোগ পেলে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদেরকেও রেহাই দেবে না।

ব্যক্তিগত অপরাধের সাম্প্রদায়িকীকরণ যেমন নিন্দনীয় তেমনি অনিষ্টকর। কোন কোন সময়ে ভ্রান্তবুদ্ধি যে কতদূর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে পূর্বোক্ত আলোচনার ফলে সেটা পরিস্কার হয়েছে বলে আশা করি।

অনেক সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা দাবি উত্থাপনের ব্যাপার নিয়েও হিন্দুতে মুসলমানে বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। শান্তিপূর্ণভাবে ঐধরণের অধিকার বা সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য আন্দোলন করা আপত্তিকর নয়। দাবিগুলি যদি সম্প্রদায়ভিত্তিক না হয়ে শ্রেণীভিত্তিক হয়—অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান হিসাবে দাবি উত্থাপন না করে যদি 'অনগ্রসর শ্রেণী' বা শোষিত শ্রেণী হিসাবে উত্থাপন করা যায় তা হলে তার সফলতার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কারণ তা হলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সদবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও ঐরূপ অন্দোলনের সাথে অনায়াসে যুক্ত হতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সম্মিলিত ভারতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত কোন জনগোষ্ঠী যদি শিক্ষা, জীবিকার্জনের ও অত্মবিকাশের সুযোগসুবিধা, সামাজিক বিকাশ ইত্যাদি ব্যাপারে অনগ্রসর থাকে তবে সেই জনগোষ্ঠীকে অগ্রসর শ্রেণীর সমপর্যায়ে উন্নীত করবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দায়িত্ব বলে বিবেচিত হওয়া উচিত, কিন্তু ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে ঐ সমস্যাগুলির বিচার বিবেচনা জাতির পক্ষে অস্বাস্থ্যকর এবং জাতীয়সংহতির ক্ষয়সাধক হয়। কোন মানুষের দেহে যদি দৈহিক পুষ্টি যথাযথরূপে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিস্তৃত না হয়, এবং দেহের কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতিপুষ্ট হয় ও অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অপুষ্ট থাকে, তা হলে সে অবস্থা যেমন সমগ্র দেহের অপুষ্টি ও ব্যাধিগ্রস্ততার নির্দশন হয়, তেমনি একটা জাতির দেহে স্বাভাবিক পুষ্টির অসম বিস্তার কোন অংশের অতিপুষ্টি ও অপর কোন অংশের শোচনীয় অপুষ্টি জাতির ব্যাধিগ্রস্ততার পরিচায়ক। এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতির অনগ্রসর অংশকে উন্নীত করবার চেষ্টা করা উচিত এবং এ কার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য। কিন্তু এই কার্য্যের প্রধান লক্ষ্য হল সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জাতির সর্ব-অঙ্গের বিকাশকে সম্পূর্ণ করে তোলা। এ প্রশ্নের সাথে কোন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বা বর্ণভেদগত বিচার বিবেচনা মিশিয়ে দিলে গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতাবাদের বিষমিশ্রণের ফলে যা রোগনিরাময়ের ঔষধ সেটা বিষে পরিণত হয় এবং উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল প্রস্তুত হয়। সুতরাং মুসলমান বা শিখ বা অপর কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় উন্নয়নমূলক প্রয়াসের ভাগ বাঁটোয়ারার দাবি উত্থাপন কখনই উচিত নয়। ভারতীয় জাতিকে একটি সুসংহত জাতি হিসাবে বিবেচনা না করে কতকগুলি পৃথক পৃথক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়েব একটা যৌথ ও

সরিকানী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান রূপে দেখা জাতির পক্ষে সর্বনাশকর। একটি যৌথ পরিবারের অর্থ ও সম্পত্তি অঙ্ক কষে, দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে বিভিন্ন সরিকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়। কিন্তু মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবারের সামূহিক বিকাশের উপযোগী উদ্যমশীলতা, সামাজিক মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা—এগুলি প্রত্যেক সরিকের সরিকানী অংশানুযায়ী ভাগ করে দেওয়া যায় না। একটা জাতির সামূহিক বিকাশের জন্য যে মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন, উদ্যমশীলতা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় সেগুলি প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাতে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন একটি পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মেধা, প্রতিভা ও দক্ষতা প্রভৃতি তুল্যমানের হয় না—একের সাথে অপরের মেধা, প্রতিভা বা দক্ষতা ইত্যাদির প্রচুর হেরফের থাকে, জাতির ক্ষেত্রেও কোন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাতে ঐ গুরুত্বপূর্ণ মানবিক বৃত্তিগুলি বিতরিত হয় না। শুধু দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের উপযোগী রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধাগুলি সকলে যাতে তুল্যরূপে ভোগ করতে পারে— সে ব্যবস্থা করা যায়, এবং সে ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির জনসংখ্যার অনুপাতে উচ্চ-নিম্নপদ নির্বিশেষে সমস্ত চাকুরী, শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর আসন-সংখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করে দেওয়ার দাবি অবাস্তব।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, পার্শী প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির কোন একটিকে সামগ্রিকভাবে 'অগ্রসর' ও অপর কোন একটিকে 'অনগ্রসর' বলে চিহ্নিত করা চলে কি? 'হিন্দু' হলেই যে সেই ব্যক্তি 'অগ্রসর' শ্রেণীভুক্ত হবে আর মুসলমান হলেই তাকে 'অনগ্রসর' শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে এরূপ ধারণা অযৌক্তিক। 'হিন্দু'নামীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রচুর সংখ্যক দরিদ্র, নিরন্ন ও শোষিত মানুষ রয়েছে— তা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে হিন্দুর মধ্যে দরিদ্রশ্রেণী বলতে বুঝায় নিম্নবর্ণের মানুষদেরকে। অর্থাৎ যাঁরা উচ্চবর্ণ বলে পরিচিত— সেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এঁরা সব 'অগ্রসর' শ্রেণীভুক্ত। হতে পারে যে এক কালে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা সকলেই মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ ছিলেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। এখন বামুন কায়েতের ঘরের ছেলেরা হাজারে হাজারে—আপিসের চাপ্‌রাসী, বড়লোকের বাড়ীর দারোয়ান, রাঁধুনে বামুন, ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক, মোটর বাসের ক্লিনার, কারখানার শ্রমিক, মাসিক ১৫০।২০০ টাকা আয়ের ছোট দোকানদার—এই সকল কাজ করে নিত্য নিত্য ঘর্ম ও অশ্রুসিক্ত অন্ন গলাধঃকরণ করছে। এছাড়া হিন্দু সমাজের প্রচুরতম অংশ যে 'খেটে খাওয়া মানুষ' এতে অস্বীকার করবার উপায় নেই। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের মধ্যে যে সবাই অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত এ কথাও সত্য নয়। মুসলমান সমাজে হিন্দুদের মত জাতিভেদ না থাকলেও বংশগত ভাবে একই পেশায় রত থাকার ফলে, মুসলিম সমাজের নীচুতলায় অনেক 'জাতি' বা Caste-এর সৃষ্টি হয়েছে—যেমন কলু, জোলা, দর্জি, বাজন্দার, পাইক, পেয়াদা, ইত্যাদি। এ ছাড়াও প্রচুর সংখ্যক মুসলমান আছেন যাঁদেরকে গতর খেটে দৈনন্দিন ঘর্মসিক্ত উদরান্ন সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু তেমনি মুসলমান সমাজের উপরতলায়

রয়েছেন হিন্দুদের মতই বৃহৎ ভূস্বামী, বৃহৎ ব্যবসায়ী, জজ, ব্যারিষ্টার, উকীল, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ও উচ্চপদের সরকারি চাকুরিয়া প্রভৃতি। সুতরাং অন্ধের মত নির্বিচারে সকল মুসলমানকে 'অনগ্রসর' শ্রেণীভুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায় না। সাম্প্রদায়িব ভিত্তিতে যে সকল চাকুরী বা সুযোগ সুবিধার দাবি নিয়ে হিন্দুতে-মুসলমানে বিসম্বাদ ঘটে, তার প্রায় সবগুলিই উচ্চমধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (অর্থাৎ upper middle class ও prospective upper middle class-এর) শ্রেণীস্বার্থের দাবি। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আমাদের দেশে যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়, তার প্রথম দিকে যেমন ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শ্রেণীস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশাসনিক উচ্চপদে ভারতীয়দের নিযুক্তির অধিকার, ইন্ডিয়া কাউন্সিল ও প্রাদেশিক কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যাবৃদ্ধি, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ভারতীয়করণ ইত্যাদি দাবির বনিয়াদে 'জাতীয় আন্দোলন' পরিচালিত হত, সরকারি চাকুরীতে মুসলমানদের জনসংখ্যানুপাতিক আসন সংরক্ষণ, পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ও জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে মুসলমানগণের জন্য জনসংখ্যানুপাতিক আসনসংখ্যা নির্দিষ্টকরণ ইত্যাদি দাবিগুলিও সেই প্রকার উচ্চমধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মুসলমানগণের শ্রেণীস্বার্থের দাবি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চাকুরীর ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে বিরোধ বিসম্বাদ চলেছে, সেটা আসলে উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 'পিঠাভাগের' অন্তর্দ্বন্দ্ব (inter-class conflict) ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে মুসলমানদের অনুকূলে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার শতকরা ৯৫ ভাগ সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন মুসলিম উচ্চবিত্তশ্রেণী। দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমানেরা এবং জোলা, কলু প্রভৃতি পূর্বোক্ত সামাজিক মর্যাদা-বর্জিত মুসলমানেরা ঐ সকল সুযোগ সুবিধার শতকরা পাঁচ ভাগও ভোগ করেছেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং অনগ্রসরশ্রেণীর অনুকূলে বিশেষ সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি যেমন জাতীয় স্বার্থেই বাঞ্ছনীয়, তেমনি সেই সকল সুবিধা যাতে প্রকৃত অনগ্রসর-জনশ্রেণীরই লভ্য হয়, সে ব্যবস্থাও সুনিশ্চিতরূপে হওয়া দরকার, এবং তা করতে গেলে তার নিরীখ হবে শ্রেণীভিত্তিক, (class based), সম্প্রদায় ভিত্তিক (community based) নয়। এখানে শ্রেণী বা class বলতে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দাবিদাওয়া নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে যে সকল বিরোধ ও সঙঘর্ষ ঘটে তার উৎসগুলি নিয়ে এখানে যে আলোচনা করা হল তা থেকে এটা সুস্পষ্ট হবে যে উভয় সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা একটু সতর্ক ও সহনশীল হলে এবং যথোচিত কালে হস্তক্ষেপে উদ্যোগী হলে কলঙ্কজনক পৌনঃপুনিক নরঘাতন নিষ্ঠুরতা পরিহার করা সম্ভব হয়। ইংরেজ শাসনকালে কিন্তু শুধু এই দুই পক্ষই ছিল না; সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধে দুই সম্প্রদায়ের পশ্চাতে একটি শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষ নিরন্তর ক্রিয়াশীল ছিল। সে তৃতীয় পক্ষ হল—সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী রাজশক্তি। এই শক্তি তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের রক্ষা ও পুষ্টির জন্য ভারতের এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়েছে—এদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পারস্পরিক সঙঘর্ষের প্ররোচনা দান করেছে। পুতুল নাচের খেলায় যেমন অন্তরালবর্তী পরিচালকের হস্তধৃত সুতার টানে পুতুলগুলি আসরে প্রবেশ ও প্রস্থান

করে, নাচে, যুদ্ধ করে, তেমনি অন্তরালবর্তী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হস্তধৃত সুতোর টানে হিন্দু-মুসলমান পুতুলগুলি পরস্পরের প্রতি তরবারি আস্ফালন করেছে, একে অপরকে আঘাত করেছে, হত্যা করেছে। শুধু তফাৎ এই যে পুতুলনাচের খেলায় ছায়াবাজীর পুতুলগুলির পারস্পরিক লড়াইটা কৃত্রিম। আর ইংরেজ পিছন থেকে সুতো টেনে যে হিন্দু মুসলমান পুতুলগুলিকে নাচিয়েছে তারা বা তাদের অস্ত্রঝনৎকার, তাদের যুদ্ধ—এর কোনটাই কৃত্রিম নয়—একান্ত বাস্তব, রূঢ় করুণ নিষ্ঠুর বাস্তব।

সাম্প্রদায়িকতা একটি ব্যাধি, এবং এমন একটি ব্যাধি যা এককালে সমষ্টিগতভাবে বহুজনকে অক্রমণ করে, আক্রমণের মুহূর্তে প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করতে না পারলে, অতি অল্পকালের মধ্যে মহামারীর আকার ধারণ করে, গ্রাম নগর ছারখার করে, শত শত নিরপরাধের দেহ শৃগাল শকুনির ভক্ষ্য হয়, মনুষ্য বসতি ভস্মীভূত হয়, শত শত নারী, শিশু, বালক ও বৃদ্ধ উন্মত্ত পৈশাচিকতার শিকার হয়, মনুষ্যত্ব ভূলুণ্ঠিত হয়। এ এমন ব্যাধি যা মুহূর্ত্তমধ্যে বিবেকবান মনুষ্যকে পশুতে পরিণত করে। জাতির দেহে এ ব্যাধি একবার প্রবেশ করলে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের মত জাতি-দেহের সর্বত্র শিকড় বিস্তার করে। সাম্প্রদায়িকতা চরমতম জাতীয় দুর্দৈবকে জন্ম দেয়। সাম্প্রদায়িকতার পাপ জাতীয় চরিত্রকে কলুষিত করে। সাম্প্রদায়িক দুর্বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে এবং যে কোন নাগরিকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ

সূত্রনির্দেশ

১। এম্. আত্হার আলি, *ঔরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল অভিজাত শ্রেণী*, পৃঃ ১১১।

২। Rajendra Prasad. *Divided India*. p 39.

৩। *Bengal District Gazetteer, Mymensing District*. pp 34-35

৪। Rajendra Prasad , *Divided India*. p 34-45

৫। *Op cit*., p.35

৬। *Op cit* . p 36

৭। *Op cit*.. p 37.

৮। *ভারতকোষ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সংকলিত পঞ্চম খণ্ড. পৃঃ ৬৪৫, রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য।

৯। Rajendra Prasad, *Divided India*. p 97

১০। অতুল সুর, *বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১১। অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস : মধ্যযুগ*, পৃঃ ১৫৯।

১২। যথাপূর্ব।

১৩। Rajendra Prasad, *Divided India*. p 39 (উদ্ধৃতাংশ লেখক কর্তৃক বাংলায় অনূদিত)।

১৪। অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস : মধ্যযুগ*, পৃঃ ৯৬।

১৫। যথাপূর্ব।

১৬। যথাপূর্ব।

১৭। J. H Broomsfield. *Elite Conflict in a Plural Society---Twentieth Century Bengal*. Oxford University Press, Bombay p.271.

১৮। *Op cit*. p 27.

১৯। *Op cit*. p 275

২০। *Op cit*.. p 276

২১। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র জীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫০৩।

২২। *মনু সংহিতা*, ৫/১২।

২৩। *মনু সংহিতা*, ৫/১৯।

২৪। *ঋগ্বেদ*—দশম মণ্ডল ঃ ২৭, ২৮ ও ৮৬ সূক্ত।

২৫। *ঋগ্বেদ*—প্রথম মণ্ডল ঃ ১১৯ সূক্ত।

২৬। *মনু সংহিতা*—১১/১০৭।

২৭। *যথাপূর্ব*—১১/৫২।

২৮। Humayun Kabir, *Communal Politics 1906-1974 and other Essasys*, p 127-8

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি

সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে গ্রেট ব্রিটেন নামক একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ—যার আয়তন অনেকটা অবিভক্ত বঙ্গদেশের ঢাকা বিভাগের সমতুল এবং যার লোকসংখ্যা বিশাল ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার শতাংশের একাংশ বললেও অত্যুক্তি হয় না, সেই দ্বীপের শাসকেরা ভারতবর্ষ নামক উপমহাদেশ দখল করে সেখানে সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, এবং নির্বাধায় তার সম্পদ লুণ্ঠন করবে—এটা প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার। অথচ সেই অভাবনীয় ব্যাপারই ঘটলো। হাতী পাঁকে পড়লে চাম্‌চিকেও তাকে লাথি মারে—এটা যদিও নিছক প্রবাদবাক্য, সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারত নামক মহাগজের পদচতুষ্টয় অবক্ষয়ের পাঁকে প্রোথিত থাকবার সুযোগে সাগরপারের এক নগন্য বিহঙ্গ ঠোঁটে করে শিকল বয়ে নিয়ে এসে তার গলায় পরিয়ে দিল—এটা প্রবাদবাক্য নয়—নির্মম ইতিহাস।

অবক্ষয়জর্জর সামন্ত অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রহীনতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ধনলোভ, ক্ষমতালিপ্সা এবং ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার জন্য কুটিল চক্রান্ত—ইত্যাদির রন্ধ্রপথে ইংরেজের সিংহাসন ভারতের বুকের উপরে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এতবড় একটা দেশ—এদেশের ভূগোল, জনচরিত্র, লোকব্যবহার, অর্থনীতির হালচাল, পরিবেশ সবই ইংরেজদের অপরিচিত। দেশের শাসন চলবে কিভাবে? মুসলমানযুগের শাসকেরা শাসনকার্যে সহায়তার জন্য ভারতবর্ষের সন্নিহিত মুসলিম এলাকাগুলি থেকে স্বধর্মীয় লোকজন আমদানি করেছিলেন। ইংরাজের অত লোকবলই বা কোথায়, আর প্রায় অর্দ্ধ পৃথিবী পাড়ি দিয়ে প্রচুর সংখ্যক স্বজাতীয় মানুষকে ভারতে টেনে এনে এদেশে বসতি করানোর মত সুযোগই বা কোথায়? অতএব এ দেশে বিদেশী শাসন সুপ্রতিষ্ঠ করতে হলে তার আবশ্যিক সর্ত হচ্ছে দেশীয় মানুষদের মধ্য থেকেই একটি শক্তিশালী ইংরেজ সমর্থক রাজভক্তের দল সংগঠিত করা। ভারতীয় জনগণের কোন্‌ অংশ থেকে এ রকম একটা স্থায়ী রাজানুরাগী দল সৃষ্টি করা যায় এ প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে আগন্তুক ইংরেজদের মস্তিস্ককে পীড়িত করেছিল।

দুটি কারণে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ইংরেজের প্রতি আনুগত্যশীল একটি জনগোষ্ঠী সংগঠনে ইংরেজদের তৎকালীন মানস সায় দিতে পারেনি। প্রথমত, ইংরেজেরা মুসলমান শাসকদের হাত থেকে ছলে বলে, কৌশলে রাজ্যের রশি হস্তগত করেন। কিঞ্চিদধিক সাড়ে পাঁচ শত বৎসর ভারতবর্ষ ছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে মুসলমান শাসকদের শাসনাধীন। এই দীর্ঘ সার্দ্ধপঞ্চশতাব্দীকাল ধরে মুসলমান অভিজাতশ্রেণী রাজার জাতি'র মর্যাদা ও সেই সাথে নানা আনুষঙ্গিক সুযোগ ভোগ করে এসেছেন। এই দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীই ছিলেন

বিজেতা ইংরেজ কর্তৃক ভারতবর্ষে একটি ইংরেজভক্ত সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রয়াস।

সিংহাসনের কাছাকাছি, বাদশাহ ও নবাবদের বিশ্বাসের পাত্র ও তাঁদের উপদেষ্টা। আওরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যুর পর থেকে দিল্লীর সিংহাসন প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যায়। বাবরবংশীয় কোন একজনকে শালগ্রামশিলার মত জড়পদার্থের আকারে সিংহাসনে বসিয়ে রেখে প্রকৃত রাজকীয় ক্ষমতা ওমরাহ্‌গণই পরিচালনা করতে থাকেন এবং সিংহাসনে বসানোর জন্য পুতুল-সম্রাটদের নির্বাচনের ব্যাপারটাও ওম্‌রাহদের অভিরুচির অধীন হয়ে পড়ে—অনেক ক্ষেত্রে পুতুল-সম্রাটের আয়ুষ্কালও হয় চক্রান্তকারী মুসলিম অভিজাত গোষ্ঠীর অভিরুচিব অধীন। অতএব শাসনের রজ্জু যখন হস্তান্তরিত হয়ে ইংরেজের করধৃত হল—তখন প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাচ্যুত হলেন এদেশের মুসলিম আভিজাতশ্রেণী—যাঁরা অবক্ষয় যুগের বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থার মধ্যে নিজেদেরকে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং যে ইংরেজ মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর হাত থেকেই শাসনের দন্ড কেড়ে নিয়েছে সেই ইংরেজের পক্ষে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর আনুগত্য অর্জনের আশা বাতুলতার নামান্তর। ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর মানসে ইংরেজের প্রতি অসন্তুষ্টি ও বিদ্বেষ দীর্ঘস্থায়ী হবে এটাই স্বাভাবিক, সুতরাং তাঁদেরকে বিশ্বাস করাও ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত, এদেশের অধিবাসীদের মধ্য থেকে একটা ইংরেজভক্ত ব্লক তৈয়ার করবার নানা পরিকল্পনার মধ্যে ভারতবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার একটা পরিকল্পনা প্রথম থেকেই ইংরেজদের মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল। এ ব্যাপারে সফলতা অর্জন করতে পারলে ইংরেজরা একটা পুরুষানুক্রমিক ইংরেজভক্ত গোষ্ঠীকে তাঁদের সিংহাসনের রক্ষক হিসাবে লাভ করতে পারবেন। যারা ধর্মান্তরিত হবে তারা দেশীয় লোকদের থেকে এমনিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, কারণ ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে তাদের পূর্বের সমাজ তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হবে ও দেশীয় সমাজ থেকে তারা বহিষ্কৃত হবে। তখন ইংরেজের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা থাকবে না। আর ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধের ফলে খ্রিস্টানীকৃত ভারতবাসিবা ইংরেজদেরকে 'স্বজাতি' বলে মনে করতে অভ্যস্ত হবে। মুসলিম বাদশাহগণের মধ্যে অনেকে এদেশের অধিবাসীদের ইস্‌লামীকরণের অভিযান চালিয়েছিলেন। সেখানে মূলপ্রেরণা ছিল ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রসূত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট যে খ্রিস্টানীকরণ অভিযান পরিচালিত হল, তার মধ্যে ধর্মীয় বোধের প্রাধান্য ছিল না—সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধিই ছিল সে অভিযানের মূল প্রেরণা। ইংরাজেরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই খ্রিস্টানীকরণের প্রয়াস ফলপ্রসূ হতে পারে। মুসলমানরা ছিলেন স্বধর্ম সম্পর্কে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। তাঁদের চরিত্রে জঙ্গী মনোভাবের প্রাধান্য ছিল এবং সেই সাথে, তাঁদের হাত থেকেই ইংরেজরা রাজদন্ড ছিনিয়ে নিয়েছে বলে মুসমলানদের চিত্তে ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রবলতা ছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানদের ধর্মান্তরীকরণের প্রয়াস ইংরেজ শাসকশ্রেণী বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। তা ছাড়া, জাতিভেদপ্রথা ও নানা উপসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের ফলে হিন্দুসমাজ ছিল শতধাবিভক্ত। সেজন্য 'ধর্মবিজয়ের অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে ইংরেজেরা হিন্দুসমাজকেই আক্রমণের উপযোগী এলাকা (vulnerable area) হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

ভারতীয়গণের খ্রিস্টানীকরণ প্রয়াস

একদিকে যেমন ইংরেজরা মুসলমান সমাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানের নীতি গ্রহণ করলেন, অন্যদিকে তেমনি অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানেরাও ইংরেজদের নৈকট্য সযত্নে পরিহার করতে লাগলেন। ইংরেজ ও হিন্দু—এই উভয় সম্প্রদায়ের নৈকট্য সযত্নে বর্জন করে মুসলমানেরা প্রায় ১০০ বৎসর যাবৎ আপন কোটরে বদ্ধদ্বারের অন্তরালে অবস্থানের (Policy of racial seclusion-এর) নীতি আঁকড়ে রইলেন।

পক্ষান্তরে, হিন্দু অভিজাত শ্রেণী এবং একশ্রেণীর কূটবুদ্ধি, ভাগ্যান্বেষী মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত হিন্দু নূতন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে সৌভাগ্যশিকারে যত্নবান হলেন। ইংরেজদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে ঐশ্বর্য্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের নূতন পথের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল।

সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণের অভিপ্রায়ে ভারতে 'ধর্মবিজয়' অভিযান পরিচালনা ব্রিটিশ সরকারেরই সুপরিকল্পিত কৌশল ছিল। ভারতে পাদ্রী-প্রেরণ ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য গ্রেট ব্রিটেনের রাজকোষ থেকে সুপ্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। ভারতীয় জনগণের একাংশের খ্রিস্টানীকরণের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে বিপুল সংখ্যক পাদ্রী-প্রেরণ যে সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিপ্রসূত একটি কূটকৌশল, তার নানা দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যাবে মেজর বামনদাস বসু কর্তৃক লিখিত *History of Education under the East India Company* নামক পুস্তকে।[১] ভারতবাসী হিন্দুগণের খ্রিস্টানীকরণ অভিযান প্রথমদিকে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আত্মগর্ব অনুভব করতে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ গুডিভ্ চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। ধর্মান্তরীকরণ অভিযানের প্রাথমিক সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম সভ্য স্যার চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান বিলাতে তাঁর আত্মীয় লর্ড মেকলেকে এক পত্রে জানান যে ঃ "আমরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছি, তাতে আশা করা যায় যে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে একজনও পৌত্তলিক (অর্থাৎ হিন্দু) থাকবে না।"

কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হতেই ইংরেজরা বুঝতে পারলেন ভারতের বিপুল জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশের খ্রিস্টানীকরণ সম্ভব নয়। প্রথমত, মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে এ ব্যাপারে আদৌ কোন সাড়া পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দু সমাজের ইংরেজী শিক্ষিত অংশের মধ্যে প্রাথমিক সাফল্যের জোয়ার অল্পদিনের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে আসে। শহরবাসী ২/৪ জন বিত্তবান হিন্দু সাগ্রহে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। কিন্তু গ্রামীণ হিন্দু সমাজে খৃস্টানীকরণ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ দানা বাঁধতে থাকে। মফস্বল শহরে—এমন কি বড় বড় গ্রামে বহু অর্থব্যয়ে মিশন হাউস্ স্থাপন করে, নানা জনহিতকর কাজে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অর্থব্যয় করেও যেটুকু ফললাভ ঘটে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা বর্তমান থাকায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রথমে কিছুটা খ্রিস্টানী অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও স্বাজাত্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে খ্রিস্টানীকরণের প্রতিরোধ করতে থাকে। কোন কোন স্থানে এমন ঘটেছে, একজন নমঃশূদ্র বা কৈবর্তকে ধর্মান্তরিত করবার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সঙ্ঘবদ্ধ নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বা কৈবর্ত সম্প্রদায় শুধু স্বধর্মত্যাগী ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে ভিটাছাড়া করেই ক্ষান্ত হয় নাই, পাদ্রীদের আস্তানা ভেঙ্গে চুরে পুড়িয়ে

দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। তৃতীয়ত, ধর্মান্তরিত ভারতবাসীরা দেশীয় সম্প্রদায় কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হওয়ায় দেশীয় জনগণের উপরে কোন প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তাদের থাকে না। তার ফলে খ্রিস্টানীকরণের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

তখন এদেশে একটি স্থায়ী ইংরেজভক্ত গোষ্ঠী সৃষ্টি করবার জন্য ইংরেজরা নূতন পথের সন্ধানে রত হয়। অনেক চিন্তা ভাবনা করে যে নূতন ও কার্য্যকরী পন্থা ইংরেজরা উদ্ভাবন করে সেটা সাধারণত cultural conquest বা 'সাংস্কৃতিক বিজয়ের' পথ বলে আখ্যাত হয়। বিকল্প পথ হিসাবে ভারতে ব্রিটিশ জাতির উপনিবেশ স্থাপনের (Calonisation-এর) চিন্তাও এই সময়ে ইংরেজদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করতে থাকে।

ভারতের অভ্যন্তরে ইংরেজ কলোনী স্থাপনের ভাবনা

রাজ্যের রশ্মি ইংরেজদের হস্তগত হওয়ার ৬০/৭০ বৎসর পরেও যে ভারতীয়গণের স্বতঃপ্রণোদিত আনুগত্য অর্জনে ইংরেজেরা সমর্থ হতে পারেননি তার কিছু কিছু প্রমাণ মিলবে তাৎকালিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নানা আলোচনা থেকে। এইচ. এল্. ভি. ডিরোজিও-র সম্পাদনায় *The Kaleidoscope* নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। পত্রিকাখানির অবশ্য শৈশবমৃত্যু ঘটেছিল। অর্থাৎ বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই মৃত্যু ঘটেছিল। এই পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় জনৈক ইংরেজ লেখক মন্তব্য করেছেন ঃ

"We calculate too much upon the fidelity and attachment of our native subjects. This is not real, disinterested and unalterable affection towards us, existing in their minds : and we believe, our hold on them arises not so much and so directly from the existence of these qualities in their bosoms as from absolute fear and opinion of our power to maintain our authority. But if they be really so highly interested in our behalf, it is difficult to account upon any rational and certain principles, how it happens that whenever we are involved in a contest they evince so little indifference and coldness for its result, and when we experienced a partial and temporary reverse in the late war with the Burmese they evinced no alarm, disappointment or distress at our disaster."[১]

সুতরাং, ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী ইংরেজানুগত ব্লক সৃষ্টির নূতন উপায় সম্পর্কে ইংরেজদের চিন্তা ভাবনা সুরু হল। মুসলমান শাসকদের অনুকরণে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ জাতিভুক্ত লোকদের ভারতে নিয়ে এসে এদেশে তাদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের পরিকল্পনাও (Programme of Colonisaion of Europeans in India) যে এই সময়ে আলোচিত হয়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় পূর্বোক্ত *Kaleidoscope* পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রবলী থেকে। ঐ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৮২৯) জনৈক পত্রলেখক ভারতে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গজাতির কলোনী-স্থাপন সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র উল্লেখ করে লিখছেন ঃ

"The most superficial observer must perceive that India is maintained in subjection only by military force—withdraw it, and the boasted opinion of the natives, instead of supporting, would immediately prove the cause of

utter subvention of the Empire. It is generally known, and even confessed by our rulers that the spirit of the natives, in the upper provinces in particular, is anything but peaceable. We have lately read in one of the papers that at Lucknow, during the *Mohorrum*, prayers were publicly said for the destruction of the Company's government. Now, it is evident that if a large number of Europeans be allowed to settle in the country, they would form a counterpoise, in some degree, to the hostile disposition of the native subjects, and in case of an internal commotion, or of foreign invasion, they would be found to be the only portion of the inhabitants that sincerely cooperates in the defence of the British sovereignty."[৩]

এই পত্রলেখক অবশ্য ভারতে শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশ স্থাপনের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বলেছেন যে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ভারতের মানুষদেরকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করে তুলেছে। ঐ ধরনের ইংরেজরা ভারতে বসতি স্থাপন করলে সম্পত্তিগত স্বার্থ নিয়ে দেশীয় লোকদের সাথে ইংরেজদের বিবাদ বিসম্বাদ বাধবে—তার ফলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেবে, ইত্যাদি। নানা কারণে ভারতে শ্বেতাঙ্গ জনবল রপ্তানীর (Export of European manpower-এর) নীতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নি।

অতএব ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারী সুরক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে অধিকৃত দেশে একটি স্থায়ী ইংরেজভক্ত ব্লক সৃষ্টির নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হল। ভারতবাসী উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভাবান সন্তানগণকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকে মনেপ্রাণে ইংরেজানুরাগী করে তোলা। ধর্মের দীক্ষা নয়, দীক্ষা হবে বিলাতি কাল্চারের। তারা ইউরোপীয় বিদ্যায় পারদর্শী হবে, ইংরেজের আচার আচরণ অনুরকরণ করবে, ইংরেজকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করবে। ইংলন্ডের ও পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির প্রতি ভক্তিতে বিগলিত চিত্ত হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশকে, নিজদেশের ঐতিহ্যকে, দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে অপাংক্তেয় বলে মনে করবে, নিজদেশকে বর্বরের দেশ বলে মনে করবে, দেশবাসীকে অসভ্য ও কুৎসিত বলে বিবেচনা করবে এবং মনে করবে যে ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করেছে এক অধঃপতিত বর্বর জাতিকে উদ্ধার করবার মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে—ভারতে ইংরেজদের দখলদারী ভারতবাসীর প্রতি বিধিদত্ত আশীর্বাদ, ইংরেজ ঈশ্বরপ্রেরিত দূত হয়ে এসেছে অসভ্য ভারতবাসীর মধ্যে সভ্যতার আলোক বিতরণের জন্য। সুপরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়গণের পূর্বোক্ত রূপ মানসিক গঠন সম্পূর্ণ করবার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম হল cultural conquest বা 'সাংস্কৃতিক বিজয়'। ভারতবাসীর একাংশের খ্রিস্টানীকরণের বদলে ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর ইঙ্গীকরণ। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী সম্মানজনক রাজকীয় পদে নিযুক্ত হবে—তার ফলে তারা হবে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী। যে ব্যক্তি যত ইংরেজানুরাগী হবে তার সামাজিক মর্যাদা তত উর্ধ্বগামী হবে। অতএব উপরে ওঠার লোভে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়েরা

সাংস্কৃতিক বিজয় বা ভারতবাসীর ইঙ্গীকরণ অভিযান

পরস্পরের সাথে ইংরেজভক্তির ও ইংরেজীয়ানার প্রতিযোগিতায় রত হবে। এদিকে তৎকালীন অবক্ষয়জর্জর ভারতীয় সমাজের পঙ্কিল জীবনে যে সকল কুপ্রথা ও কুসংস্কারের কীট অনুপ্রবেশ করেছিল সেগুলিকে প্রাধান্য দান করে নানা রচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনজীবনের একটা অতিশয়িত পঙ্কিল চিত্র তুলে ধরা হবে ভারতবর্ষের ও সারা পৃথিবীর শিক্ষিত জনমানসের সমক্ষে। যার ফলে ভারতবাসী শিক্ষিত সমাজ নিজেদেরকে হীন, অসভ্য ও বর্বর বলে মনে করতে অভ্যস্ত হবে। ভারতীয় জনমানস একটা হীনমন্যতা ও স্বজাতিবৈরের ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ইংরেজকে উদ্ধারকর্তা বলে বিবেচনা করতে থাকবে এবং পৃথিবীর কাছে ইংরেজরা বুক ফুলিয়ে প্রচার করতে পারবে যে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন অধঃপতিত জনগোষ্ঠীকে সভ্যমানুষে পরিণত করবার মহান ব্রত তারা গ্রহণ করেছে। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠক চরিত্র লোকচক্ষে ধরা পড়বে না। ভারতের মানুষ আধুনিক অর্থাৎ পুঁজিবাদী যুগের দর্শন বিজ্ঞানের খবর রাখে না। তারা অসভ্য আরণ্যক জাতির মত গাছ-পাথর ও পুতুল পূজা করে। তারা নারীদেরকে বন্য পশুর মত নির্যাতন করে। একজন পুরুষ ১০০ / ২০০ নারীকে বিবাহ করে। পুরুষের মৃত্যু ঘটলে তাদের পত্নীদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারে, তারা অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পথে ঘাটে বিচরণ করে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করে, তারা কদর্য, কুৎসিত ও নক্কারজনক আহার্য গ্রহণে অভ্যস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত হলে গাছপাতার রস প্রয়োগ ও পুতুল ও পাথর দেবতার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোন প্রকার চিকিৎসা জানে না। পুতুল দেবতার কাছে সন্তান বলি দেয়, কোলের বাচ্চাকে ঢাকঢোল বাজিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়, তারা নারীদের ঘরের মধ্যে বন্দিনী করে রাখে, ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে, ইত্যাদি নানা প্রচার চলতে থাকে। ভারতীয়দের সম্পর্কে ইংরেজ পাদ্রীরা বিদেশের পত্রিকায় এমন প্রচারও করত যে ভারতবর্ষের মানুষ শিশু সন্তানকে হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করে।

ইংরেজ যখন ভারতের রাজশক্তি হস্তগত করে তখন ভারতবর্ষের 'সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা'র সমস্ত গৌরব অস্তগত হয়েছে। সমাজ তখন অবক্ষয়ের পাঁকে আবক্ষপ্রোথিত। সুতরাং নানা কদর্যতার কীট যে অবক্ষয়ের বদ্ধজলার মধ্যে বংশবৃদ্ধি করছিল এ কথা মিথ্যা নয়। সামন্ততান্ত্রিক স্তর থেকে পুঁজিবাদী স্তরে সমাজের উত্তরণের উপযোগী সমস্ত উপাদান ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী উদ্যম (Capitalistic initiative) না থাকার ফলে সমাজ অবক্ষয়ের পাঁকে ডুবে যেতে লাগলো। অবক্ষয় যুগের ভারতবর্ষের যে বর্ণনা ইংরেজদের লেখনীপ্রসূত হয়ে এদেশে ও বিদেশে প্রচারিত হতে লাগলো—তার মধ্যে অনেক সত্য ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষ যত মলিনই হোক না কেন—ঐ বর্ণনাই তার প্রকৃত স্বরূপবর্ণনা নয়। মহাত্মা গান্ধীর অননুকরণীয় শব্দচয়ন অনুসরণ করে ঐ বর্ণনাকে drain inspector's report আখ্যা দেওয়া যায় এবং গান্ধীজীর ভাষাতেই প্রশ্ন করা চলে—লন্ডনের নর্দ্দমার পাঁক এক জায়গা জড়ো করে যদি বিশ্ববাসীকে ডেকে বলা যায়, 'behold London!'—তা হলে কি সেটা উচিত কাজ হবে? রংচড়ানো সত্য তার সত্যতা হারিয়ে ফেলে। বক পাখীর ঠোঁটটা ছুরির মত—এটা সত্য। কিন্তু যদি বলি বকপাখী ছুরির মত— তবে সেটা সত্য হবে না। একটা বস্তুর একাংশের রূপকে ঐ বস্তুর সম্পূর্ণরূপ বলে প্রচার করলে তাকে সত্যপ্রচার বলা যায় না। ইংরেজরা ভারতবর্ষের আদাড়, আস্তকুঁড় ঘেঁটে আবর্জ্জনা জড়ো করে বিশ্ববাসীকে

এবং ভারতবাসীকে ডেকে বলতে লাগলো 'Behold India!'—'এই দেখো ভারতবর্ষ!' এই সুকৌশলী মিথ্যা প্রচারণা ইংরেজের "সাংস্কৃতিক বিজয়ের" একটি ফলপ্রদ হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভারতীয়গণের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় উচ্চ শিক্ষার প্রচার যে ভারতীয় জীবনে নবযুগের উদ্বোধন করে, আমাদের জাতীয় জাগৃতির মূলে যে ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার প্রচন্ড অবদান রয়েছে একথা অবিতর্কিত সত্য। কিন্তু গোড়ায় ভারতে উচ্চপর্যায়ের ইংরেজীশিক্ষা প্রচার সম্পর্কে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। ভারতবাসীগণের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রচারের ব্যাপার নিয়ে বিলাতের শাসকশ্রেণীর মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। একদল ইংরেজ অভিমত প্রকাশ করেন যে ভারতীয়গণকে পাশ্চাত্যশিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত করবার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁরা বলেন শুধু ছোটখাটো কেরাণী পর্যায়ের কাজ চালানোর মত অল্পস্বল্প ইংরেজীশিক্ষা দিলেই প্রশাসনের কার্য নির্বাহ হবে। তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের ইংরেজীশিক্ষা দান সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হবে। অপর একদল অভিমত প্রকাশ করেন যে, যে সকল ভারতবাসী ইংরেজী উচ্চশিক্ষা লাভ করবে তারা স্বভাবতই ইংরেজানুরাগী হবে ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভরূপে বিরাজ করবে। এই বিতর্ক পরে উপস্থাপিত হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমন্স্ সভায়। একদল বক্তা এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে ভারতে ইংরেজী উচ্চশিক্ষা প্রচারের মাধ্যমেই ভারতবাসী শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে শক্তিশালী ইংরেজভক্ত ব্লক সংগঠিত করা সম্ভব। তাঁরা বলেন— রোমানগণ যখন ইংলন্ড জয় করে তখন তারা ইংরেজ জাতির 'রোমীয় করণে' মনোযোগী হয় (When the Romans conquared England they began to Romanise us)। তখন রোমীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজরা রোমান জতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করতে থাকে। রোমের ইতিহাস, রোমান রীতিনীতি, আচার আচরণের প্রতি তাদের অন্তরে এক অতিশয়িত শ্রদ্ধার জ্যোতির্বলয় সৃষ্ট হয়। রোমের বীরগণ তাদের উপাস্য হয়, এবং তারা সর্বপ্রকারে রোমীয় অনুকরণকেই জীবনবেদ বলে গ্রহণ করে। সেইরূপে ভারতে উচ্চপর্যায়ের ইংরেজীশিক্ষার ব্যবস্থা করলে, যে সকল ভারতবাসী ইংরেজীশিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হবে, তারা ইংরেজকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করবে, ইংরেজের সভ্যতা, ইতিহাস, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রীতিনীতি ও আচার আচরণের প্রতি বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় তাদের অন্তর আপ্লুত হবে। লন্ডনকে তারা স্বর্গ বলে মনে করবে, ইংরেজীয়ানা হবে তাদের জীবনবেদ। ইংরেজদের সাথে তুলনা করে নিজের দেশ ও দেশবাসীকে তারা হীন ও জুগুপ্সিত বলে মনে করবে—"And the educated class amongst them, knowing that their elevation on our lines, rests on us, will naturally cling to us."[5]

সুতরাং হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা ও ভারতে ইংরেজী উচ্চশিক্ষার প্রচারব্যবস্থাকে আমরা আধুনিক কালে ভারতের জাতীয় জাগৃতির উদ্বোধক বলে যত গর্বই করি না কেন ইংরেজদের ঐ প্রয়াসের মূল প্রেরণা ছিল সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি। ইংরেজীশিক্ষিত ভারতবাসীদের নিয়ে ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী ইংরেজানুগত ব্লক সৃষ্টিই ছিল ভারতে ইংরেজী উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মৌলিক উদ্দেশ্য। অবশ্য, একথা সত্য, যে ইংরেজেরা তাদের সিংহাসনে নিরাপত্তার স্বার্থে যে

প্রয়াস শুরু করেছিল তার ফল তার উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে গিয়েছে এবং পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকধারার গর্ভ থেকেই পরবর্তীকালে আধুনিক ভারতের নব জাগৃতিক উদ্যম জন্মলাভ করেছে।

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে অবক্ষয়-জর্জর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মুমূর্ষু-অবস্থার গর্ভজাত সামাজিক ধ্যান ধারণা ও আচার আচরণসমূহ বাস্তবতাবিরোধী, প্রগতিবিরোধী ও নানা কদর্যতাযুক্ত হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার ভূমিকা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সমাজ উন্নততর স্তরে উত্তরণের অপেক্ষায় থাকে এবং সেই উন্নততর স্তর হল পুঁজিবাদী স্তর। অতএব অবক্ষয়দুষ্ট সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙাচোরা ব্যাধিগ্রস্ত চেহারার পাশে উন্মেষশীল পুঁজিবাদী সমাজের ভাবমূর্তি নিঃসন্দেহে অনেক বেশী উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হয়। ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয় যুগ শুরু হয়েছে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষাংশ থেকে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে। দীর্ঘ দুই শতাব্দীব্যাপী একটানা অবক্ষয়ের অন্তিমলগ্নে শাসনদন্ড ইংরেজের হস্তগত হল। ইউরোপীয় দেশসমূহ তথা গ্রেট্ ব্রিটেন ততদিনে দ্রুত প্রাগ্রসরণশীল পুঁজিবাদী অর্থনীতির অঙ্কাশ্রিত হয়ে নূতন সভ্যতার জয়পতাকা উড়িয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে। নূতন অর্থনীতির গর্ভজাত নানা প্রগতিশীল ধ্যান ধারণা প্রাগ্রসরণশীল পুঁজিবাদী দেশে নূতন জীবনের জোয়ার এনেছে। তৎকালীন ইংলন্ডের পাশে তৎকালীন ভারতবর্ষকে এক পংক্তিতে দাঁড় করানো যায় না। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় নবীন ইংলন্ডের আত্মিক ও বাস্তব ঐশ্বর্যের সমারোহ দেখে ভক্তিতে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। নব্যশিক্ষিত ভারতীয়দের চোখে ইংরেজেরা জ্যোতির্মণ্ডিত স্বর্গের দেবতাদের মত প্রতিভাত হলেন। ইংলন্ডকে তাঁরা স্বর্গ মনে করতে লাগলেন। বৃদ্ধা ভিখারিনীর মত আমাদের দেশমাতাকে মেজে ঘষে সভ্য সমাজের সামিয়ানার এককোণে দাঁড় করানোর মত যোগ্যতা দান—একমাত্র ইংরেজরাই করতে পারে। অতএব ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল ইংরেজের অভিভাবকত্বাধীনে থাকতে হবে—এ বিশ্বাস নব্যশিক্ষিতদের মনে বদ্ধমূল হল। ইংরেজীশিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় বিদগ্ধজনের ইঙ্গীকরণ অনায়াসেই সম্পন্ন হল। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি আশাতীতরূপ সফলতা লাভ করলো। ইংরেজরা সুকৌশলী প্রচারকার্য্যের মাধ্যমে ভারতীয় মানসে জাতীয় হীনমন্যতার দুষ্ট ব্যাধি অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিল।

ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর ইঙ্গীকরণ অভিযানে ইংরেজদের প্রাথমিক সাফল্য

বলা বাহুল্য ইঙ্গীকরণ অভিযানে ইংরেজদের টার্গেট ছিল প্রধানত উচ্চবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের উঠ্‌তি যুবেকরা। এ ব্যাপারে ইংরেজেরা মুসলিম সমাজের দিকে আদৌ হাত বাড়ান নি। মুসলমানেরা সযত্নে ইংরেজীয়ানার সংস্পর্শ পরিহার করেছেন এবং সেই সাথে যুগোপযোগী আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

ইংরেজীশিক্ষা ও ইংরেজ জাতির সান্নিধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করলো। প্রশাসনব্যাপারে ইংরেজ রাজপুরুষদের জুনিয়র সরিক হওয়ার দাবি, বিলাতী পার্লামেন্টের দেশীয় ক্যারিকেচার—পার্লামেণ্টারী ক্ষমতাবর্জিত ইন্ডিয়া কৌন্সিল ও প্রাদেশিক কৌন্সিলের ২৪টি সদস্যপদ, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির

কর্তৃত্বের ছিটেফোঁটা অংশ এই সকলের যতটা সম্ভব অর্জন করে সামাজিক কৌলিন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াসী হলেন নব্যশিক্ষিত নকল সাহেবসম্প্রদায়। ইংরেজী শিক্ষাই তাঁদের মনে এই নূতনতর সামাজিক কৌলিন্যের লোভ জাগিয়ে দিল। আর সেই কৌলিন্য অর্জনের সোজা পথ হয়ে দাঁড়ালো রাজভক্তির রসে ডোবানো চোস্ত ইংরেজী ভাষা রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক সমস্যা ও দাবি দাওয়া নিয়ে অতি সতর্ক ভাষণ দান ও আরজি রচনা এবং নিষ্ঠাবান হিন্দুরা যেমন মাঝে মাঝে বারানসী বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা মানসিক তৃপ্তি লাভ করেন তেমনি মাঝে মাঝে 'হোম' অর্থাৎ ইংলন্ড ঘুরে আসা। ইংরেজেরাও এই সব তথাকথিত সম্মান ও সৌভাগ্যের টোপ ফেলে নব্যশিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর রুইকাত্‌লাদেরকে বড়শীতে গেঁথে নিজেদের খাঁচায় পুরতে লাগলেন। এই নূতন দেশনায়কদের নিজস্ব সভা—ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে লিওনার্ড. এ. গর্ডন মন্তব্য করেছেন ঃ

নব্য ন্যাশালিষ্ট গোষ্ঠীর উদ্ভব ও ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম।

"The British Indian Association was a group of notables representing some of the wealthy and influencial families in Bengal, all high caste Hindus. They described themselves as a 'middle class' but the term probably meant to their growing wealth, power and respectibility. Their families came to prominence with the 'Raj' often working for it...They claimed to speak for Indian society and were accepted in an advisory role by the Government throughout the third quarter of the century ...They were not politicians in any modern sense, but rather amateur patrons whose credo did not dictate extensive organisation building or gathering of supporters. They initiated the politics of petitioning, acting, as a small coterie of influentials who reached the men in power when questions arose that were of significance to them. The Government of Bengal cooperated by appointing a number of the Association's members of Bengal Legislative Council.

...Their loyalist stance made them 'Government men' in the eyes of the new political groups of later nineteenth century."[২]

এই নব্য নায়কদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করেছেন তার মধ্যেই এদের স্বরূপ যথোচিত রূপে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ঃ

দাস্যসুখে হাস্যমুখ, বিনীত জোড়কর
প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর।।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি—ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি, যেতেছ ফিরি ঘর।।
ঘরেতে বসি গর্ব কর পূর্বপুরুষের—
আর্য্যতেজদর্পভরে পৃথ্বী থরথর।।

ইঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ইংরেজী শিক্ষিত সন্তানেরা তাৎকালিন

ইউরোপের প্রাগ্রসরমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির গর্ভজাত রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার সাথেও পরিচিত হলেন এবং এইভাবে বিলাতের অনুকরণে ভারতবর্ষেও কিছু কিছু লোকমত প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সভাসমিতি গঠন, ছোটখাটো স্বাধিকারের দাবি দাওয়া উত্থাপন, প্রশাসনিক ব্যাপারে ভারতীয়গণের নিজস্ব মতামত প্রকাশের ক্ষেত্র হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ছাঁচে ঢালাই করা প্রকৃত ক্ষমতাবর্জিত ঠুটো জগন্নাথ গোছের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কৌন্সিলগুলিকে কাজে লাগানো ইত্যাদি প্রচেষ্টার সূত্র ধরেই এদেশে বিলাতী ধরণের 'ন্যাশনালিষ্ট' ভাবধারার পুষ্টি ঘটতে থাকে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম এই ভাবধারারই ঐতিহ্যবাহী। কংগ্রেসের জন্মযুগে যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা ও লালন-পালন কর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হন তাঁদের প্রায় সকলেই উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ইঙ্গীকৃত ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসী। দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতেও এঁরা ভয় পেতেন। সুতরাং কংগ্রেস যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইংরেজানুগত্যের ছত্রতলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদেরকে সতত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির উপর দাঁড়িয়ে ছোটোখাটো দাবিদাওয়া সকাতর নিবেদনের ভাষায় মহামান্য ভারত সম্রাটের গোচরীকৃত করা ছাড়া ঐ প্রতিষ্ঠানের অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অনেকেই জানেন যে ১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ইংরেজ শাসকবর্গকে বিশেষভাবে আতঙ্কিত করে এবং ইংরেজের প্রতি আনুগত্যশীল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোকদের নেতৃত্বে একটা তথাকথিত জনমত প্রকাশের প্রতিষ্ঠান খাড়া করবার পরিকল্পনা ইংরেজ শাসকদের মস্তিষ্কে স্থানলাভ করে। তাঁদের ধারণা হয়েছিল এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে ভারতবাসীর সম্ভাব্য বিদ্রোহ-প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির কাজে লাগবে।

কংগ্রেসের জন্ম ইতিহাসের সাথে অবসরভোগী ইংরেজ সিভিলিয়ান স্যার আর্থার আক্টিভিয়াস্ হিউমের নাম জড়িত হয়ে রয়েছে। হিউম সাহেব কিছুটা ভারতপ্রেমিক ছিলেন—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষীয় ধর্মীয় চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত মাদাম ব্লাভাটস্কি, কর্ণেল অল্কট্ (Col. Olcott) প্রভৃতি ভারতপ্রেমিক থিয়োসফিস্ট (theosophist)-দের সাথে হিউম সাহেবের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় জনমত প্রকাশের একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান সংগঠনের চিন্তা হিউম সাহেবের মস্তিষ্কে স্থান লাভ করেছিল। তার এই চিন্তার কথা তিনি ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফ্রিণের কাছে ব্যক্ত করেন। হিউম সাহেব প্রস্তাব করেন যে, ঐরূপ প্রতিষ্ঠান চরিত্রগত ভাবে একটি সামাজিক সঙ্ঘ (Social Conference) হবে। কিন্তু বড়লাট লর্ড ডাফ্রিণ তাঁকে ঐ ধরণের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য উপদেশ দান করেন।

কংগ্রেসের জন্ম কথা

"The Viceroy advised him however to have a political conference instead, which would work as a safety valve to the British administration."[১] লর্ড ডাফ্রিন মনে করেছিলেন ইংরেজের প্রতি আনুগত্যশীল অভিজাত ভারতবাসীদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হলে একদিকে যেমন শাসক ও শাসিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়ে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে—অন্যদিকে তেমনি চরমপন্থী অসন্তোষ ও বিদ্রোহপ্রবণতার বিরুদ্ধে ঐ প্রতিষ্ঠান একটি শক্ত প্রতিরোধের দুর্গের কাজ করবে। সুতরাং

দেখা যাচ্ছে আদিতে কংগ্রেসের পত্তন হয়েছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পোষকরূপে এবং ইংরেজ বড়লাটের আশীর্বাদধন্য হয়ে। প্রথম যুগের কংগ্রেসের খ্যাতনামা সংগঠকদের নিজস্ব উক্তি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতিকে ঐ সংগঠকদের মনোভাবের দর্পণরূপে বিবেচনা করা যায়।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি, ইঙ্গীকৃত ভারতীয় সমাজের বিশিষ্ট নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee) যে ভাষণ দান করেন, তার রিপোর্ট থেকে পাচ্ছি ঃ

"There were no more thoroughly loyal and consistent well-wishers of the British Government than were himself and the friends around him..... Much has been done by Great Britain for the benefit of India and the whole country was truly grateful to her for it. She had given them order. she had given them railways. and, above all. she had given them the inestimable blessings of western education.....He thought their desire to be governed according to the ideas of Government prevalent in Europe was in no way incompatible with their thorough loyalty to the British Government. The discussions that would take place in this Congress. would. he believed. be as advantageous to the Ruling authorities as he was sure. it would be to the people at large."[৭]

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার টি. মাধব রাও তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

"England has taken us in her bosom and claims us as her won. We appeal to her by the sweetest, the gentlest. the tenderest and yet withal by the most durable of all ties which binds mother to her offsprings to confer upon us the inestimable boon of representative institutions and. I am sure. we shall not appeal in vain."[৮]

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে আহ্‌মেদাবাদে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঃ

"Our loyalty is admittedly so genuine. so deep and so intensely realistic that even the Secretary of State had no conception of it. ....I would welcome an imperialism which would draw us nearer to Britain by ties of a common citizenship and which would enhance our self-respect by making us feel that we are participators in the priceless heritage of British freedom..."[৯]

দাবিদাওয়া উত্থাপনের বেলায় Lion of Bengal সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের সিংহগর্জন মার্জারের মিউ মিউ শব্দে পরিণত হল ঃ

"We have no higher aspiration than that we should be admitted into the

great confederacy of self-governing states of which England is the august mother. We recognise that the journey towards the destined goal must necessarily be slow and that the blessed consummation can only be attained after prolonged preparation and laborious apprenticeship. But a beginning has to be made...."[১০]

ঐ কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে (কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ১৮ বছর কাল অতীত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও) সুরেন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চিরন্তন ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকাই ভারতবাসীর জাতীয় লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন, তিনি বলেন ঃ

"We are already sufficiently loyal—sufficiently attached to the British connection. But we are anxious for the permanence of British rule for our permanent incorporation into the great confederacy of the British Empire."[১১]

উনিশ শতকের জাতীয় জাগৃতির দ্বৈত চরিত্র ও বিভক্ত নেতৃত্ব

সুতরাং ভারতবর্ষে একটি প্রভাবশালী ইংরেজানুরাগী ব্লক গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজরা উচ্চশিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত ভারতীয়গণের ইঙ্গীকরণের যে অভিযান পরিচালনা করেন তা ইংরেজগণকে যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য দান করে এবং বিভিন্ন লেখক এই সাফল্যকেই ভারতবাসীর উপরে ইংরেজের 'সাংস্কৃতিক বিজয়' বা Cultural conquest নামে অভিহিত করে থাকেন। 'সাংস্কৃতিক বিজয়' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে বিশেষ শ্রেণীর রুই কাত্‌লাদেরকে ইংরেজেরা আপন খাঁচায় পুরতে সমর্থ হন তাঁরা প্রায়শই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। আর্থিক বিচারে এঁরা ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পেশায় এঁদের বেশীর ভাগ বুদ্ধিজীবী (যদিও এঁদের শিকড় প্রোথিত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদপুষ্ট ভূস্বামীতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে), উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার চোখ ধাঁধানো চাকচিক্য এবং অনেকক্ষেত্রে উচ্চ পদাধিকার এদের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে এক নতুন আভিজাত্যের জ্যোতির্বলয় রচনা করেছিল। তৎকালীন ভারতীয় সমাজের বিচিত্র গঠনভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে এঁরা যে প্রচুর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন এ কথা অনস্বীকার্য। এই সম্প্রদায়কে ভাবতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত রক্ষক হিসাবে লাভ করে ইংরেজরা স্বস্তি অনুভব করেছিলেন সন্দেহ নাই। ইংরেজরাও মাঝারীস্তরের উচ্চপদে নিয়োগ, কৌন্সিল কর্পোরেশন ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই শ্রেণীর লোকদের সুযোগ করে দেওয়া, নানা রাজকীয় উপাধির তাজ এঁদের মস্তকে স্থাপন করা ইত্যাদির মাধ্যমে এঁদের মানমর্যাদা বৃদ্ধির প্রতি যত্নশীল হয়েছিলেন। উনিশ শতকে ভারতে ইংরেজের অধিকৃত এলাকার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে। তার ফলে মাঝারীস্তরের প্রশাসনিক পদ পূরণের জন্য ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় কর্মচারীর চাহিদাও বৃদ্ধি পায় এবং এইভাবে ইংরেজানুরাগী নব্য সম্প্রদায়ের দ্রুত সম্প্রসারণও ঘটতে থাকে।

দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই সম্প্রদায়ের করায়ত্ত হোক এটা ছিল ইংরেজদের একান্ত অভিপ্রায়। তাহলে এরাই দেশের নেতা বলে গণ্য হবে এবং সারা পৃথিবীর লোক দেখতে পাবে যে ভারতবাসীদের অনুমোদনক্রমেই ভারতের মঙ্গলের জন্য ইংরেজরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। যদিও দেশের জনসাধারণের সাথে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ

কোন যোগাযোগ ছিল না তথাপি ইংরেজ এদেরকেই জাতির প্রতিনিধি বলে সর্বত্র জাহির করতে লাগলো।

স্বাভাবিক ভাবেই বিলাতী কায়দায় 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' প্রচারে এই নব্য সম্প্রদায় ব্রতী হলেন। দেশের দুর্দশা নিয়ে কিছু অশ্রু বিসর্জন, প্রশাসনে দেশীয়দের অধিকার ও মর্যাদাকে একটু একটু করে বাড়ানো, ২৪টা প্রশাসনিক অপকর্মের সমালোচনা—এইসব নিয়ে ইঙ্গভারতীয় ন্যাশনালিজ্‌মের গোড়াপত্তন। তার প্রধান মঞ্চ হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—পাশাপাশি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, পুনার সার্বজনিক সভা প্রভৃতির মত কিছু কিছু সভাসমিতি। ইংরেজের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য হল এই নব্য ন্যাশনালিজ্‌মের মূলমন্ত্র। ইংরেজের অভিভাকত্ব ছাড়া ভারতীয়রা সভ্যজগতের সামিয়ানার নীচে স্থান লাভ করবার মত সাবালকত্ব অর্জন করতে পারবে না—এই মৌলিক বিশ্বাসের উপর নব্য ন্যাশনালিজ্‌মের ভিত্তি স্থাপিত হল। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনে এই নব্য ন্যাশনালিজ্‌মের নেতৃত্ব অটুট ছিল।

ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে যুক্তিবাদ, গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ, জাতীয় আত্মসচেতনতা প্রভৃতি পুঁজিবাদের গর্ভজাত উন্নত ধ্যানধারণা নবশিক্ষিত সমাজের মানসকে অভিসিক্ত করে। তার ফলে ইংরেজের 'সাংস্কৃতিক বিজয়' পরিকল্পনার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধতে থাকে ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের অপর এক অংশের মধ্যে। শিক্ষিত ভারতবাসীর চিত্তকে জাতীয় হীনমন্যতার দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখবার প্রয়াসে ইংরেজ পাদ্রী ও লেখকগণের নিয়ত প্রচার ভারতবাসীর জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধকে প্রতিনিয়ত আহত করছিল। এই আঘাত থেকেই উদ্ভূত হল ইংরেজানুগত্যের রাঙ্‌তামোড়া, ব্রিটিশ ট্রেড্‌মার্কযুক্ত ন্যাশনালিজ্‌মের প্রতিকূল ভাবস্রোত। সিপাহী বিদ্রোহের প্রচন্ড আলোড়ন ও তার ব্যর্থতার পর ইংরেজদের পৈশাচিক প্রতিহিংসার অভিযান জাতীয়মানসে আত্মমর্যাদাবোধ উদ্দীপ্ত করলো। জাতীয় হীনমন্যতার বিরুদ্ধে দৃপ্ত বিদ্রোহ মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন একদল বিদগ্ধ ভারতবাসী। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই নূতন ভাবস্রোতের ভগীরথ বলে বর্ণনা করা যায়। ভারত হীন নয়, বর্বর নয়, ভারতবর্ষ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী—ভারতবর্ষের কাছে পাশ্চাত্যজগৎ জ্ঞান ও জীবন সাধনার দীক্ষা নিতে পারে—শিক্ষিত ভারতবাসীরা দৃপ্ত কণ্ঠে এই সকল কথা প্রচার করতে লাগলেন। এই ভাবস্রোত একদিকে যেমন জাতীয় হীনমন্যতার কলুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক যুগের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভক্তির রঙে রাঙিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে প্রযত্নশীল হল, আর তারই পাশাপাশি প্রাবাহিত হতে লাগলো পরাধীনতার বেদনা ও পরশাসনের প্রতি নিন্দা ও ধিক্কারের স্রোত। এই নতুন ভাবস্রোতই উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী নবজাগৃতি নামে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আখ্যাত হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদী ভাবের বন্যার সূচনা হয় উনিশ শতকের ষাটের দশকের প্রারম্ভ থেকে। কবিতা, গান, লোকসঙ্গীত, প্রবন্ধ কথাসাহিত্য, নাটক—এই সকলের মধ্য দিয়ে এই নতুন ভাবস্রোত খরবেগে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র জাতীয় মানসকে প্লাবিত করলো।

ইঙ্গীকৃত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্কন্ধবাহিত 'মেড্-ইন্-ইংল্যান্ড' ছাপমারা ন্যাশনালিজ্‌মের সাথে এই জাতীয় আত্মসচেতনতাদৃপ্ত জাতীয়তাবাদী ভাববন্যার চরিত্রগত বৈপরীত্য সুস্পষ্ট।

পূর্বোক্ত ন্যাশনালিস্টদের বোধ ও চেতনা ছিল ইংরেজানুগত্যের তবক্‌মোড়া, তাঁদের ধারণায় ইংরেজরা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। ইংরেজের অভিভাবকত্বকে তাঁরা ভারতের জাতীয় উন্নতির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করতেন—ইংরেজের সম্পর্ক বর্জিত স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতেও তাঁদের বুক কেঁপে উঠতো। প্রকৃত প্রস্তাবে যা কিছু আন্দোলন এই শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নামগন্ধ ছিল না। ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁদের যাবতীয় দাবি দাওয়ার তালিকা রচিত হত। উর্দ্ধতন শ্বেতাঙ্গ শাসকদের ছত্রছায়াতলে মাঝারী শ্রেণীর প্রশাসনিক চাকুরীগুলির ভারতীয়করণ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কৌন্সিলসমূহে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যাবৃদ্ধি, ভারতবর্ষে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগসমূহে (in commercial and industrial enterprises) শিক্ষিত ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার লাভের সুযোগ, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি দাবিগুলির লক্ষ্যস্থল আন্দোলনকারী উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানগণের ভবিষ্যত নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। মধ্যে মধ্যে এঁদের কণ্ঠ থেকে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য আর্তি ধ্বনিত হত বটে কিন্তু সে ছিল নিতান্তই মায়াক্রন্দন। পূর্বোক্ত শ্রেণীর কবলিত কংগ্রেস ১৮৮৫ থেকে ১৯১৭-১৮ পর্যন্ত যে আন্দোলন করেছে সে আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ছিল না—তা ছিল ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ পোষণের আন্দোলন।

পক্ষান্তরে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসন ও ইরেজীয়ানার বিরোধী। জাতীয়তাবাদী ভাবস্রোত যে নূতন স্বদেশচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করলো, সে চেতনায় 'স্বদেশ' শুধুমাত্র একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমাবেষ্টিত ভূখন্ড নয়—'স্বদেশ' আমাদের জননী, আমাদের উপাস্যা দেবী—দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।" এই নূতন জাতীয়তাবাদ ছিল অতিশয়িত রূপে জাতিগর্ব ও দেশগর্বের ভাবালুতায় মন্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ভারতমাতাকে অভিনন্দিত করলেন 'ভুবন মনোমোহিনী' বলে, মানব সভ্যতার জননী বলে, আরও কত শত অনবদ্য বিশেষণে বিভূষিত করে। দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন ঃ 'মহিমার তুমি জন্মভূমি মা এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।' প্রাচীন ভারতকে মনোহারিণী মূর্তিতে সাজিয়ে নব্য জাতীয়তাবাদ তাকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরে সগর্বে ঘোষণা করলো "এই আমাদের ভারতবর্ষ।" পরাধীনতার নিন্দা ও ধিক্কারে মুখর হয়ে উঠলো নবীন জাতীয়তাবাদ। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গীকৃত ইংরেজানুরাগী ন্যাশ্‌নালিস্ট দেশনায়কগণের—'কম্প্রবক্ষ-যুক্তকর' আবেদন নিবেদনের রাজনীতিও জনমানসে জুগুপ্সা জাগাতে সুরু করলো। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে ইংরেজী শিক্ষালব্ধ যুক্তিবাদের সাথে তাঁর প্রগাঢ় পান্ডিত্য মিশিয়ে যেমন প্রাচীন ভারতের অনবদ্য ভাবমূর্তি গড়ে তুললেন, অন্যদিকে তেমনি 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতি অনবদ্য ও সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে ইংরেজ ও ইংরেজীয়ানার প্রতি অনুরাগকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। এতদিনের মোহগ্রস্ত ঘুমন্ত জাতি সদর্পে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো। বঙ্কিমচন্দ্রের অসমাপ্ত কার্যটুকু সুসম্পন্ন করলেন উনিশ শতকের আর এক মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ঘুমন্ত নির্বীর্য জাতিকে প্রচন্ড কশাঘাতে প্রবুদ্ধ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তিনি

একদিকে যেমন ভারতবর্ষকে আত্মসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করলেন অন্যদিকে তেমনি সারা পৃথিবীকে ভারত-সচেতন করলেন। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচার এবং তার 'সাংস্কৃতিক বিজয়ের' দ্বারা অর্জিত ফল সব নিরর্থক হল।

ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হয়ে ভারতীয় মানসে জাতীয় হীনমন্যতার ঘুমপাড়ানী নির্যাস সিঞ্চন করে ভারতবাসীকে সুদীর্ঘকাল আত্মবিস্মৃত ও লজ্জাবনত করে রাখবার যে চক্রান্তজাল বিস্তার করেছিল, উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাববন্যা এলো ইংরেজের সেই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃপ্ত, উদ্ধত ও উদ্দাম প্রতিক্রিয়ার রূপ নিয়ে। এই নবজাগৃতির প্লাবন যে অনেকখানি ভাবোন্মাদনার ব্যত্যাতাড়িত ও রোমান্টিক ভাবালুতায় মন্ডিত ছিল এ সত্য সর্বথা স্বীকার্য—কিন্তু একটা আত্মবিস্মৃত জাতি যখন অকস্মাৎ আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় তখন একসাথে জেগে ওঠার উন্মাদনা স্বভাবতই তাকে অস্থির করে তোলে এবং সেই অবস্থায় যুক্তিবাদের বাঁধা পথে পা টিপে টিপে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না; এবং একথাও অনস্বীকার্য যে জাতীয় হীনমন্যতা ও আত্মাবমাননার অভিশাপকে ধুলিলুণ্ঠিত করবার জন্য ঐ প্রকার দৃপ্ত এবং ভাবোন্মাদনাসমৃদ্ধ সমুত্থানের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

প্রায় ২০০ বৎসর যাবৎ ক্রমবৃদ্ধিশীল সামাজিক অবক্ষয়ের পঙ্ককুন্ডে প্রোথিত তৎকালীন ভারতবর্ষের 'বর্তমান' ছিল নানা সামাজিক দুষ্টব্যাধি কবলিত এবং কুৎসিত। সেই 'বর্তমানকে' বিশ্ববাসীর সমক্ষে গৌরবের পতাকার আকারে তুলে ধরা যায় না। তাই অপরিহার্য প্রয়োজন বশেই 'বর্তমানকে' ছেড়ে দিয়ে ভারতের গৌরবময় অতীতকেই ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর সমক্ষে তুলে ধরতে হল জাতীয় গর্বের নিদর্শন রূপে। তার ফলে উনিশ শতকের ভাবালুতাপূর্ণ জাতীয় জাগৃতির মধ্যে এমন কিছু প্রবণতা দেখা দেয় যা অবাঞ্ছিত এবং প্রগতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যহীন। যে সমৃদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক যুগের ভারতবর্ষকে মহিমামন্ডিত করে আমাদের জাতীয় গর্বের নিদর্শন রূপে আমরা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলাম সে ভারতকে যে কিছুতেই আর ফিরিয়ে আনা যায় না—ভাবোন্মাদনাবশত একথা আমরা বিস্মৃত হলাম—একদিকে যেমন এই জাতীয়তাবাদী ভাবস্রোতের মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করলাম আত্ম-সচেতনতা, আত্মগৌরববোধ ও আত্মবিশ্বাস, যার ফলে হীনমন্যতার কৃষ্ণমেঘ অপসৃত হয়ে আমাদের চিত্ত প্রগাঢ় দেশপ্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হল, অন্যদিকে তেমনি আমাদের মন হল আধুনিকতার বিরোধী। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল পিছনের দিকে—সুদূর অতীতের স্বপ্নমায়াজড়িত এক কল্পনার ভারতের দিকে, জাতির দৃষ্টি সামাজিক বিবর্তনের স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করে সম্মুখের দিকে প্রসারিত হল না। তবে সুখের বিষয় এই যে স্বল্পকালের মধ্যেই স্বপ্নমায়াজড়িত অতীতের সম্মোহনজাল থেকে ভারতীয় মানস নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছিল। ইংরেজের দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত "সাংস্কৃতিক বিজয়ের' অভিযানকে প্রতিহত করতে গিয়ে অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদেই অতীত যুগের ভারতের গৌরবগাথাকে এই নব্য জাতীয়তাবাদী চেতনার বাহন রূপে গ্রহণ করতে হয়েছিল। অতীতের ভারতের সেই গৌরবময় যুগের সাথে মুসলমানগণের কোন সংস্পর্শ ছিল না। অতীত যুগের ভারতবর্ষের মহিমা কীর্ত্তনে যে সকল উপাদানকে গ্রহণ করতে হয়েছে সেগুলি হিন্দুভারতের লুপ্তমহিমার দ্যোতক। অতএব

উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও কর্মোদম স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান-বাদ বা Hindu revivalism-এর বর্ণে রঞ্জিত হয়েছিল

জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা যদিও ছিল বিশ্ববাসীর এবং বিভ্রান্ত ভারতবাসীর সামনে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার গৌরবকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে ভারতবাসীর মনে স্বদেশ প্রীতির উদ্বোধন ও বিদেশীদের মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি করা, তথাপি প্রাচীন ভারত বলতে যেহেতু হিন্দু-ভারত বোঝায় সেই হেতু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীদের চোখে প্রাচীন ভারতের জয়গান হিন্দুত্বের জয়গান রূপে প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার পুষ্টিসাধনের জন্য কাব্যে, নাটকে, কথাসাহিত্যে এমন অনেক কাহিনীকে প্রচার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হল যা প্রত্যক্ষতঃ মুসলিমবিরোধী। পৃথ্বিরাজ চৌহান, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়, রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ ইত্যাদি যাঁদেরকে দেশপ্রেমিকরূপে চিত্রিত করে কাব্য, নাটক, উপন্যাসাদি প্রচারিত হতে লাগলো, তাঁদের সংগ্রাম হয়েছে মুসলমানদের সঙ্গে। অর্থাৎ মুসলমান রাজশক্তির প্রতিপক্ষ রূপে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদেরকেই আমরা স্বাধীনতাকামী জাতীয় বীর রূপে চিত্রিত করে জনমনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করতে যত্নবান হলাম। সুতরাং যে দেশপ্রেমের উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে আমরা উক্তরূপ সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হলাম, মুসলমানগণ তাকে হিন্দুদেশপ্রেম বলে এবং মুসলিম বিরোধী প্রচারণা বলে মনে করতে লাগলেন। ভাবোন্মাদনার বশে হিন্দু লেখকেরা হয় ত তাঁদের রচনার এ ধরণের সম্ভাব্য ফলের কথা আদৌ বিবেচনা করেন নি। তাৎকালিন রাজনৈতিক অবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনকে আক্রমণ করে ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়ে সাহিত্য প্রচার সম্ভবপর ছিল না। সেইজন্য মুসলমানকে ছদ্মশত্রু রূপে খাড়া করে সেই নকল শত্রুর উপর শর নিক্ষেপের মাধ্যমে আসল শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় মানসকে উত্তেজিত করবার কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী লেখকগণ। মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদী আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিলেন না। ইংরেজের 'ডামি' (dummy) হিসাবে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে মুসলমানগণকে প্রতিপক্ষরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে জাতীয় মানসকে উত্তেজিতকরণের কোন প্রয়োজন বা প্রাসঙ্গিকতা ছিল না; কারণ তখন মুসলমানগণের হস্তে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ন্যস্ত ছিল না। ঐ সকল কাহিনী পাঠ করে পাঠকমানসেও মুসলিম বিরোধী প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয়নি। ইংরেজ ও ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধেই জাতীয় মানসে উত্তেজনার সঞ্চার ঘটেছে। পরিস্থিতির চাপে তৎকালীন লেখকগণ মুসলমানগণকে ইংরেজের dummy রূপে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এ বিষয়ে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সঙ্গীত' কবিতায় পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাতীয় মানসকে উত্তেজিত করবার দৃপ্ত প্রয়াস লক্ষিত হয়। ঐ কবিতা প্রকাশের জন্য যখন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় প্রেরিত হয় তখন তার মধ্যে কোথাও এমন ইঙ্গিত ছিল না যে কোন মহারাষ্ট্রীয় যুবক কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে স্বজাতীয়গণকে উত্তেজিত করছেন। কিন্তু ঐ কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহের আহ্বান ঘোষিত হওয়ায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐ কবিতা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করতে সাহসী হন না। কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সংবাদ পূর্বাহ্নে অবগত হন। তখন হিতৈষী বন্ধুগণের ও ভূদেববাবুর নির্বন্ধাতিশয্যে হেমচন্দ্র ঐ কবিতায়—"এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলি" ইত্যাদি

প্রকৃত পক্ষে মুসলমানকে আক্রমণ করা হিন্দু লেখকগণের উদ্দেশ্য ছিল না।

দুটি স্তবক যোগ করে দেন ও কবিতার শিরোভাগে একটি ভূমিকা যোগ করেন যার ফলে এরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় যে কবিতাটির আখ্যান বস্তু ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নয়। কবিতাটি যে মুঘল শাসনকে লক্ষ্য করে লিখিত হয় নাই তার অনেক প্রমাণ কবিতাটির মধ্যেই ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু রচয়িতাগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাই হোক্ না কেন কাব্য, নাটকে, কথাসাহিত্যে বিলুপ্ত 'হিন্দু গৌরবের' উচ্ছ্বসিত জয়গান ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাতীয় মানসে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য মুসলমান প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে শরক্ষেপণ স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম-মানসে অসন্তোষ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁদের মানসিক বিরূপতা উৎপাদনের কারণ হয়েছিল। হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ', 'ভারতভিক্ষা' 'কালচক্র' প্রভৃতি কবিতায় ব্রিটিশ শাসনকেই আক্রমণ করা হয়েছে। তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে কোন কোন লেখক 'ভারতীয়ত্ব' ও 'হিন্দুত্ব'-কে এমনভাবে একত্র করে ফেলেছেন যে পাঠকের কাছে ঐ দুটি শব্দ সমার্থক বলে প্রতিভাত হতে পারে এবং ভারতে প্রাচীন যুগের পুনরুদ্বোধনের আহ্বান পাঠকের কর্ণে হিন্দু-ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান রূপে ধ্বনিত হয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে প্রাচীন যুগের পুনরুদ্‌বোধনের কল্পনাটাই অবাস্তব। কারণ ইতিহাস যে সামাজিক স্তরকে অতিক্রম করে এসেছে, ইতিহাসকে পিছনের দিকে ঠেলে তাকে পুনরায় সেই স্তরে ফেরৎ পাঠানো যায় না। কিন্তু তৎকালিন ভাবালুতার স্রোতোবেগ সাময়িকভাবে বিজ্ঞান সম্মত যুক্তিবাদকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

মুসলমানগণ যদি একশো বছর যাবৎ পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোড়ন থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের চতুর্দিকে প্রাচীনতাজীর্ণ সমাজবোধ ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রাচীর তুলে স্বরচিত কারাকক্ষের মধ্যে আবদ্ধ করে না রাখতেন তা হলে হয় তো ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সর্বাঙ্গে হিন্দুত্বের রং মেখে ভূমিষ্ট হত না। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনা শুধু হিন্দু মস্তিষ্কের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলেই তার গায়ে বেশ খানিকটা হিন্দুয়ানির রং লেগেছিল। (সিপাহী বিদ্রোহকে এই আলোচনার বাইরে রাখছি। সিপাহী বিদ্রোহ একটা ভিন্ন প্রকৃতির বিস্ফোরণ। সিপাহী বিদ্রোহে বহু মুসলমান যোগদান করেছিলেন)। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবোন্মাদনার এই হিন্দুত্বপন্থী বহিরাবরণ অবাঞ্ছিত হলেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে অপরিহার্য ছিল। এ বিষয়ে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন ঃ

"India's national tradition and culture came to be equated, as a result of what they did, with tradition and culture of Hindus alone, all but exclusively. The identification of the nation with Hinduism was, at this stage of evaluation of Indian nationalism, perhaps inevitable, when Indo-Muslim aristocracy had practically been eliminated and as yet no middle class had emerged, when Indo-Muslim consciousness was still saturated with feudal nostalgia and common people, Hindus and Indo-Muslims alike, were quite socially inarticulate and ineffective."[১২]

এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের মনে আসে। মুসলমানেরা

কি ভারতবর্ষকে সত্য সত্যই তাঁদের স্বদেশ বলে মনে করতে পেরেছিলেন? যদি সত্য সত্যই তাঁরা ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করে থাকেন তা হলে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে শ্রদ্ধা করতে পারবেন না কেন? আজ আমরা কেউ যদি হিন্দু হয়েও ইরাণের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে সেখানেই পুরুষানুক্রমিক রূপে বসতি করতে থাকি তা হলে ইরাণের অতীত গৌরবকে কেন আমরা স্বদেশের গৌরব বলে মনে করব না এবং সেই গৌববে কেন নিজে গৌরববোধ করব না? প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের মধ্যে যদি কিছু গৌরবজনক থাকে তা হলে ভারতবাসী মাত্রেই সে গৌরবের অংশীদার। সে গৌরব শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাপ্য নয়— এ ধারণা ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, সকলেরই চিত্তে উদ্‌গত হওয়া উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে শুধু মুসলমানগণকেই দোষী করা যায় না। হিন্দুরাই কি কখনও এটা অনুভব করতে পেরেছেন যে প্রাচীন ভারতের গৌরবের সরিকানা অহিন্দুরাও দাবি করতে পারেন? যাতে অহিন্দু ভারতবাসীগণ প্রাচীন ভারতের গৌরবের ঐতিহ্যকে তাঁদের জাতীয় গৌরব বলে অনুভব করতে পারেন, সে বিষয়ে হিন্দুরা কতটুকু চেষ্টা করেছেন? শুধু মুসলমানদেরকে দোষ দেবো কেন? ভারতীয় খ্রিস্টানগণ এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানগণ এঁরাই কি কখনও ভারতবর্ষকে 'স্বদেশ' বলে মনে করতে পেরেছেন? জানি, যে সব দেশেরই প্রাচীন গৌরবের সাথে সেই প্রাচীনকালে সে দেশে যে ধর্ম অনুসৃত হত সেই ধর্ম জড়িয়ে রয়েছে। সেইজন্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন না। জাতীয়তা (nationhood)-কে ধর্মীয় বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার মত মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা এই আধুনিক কালেও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আয়ত্ব করতে পারেন নি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ

মুসলমাণগণ ইস্‌লাম ধর্মকে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি বলে মনে করেছেন

"I care not a pins head for your Hinduism. but I admire the grand mythology of our ancestors."

—আর এই মনোবৃত্তিই ছিল তাঁর 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' ইত্যাদি রচনার প্রেরণা। হিন্দু না হয়েও স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করা যায়।

তবে যুক্তির কথা যা-ই হোক্ না কেন উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী সাহিত্য ও প্রচারণা অতিশয়িত রূপে হিন্দুত্বের রঙ্গে রঞ্জিত হওয়ার ফলে মুসলিম মানসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে প্রতিকূলতা জন্মেছিল, এটা সত্য কথা। ইংরেজরা এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ কথাও সত্য, জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের লেখকগণ বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগঠকগণ—এঁদের কারও মনে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার কোন স্বপ্ন ছিল না। জাতীয়তাবাদীগণের পক্ষ থেকে যে স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হয়—সে দাবির মধ্যে ভারতবাসী কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার কোন প্রকার গুপ্ত ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল না। 'দেশের স্বাধীনতা' বলতে জাতীয়তাবাদীগণ গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত স্বাধীনতাই বুঝেছিলেন। ভারতবাসীর স্বাধীনতাই আন্দোলনের লক্ষ্যস্থল ছিল— কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার কথা কেউ চিন্তা করেন নি।

ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে যে মুসলমান সমাজ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা

আন্দোলন সম্পর্কে কখনও উদাসীন এবং কখনও প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন থাকলেও উনিশ শতকেই নির্ভেজাল মুসলিম নেতৃত্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে। ইতিহাসে এগুলি, ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮২৪-১৮৬১), তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮৩১-১৮৩২) এবং ফারাজী আন্দোলন (১৮৩৮-১৮৫৭) নামে পরিচিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখকদের মধ্যে কোন কোন লেখক এগুলিকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হিসাবে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা কোনমতেই এই বিদ্রোহগুলির একটিকেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশরূপে চিত্রিত করবার অনুকূলে কোন সমর্থন খুঁজে পাচ্ছি না, যদিও তিনটি বিদ্রোহই মুসলমানদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল এবং এতে যোগদানকারীগণ সকলেই ছিলেন মুসলমান।

ওয়াহাবী আন্দোলন, ফারাজী আন্দোলন বা তিতুমীরের বিদ্রোহ এগুলি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে আদৌ সম্পর্কযুক্ত ছিল না।

ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা অবদুল ওয়াহাব ছিলেন মিশর দেশের অধিবাসী। তিনি একটি মতবাদ প্রচার করেন যার মূল বক্তব্য ছিল এই যে, নানা বহিরঙ্গ আচার অনুষ্ঠান ও পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব ইস্‌লামের প্রাণশক্তিকে খর্ব করেছে—অতএব ইস্‌লামের বিশুদ্ধি প্রয়োজন এবং এই বিশুদ্ধিকরণ অভিযান সার্থক করতে হলে সর্বত্র ইস্‌লামিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই মতবাদকে ভিত্তি করে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার নামই ওয়াহাবী আন্দোলন। এই আন্দোলন ছিল সর্বতোভাবে ইস্‌লামিক ধর্মীয় আন্দোলন এবং শুধু যে ভারতের সীমার মধ্যেই এই আন্দোলন নিবদ্ধ ছিল এমন নয়, বিভিন্ন ইস্‌লামিক দেশেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের চরিত্র ছিল পুরোপুরি 'প্যান-ইস্‌লামিক্' (Pan-Islamic)। ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অধীন রায়বেরিলির অধিবাসী সৈয়দ আহম্মদ ব্রেল্‌ভি। ১৮২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কায় যান ও সেখানে গিয়ে ওয়াহাবী মতবাদে দীক্ষিত হন। কিন্তু পূর্বোক্ত মতবাদ মক্কাসরিফের কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত ছিল না। তাঁরা সৈয়দ আহম্মদকে মক্কাসরিফ থেকে বহিষ্কৃত করেন।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের বিবরণ

ওয়াহাবী মতবাদ অনুসারে যারা মুসলমান নয়—অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান প্রভৃতি—তারা সকলেই 'দার্-উল-হাবাব্' (ঈশ্বরের শত্রু)। তাদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ্' (ধর্মযুদ্ধ) প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। ভারতবর্ষে ফিরে এসে সৈয়দ আহম্মদ ব্রেল্‌ভি নিজেকে 'ইমাম' (ধর্মগুরু) বলে ঘোষণা করেন।

সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি সম্পর্কে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন ঃ

"He became the centre of *zehad* against the Shikhs of the Punjab, who it is said ill-treated the mussalmans, prevented them from fulfilling their religious obligations and desecrated their places of worship. He therefore declared their state as *Dar-ul-Harb* and decided to lead *zehad* against them."[১৩]

পেশোয়ারের সন্নিহিত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সৈয়দ আহম্মদ ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তৎকালীন ইংরেজ সরকার এই যুদ্ধের সংবাদ অবগত হয়েও প্রথমদিকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন। বহুতর নরহত্যার পরে ওয়াহাবীরা

পেশোয়ার অধিকার করে এবং কোয়ায়েৎ উপত্যকার অন্তর্বর্তী সিত্তানা নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ওয়াহাবী রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়। এ সম্বন্ধে উইলিয়াম হাণ্টারের বর্ণনা ঃ

"They (the Wahabis) perpatrated endless depradations and massacres upon their Hindu neighbours before we annexed the Punjab, annually recruiting to their camp Mahommadan zealots from the British districts. We took no precaution to prevent our subjects flocking to a fanatical colony which spent its fury on the Sikhs. ... Upon our annexation of the Punjab, the fanatic fury which had formerly spent itself upon the Sikhs were transferred to their successors. Hindus and Christians were alike infidels in the eyes of the *Sittana* host and as such, were to be exterminated by the sword. The disorders which we had connived at, or at least, viewed with indifference upon the frontier, now descended as a bitter inheritence to ourselves. Their followers were preaching sedition in different parts of the country, so far apart as Rajshahi in Bengal and Patna in Bihar and the Punjab frontier."[১৪]

পাটনায় বিলায়েৎ আলি ও এনায়েৎ আলি নামে দুই ভ্রাতা বিহারী মুসলমানগণকে সিত্তানার ইস্লামিক রাজ্যে গমনের প্ররোচনা দান করে এক 'হিজ্‌রাত' আন্দোলন গড়ে তোলেন।

ওয়াহাবী বিদ্রোহ সম্পর্কে, বিশিষ্ট মুসলিম জননায়ক স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ কর্তৃক উর্দুভাষায় লিখিত একটি রচনার অংশবিশেষের অনুবাদ উদ্ধৃত করে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন ঃ

"In those days, Mahommadans used publicly to ask the masses to carry on *zehad* against the Sikhs. Thousands of armed Mussalmans and a large incalculable store of war materials were collected for *zehad* against the Sikhs. ....But the British Government in those days, heartily desired that the power of the Sikhs should be diminished. In the result Sayed Ahmed [Brelvi] led an army through Sind and the Bolan Pass into Afghanistan and then attacked the Punjab through the Khyber Pass in 1824 and continued his war with varying success, until he captured Peshawar in 1830. Sultan Mahammed Khan who was the Governor on behalf of the Sikhs swore allegience to him and was allowed to continue in his post. Moulvi MozaharAli was appointed *Quazi*. He thus succeeded in securing religious freedom for the people of the Frontier tract. But there were old feuds between Sultan Mahammed Khan and Quazi Mozahar Ali. After Sayed Ahmed had left Peshawar, Sultan Mahammed murdered Quazi in open *darbar*. In conspiracy with local leaders, he also got persons who had been appointed collectors by Sayed Sahib. murdered. This upset Sayed Sahib so that he left Frontier towards the end of

1830 and was ultimately killed in battle in 1831 at the age of 45."[১৫]

এক বছরের মধ্যেই সিত্তানার ইস্‌লামিক বাদশাহীর পতন ঘটে ও সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু তারপরও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ওয়াহাবীদের বিদ্রোহমূলক অভিযান চলতে থাকে এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবীরা সিত্তানা পুনর্দখল করে। এতদিনে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং তখন থেকে ওয়াহাবীদের লক্ষ্য হয় পাঞ্জাব ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করে সেখানে ইস্‌লামিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করা। বহুতর সঙ্ঘর্ষের পর ওয়াহাবীরা পর্যুদস্ত হয় ও ভারতসম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অনেক ওয়াহাবী বিদ্রোহী প্রাণদন্ড ও দীর্ঘমেয়াদী কারাদন্ডে দন্ডিত হয়।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের এই পর্যায়ে 'জেহাদ্' পরিচালিত হয় খ্রিস্টান শাসনের উচ্ছেদপূর্বক ইস্‌লামিক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন ঃ

"Among their teaching about social and religious reforms, the Wahabis also preached the great doctrine of *zehad.* India having come under the Christians, became *Dar-ul-habab* against whom *zehad* was obligatory. Throughout the literature of the sect, this obligation shines forth as the first duty of regenerated man."[১৬]

বঙ্গদেশে তিতুমীরের বিদ্রোহ এবং ফারাজী আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলনেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিতুমীর একজন সঙ্গতিপন্ন মুসলমান ছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 'মীর' পদবী আভিজাত্যের চিহ্নবাহী। তিতুমীর 'হজ' করবার জন্য মক্কায় যান। সেকালে মক্কাসরিফে গিয়ে হজ্ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল এবং কেবলমাত্র অর্থশালী ব্যক্তিরাই 'হাজী' হওয়ার সুযোগ পেতেন। মক্কাসরিফে অবস্থানকালে তিনি ওয়াহাবী মতবাদে দীক্ষিত হন এবং দেশে ফিরে এসে ওয়াহাবী মতবাদ প্রচারের একটি দল গঠন করেন। সাধারণ মুসলমানদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে তিতুমীর অলৌকিক শক্তির অধিকারী। মিস্কিন্ শাহ নামক এক ফকির দলে যোগদান করায় তাঁর প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ওয়াহাবীরা জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা করবার চেষ্টা করত। ঐ সময়ে জমিদারদের ক্ষমতা ছিল অনিয়ন্ত্রিত। প্রজার স্বার্থরক্ষা করবার জন্য আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি ১৭৯৩ সালের পার্মানেন্ট সেটেল্‌মেন্ট রেগুলেশনের মধ্যে ছিল কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পরেও পঁয়ষট্টি বৎসর যাবৎ ইংরেজ শাসকগণ প্রজার স্বার্থরক্ষা বিষয়ক কোন আইন প্রণয়নে মনোযোগী হন নাই। প্রথম রেণ্ট অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তার ফলে তিতুমীরের সময়ে জমিদারেরা জমির খাজনা ইচ্ছামত বৃদ্ধি করতে পারতেন এবং প্রজার উপরে ভূমিরাজস্ব ছাড়াও নানা অতিরিক্ত কর আরোপ করতে পারতেন। নারিকেলবাড়িয়ার নিকটবর্তী পুঁড়া গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তাঁর মুসলমান প্রজাদের উপর 'জিজিয়া' করের অনুকরণে 'দাড়ির খাজনা' নামে এক অতিরিক্ত কর আরোপ করেন। দাড়ি রাখলেই তাদের মাথা পিছু বার্ষিক আড়াই টাকা হিসাবে অতিরিক্ত কর দিতে হবে। কৃষ্ণদেব রায়ের এই কার্য যে নিন্দনীয় এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত ছিল এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। ওয়াহাবীদের পক্ষে দাড়ি রাখা ছিল 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য)। সুতরাং তিতুমীর কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে

তিতুমীরের বিদ্রোহ

বিদ্রোহের জন্য গ্রামীণ মুসলমান প্রজাগণকে উত্তেজিত করতে থাকেন। তিতুমীর নিজের দলবল নিয়ে কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ি আক্রমণ করেন কিন্তু কৃষ্ণদেব সে আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হন।[১৭]

এর পর ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর নিজেকে 'বাদশাহ' বলে ঘোষণা করেন। বাদশাহীর এলাকাভুক্ত ছিল দশ ক্রোশ পরিমাণ এলাকার মধ্যে অবস্থিত কয়েকটি গ্রাম। নারিকেলবাড়িয়া তার রাজধানী। তাঁর ভাগিনেয় মাসুম খাঁ তাঁর সেনাপতি। হিন্দু জমিদারদের প্রজাবর্গের নিকট থেকে তিনি কর আদায় করতে থাকেন। তিনি টাকী ও গোবরডাঙ্গার জমিদারদের কাছে কর দাবি করেন—অবশ্য জমিদারেরা সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। গ্রাম থেকে বহুতর বাঁশ কেটে বাঁশের গায়ে যাতে আর একটা বাঁশ সংলগ্ন থাকে এইভাবে বাঁশের প্রাচীর দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘিরে নিয়ে তিনি তাঁর কেল্লা বা দুর্গ প্রস্তুত করেন। অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণ কাঁচা বেল কেল্লার মধ্যে মজুদ্ করা হয়। তিতুমীরকে দমন করতে এসে সরকারি বাহিনী কয়েকবার পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। তিতুমীরের সাথে এক সংঘর্ষে গোবরডাঙ্গার জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হন। পরে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্কের আদেশে জনৈক ইংরেজ কর্নেলের নেতৃত্বে কামান সহকারে এক সৈন্যবাহিনী তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। প্রথম নিক্ষিপ্ত গোলাটি কেল্লার প্রাচীরের একটু দূরে পড়ে। তিতুমীর তাঁর কেল্লার মধ্যস্থিত অনুগতদের বলেন, 'উ গোলা হাম্ খা ডালা'। অনুগতেরা বিশ্বাস করত তিতুমীর আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। প্রথম গোলাটি ঐভাবে ব্যর্থ হওয়ায় কেল্লার মধ্য থেকে খুব জয়ধ্বনি উঠতে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় গোলা নিক্ষিপ্ত হলে তিতুমীর সেই গোলায় নিহত হন ও আগুন লেগে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়। কেল্লার পতন হলে কেল্লার মধ্যে অবস্থানকারী ৩৪০ জন ওয়াহাবী 'সৈন্য' গ্রেপ্তার হয়, ১৪০ জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হন ও তিতুমীরের ভাগিনেয় ও 'সেনাপতি' মাসুমের ফাঁসী হয়। ক্ষুদ্র কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত তিতুমীরের ইস্‌লামিক বাদশাহীর আয়ুস্কাল ছিল সর্বসাকুল্যে বছর খানেক। এই এক বছরে তিতুমীরের অনুরাগীরা সন্নিহিত অঞ্চলে বহু লুঠতরাজ করে।

ফরাজী বা ফারাজী আন্দোলন

'ফরাজী' বা 'ফারাজ' আন্দোলনও ছিল ওয়াহাবী আন্দোলনেরই একটি শাখা। এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন হাজী শরিয়ৎউল্লা। তিনিও মক্কায় 'হজ' করতে গিয়ে সেখান থেকে ওয়াহাবী মতবাদে দীক্ষিত হয়ে আসেন। প্রকৃতপক্ষে হাজী শরিয়ৎউল্লার পুত্র পীর দুদু মিঞাই এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলেন। (এই দুদু মিঞা ছিলেন নন্-কো-অপারেশন যুগের বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী পীর বাদ্শা মিঞার পিতামহ)। পীর দুদু মিঞার কর্মক্ষেত্র ছিল ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার অংশবিশেষ।

'ফরজ্' শব্দ থেকে 'ফরাজী' বা 'ফারাজী' শব্দ এসেছে। ইস্‌লামধর্মে যা অবশ্য করণীয় সেই সকল কাজই সমস্ত ইস্‌লামধর্মাবলম্বীর পক্ষে 'ফরজ্'। মূলতঃ ধর্মীয় আন্দোলন হলেও কিছু অর্থনৈতিক চিন্তাধারাও পীর দুদু মিঞা এই অন্দোলনের সাথে যুক্ত করেছিলেন। ফারাজীদের মতে—জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ন্যায়বিরোধী। 'বাদশাহ' ভূমিকর দাবি করতে পারেন। কিন্তু জমিদার কোন কর দাবি করতে পারেন না। ইস্‌লাম ধর্মের নীতি অনুসারে বিজিত

দেশের—অধিবাসীদের এবং কাফিরদের সকল ভূসম্পত্তির একমাত্র মালিক বাদশাহ্। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেছেন ঃ

"According to the law of Islam, the lands of the conquered people and of the infidels, belong to the Muslim conqueror : hence the land of the conquered people of India belonged to the Muslim ruler. As such, we see that he was appointing his agents subsequently known as *Zamindars* to collect revenue from the subjects."[১৮]

জমিদারী প্রথাও মুসলমান আমলের সৃষ্টি কিন্তু মুসলিম শাসকদের আমলে জমিদারগণ ভূমির 'মালিক' বলে স্বীকৃত হতেন না। তখন জমিদারেরা ছিলেন বাদশাহ্ বা বাদশাহের প্রতিনিধি কর্তৃক নিযুক্ত চুক্তিবদ্ধ রাজস্ব-সংগ্রাহক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই জমিদারগণ ভূমির মালিকের পর্যায়ে উন্নীত হন। ওয়াহাবীরা ইস্‌লামি মতানুসারে জমিদারের মালিকানাস্বত্বের বিরোধী ছিলেন। ইস্‌লামি মতানুসারে বাদ্‌শাহই একমাত্র মালিক। ফারাজী আন্দোলনের জমিদার বিরোধী ও নীলকর সাহেবদের বিরোধী কর্মসূচী ছিল বলে স্বাভাবিক ভাবেই এই আন্দোলন বহু মুসলমান কৃষককে আকৃষ্ট করে। ফারাজী আন্দোলন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে খুব প্রবল হয়। প্রধানত নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে ও স্থানীয় কিছু জমিদারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়—যদিও ঘোষিত লক্ষ্য ছিল—ইস্‌লামিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠা। ভারতকোষ নামক কোষ গ্রন্থে বিনয় চৌধুরী ও অমলেন্দু দে মন্তব্য করেছেন ঃ

"ফেরাজীদের ধর্মীয় গোঁড়ামি অর্থনৈতিক আন্দোলনকে যথেষ্ট দুর্বল করিয়াছিল। ভিন্নমত সম্পর্কে ফেরাজীরা ছিল বিশেষভাবে অসহিষ্ণু; বলপ্রয়োগ ও অন্যান্য বহু পীড়নমূলক উপায়ে তাহারা নিজেদের মতবাদ প্রচার করিত। সাধারণ মুসলমান কৃষক ধর্মবিশ্বাসের আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে সহজে গ্রহণ করে নাই। নূতন আন্দোলনে আতঙ্কিত জমিদারগণ বিভিন্নভাবে কৃষকদের ফেরাজী প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিত। বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য সাধারণ হিন্দু কৃষকও ফেরাজীদের প্রীতির চক্ষে দেখিত না। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ১৫০০ সাধারণ মানুষ ফেরাজীদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়।"[১৯]

পূর্বোক্ত তিনটি বিদ্রোহ বা আন্দোলন মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই সব বিদ্রোহে ইংরেজ শাসকশক্তি উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল—একথা সত্য। কিন্তু যে কোন ব্রিটিশ-বিরোধী কর্ম-তৎপরতাকেই 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। কোন জনগোষ্ঠী যদি ভারতবর্ষে হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করে তাকেও যেমন আমরা 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের' অংশ বলে স্বীকৃতি দিতে পারি না, তেমনি ইস্‌লামের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইস্‌লামিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকেও আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ বলে স্বীকার করে নিতে পারি না। ভারত হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্সী প্রভৃতি ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়ের দেশ। যে সংগ্রামের লক্ষ্য এর মধ্যে কোন এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হস্তে রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত করা, তাকে কি করে ভারতবাসীর মুক্তি-সংগ্রাম বলে স্বীকার করে নেওয়া যাবে? 'ভারতের

ওয়াহাবী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, ফারাজী বিদ্রোহ, এর কোনটাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল না। এবং এগুলিকে কৃষক-সংগ্রাম বলেও চিহ্নিত করা যায় না।

স্বাধীনতা' ওয়াহাবী আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল না। রাজনৈতিক বিচারে এই আন্দোলন ছিল সঙ্কীর্ণতাবাদী, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রাদায়িকতার দ্বারা দূষিত একটি উগ্রপন্থী কর্মতৎপরতা। তিতুমীরের বিদ্রোহ ছিল একটি উগ্রধর্মীয় চেতনাজাত বালকসুলভ দুঃসাহপ্রবণতা (Childish adventurism)—এবং তার কর্মতৎপরতা একটি অতি ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

পূর্বোক্ত বিদ্রোহ বা আন্দোলনগুলিকে 'কৃষক সংগ্রাম' বা 'শ্রেণীসংগ্রাম' বলেও চিহ্নিত করা যায় না। 'কৃষক' একটা অর্থনৈতিক শ্রেণী। মার্ক্সীয় বিচারে—সাম্প্রদায়িকতাবাদী চেতনার ছত্রছায়াতলে কোন শ্রেণীসংগ্রামের কথা কল্পনা করা যায় না। সাম্প্রদায়িকতাবাদী চেতনা, মার্ক্সীয় ব্যাখ্যানুসারী শ্রেণীচেতনা—এ দুটি পরস্পর বিপরীত মুখী—একটি অপরটির ক্ষয়কারক। সুতরাং এই দ্বিবিধ চেতনার সহাবস্থান সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের কৃষকশ্রেণীর মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, দেশীয় খ্রিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসযুক্ত মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। ইস্লামিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ধর্মীয় চেতনাকে প্রাধান্য দান করে 'কৃষকশ্রেণীর' শ্রেণীগত ঐক্য নষ্ট করে ঐ শ্রেণীকে ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত করে ফেলে। শুধু কিছু কৃষক-স্বার্থের বুলি থাকলেই ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতাবোধযুক্ত আন্দোলন শ্রেণীসংগ্রামে রূপান্তরিত হয় না। শ্রেণীচেতনা হল সাম্প্রদায়িকতাবাদী কলুষিত চেতনার—উৎকৃষ্টতম প্রতিষেধক। রোগ ও ঔষধ একত্র হয়ে পরস্পরকে পুষ্ট করবে—এরূপ চিন্তা হাস্যকর। কাঁচা তেঁতুলের রসের সাথে কুইনাইন মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ালে কুইনাইনের রোগপ্রশমনক্ষমতা নষ্ট হয়। সেই প্রকার, সাম্প্রদায়িকতাবাদের তেঁতুলগোলা শ্রেণীবোধের কুইনাইনের সাথে মিশিয়ে দিলে শ্রেণীবোধ নষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক কোন কোন লেখক অত্যুৎসাহবশত মার্ক্সীয় পদ্ধতিসম্মত বিচার বিবেচনা না করে পূর্বোক্ত 'হাঙ্গামা'-গুলিকে 'কৃষকসংগ্রাম' রূপে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে ইংরেজদের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গী বৈরিতামূলক

মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে ইংরেজদের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গী সৌহার্দ্যমূলক ছিল না। তাঁরা তাঁদের দ্বারা সদ্যক্ষমতাচ্যুত মুসলমানগণকে বিশ্বাস করতে পারেন নি, এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়ার ফলে হিন্দুদের একাংশকে সিংহাসনের রক্ষকরূপে দলে টানতে সচেষ্ট ছিলেন। ওয়াহাবীদের কর্মতৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসকেরা হিন্দুদেরকে কোলে টানার নীতিকেই আরও বেশী করে কার্য্যকরী করবার কথাই চিন্তা করেছিলেন। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে লর্ড এলেনবোরা কর্তৃক লিখিত এক পত্রের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন ঃ

"The attitude of the British government had been more hostile to the Mahommadans from whom they had conquered a great part of the country. Lord Ellenborough had written in 1848 : 'It seems to me most unwise when we are sore of the hostility of one tenth, not to secure the enthusiastic support of the nineteenth who are faithful. I can not close my eyes to the belief that the race [i.e. Maslims] is fundamentally hostile to us, and therefore, our true policy is to conciliate the Hindus."[২০]

সিপাহীবিদ্রোহের প্রচন্ড আঘাত এবং তার অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী জাগৃতি হিন্দু শিক্ষিত সমাজের প্রতি ইংরেজদের বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল করতে থাকে। জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে, সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে ভারতীয়দের কণ্ঠ পরাধীনতার বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান রূপে সোচ্চার হতে থাকে। যে ইংরেজভক্ত উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দু নেতারা কংগ্রেসের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের পোষাক দাবিদাওয়া উত্থাপন করেছিলেন, ইংরেজরা শুধু তাঁদের উপরে বিশ্বাস ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিলেন না। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দুসমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইঙ্গীকৃত উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের হস্তচ্যুত হবে এবং উদীয়মান চরমপন্থী দল রাজনৈতিক আসর দখল করবে। অতএব ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের জন্য নূতন পথের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই নূতন পথের সন্ধান করতে গিয়েই—যে মুসলমান সম্প্রদায়কে ইংরেজরা প্রথমদিকে সতর্কতার সাথে দূরে ঠেলে রেখেছিলেন তাঁদের দিকেই ইংরেজদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তাঁরা দেখলেন হিন্দুরা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এদিকে ইংরেজী শিক্ষার দিকে হিন্দুরা সর্বাগ্রে এবং আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার ফলে যে সকল প্রশাসনিক উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা যেতে পারে তার শতকরা নব্বইভাগ হিন্দুরা দখল করে ফেলেছে। এ জন্য মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর মনে স্বাভাবিক ভাবেই ঈর্ষা জেগেছে। তাছাড়া হিন্দুয়ানীর রঙে রঞ্জিত নবীন জাতীয়তাবাদ মুসলমান অভিজাতগণকে আতঙ্কিত ও অসন্তুষ্ট করে তুলেছে। ভারতীয় মুসলিম মানসের আর একটি বৈশিষ্ট্যও ইংরেজরা লক্ষ্য করেছিলেন। হিন্দুদের বাসভূমি এবং ধর্মভূমি উভয়ই ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতবাসী মুসলমানদের ধর্মভূমি ভারতের বাইরের ইস্‌লামিক দেশগুলি। মুসলিম মানসে ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ যতটা দৃঢ়সম্বন্ধ, স্বাদেশিকতার প্রতি অনুরাগ ততটা গভীর নয়। অনেক মুসলমানই আরব, ইরাণ, তুর্কিস্তান ও আফগানিস্তানকে 'স্বদেশ' বলে মনে করেন। অনেক মুসলমান নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা আগে মুসলমান পরে ভারতবাসী (a muslim first and thereafter Indian), ভারতবর্ষে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা মুসলিম মানসে সতত বর্তমান থাকে। হিন্দুদের সম্ভাব্য অবিচার ও উৎপীড়নের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় ইংরেজরা অবতীর্ণ হতে পারেন এবং সুযোগ সুবিধার সতর্ক পরিবেশনার দ্বারা মুসলমানগণের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বিদূরিত করে সহজেই তাদের আনুগত্য অর্জন করতে পারেন। সিংহাসনের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের জন্য ভারতীয় জাতিকে বিভক্তকরণের আবশ্যকতা ইংরেজরা তাঁদের সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা-যুগ থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়া কাউন্সিল সম্পর্কিত আইনের খস্‌ড়া (Bill) নিয়ে যখন পার্লামেন্টে বিতর্ক চলছিল তখন ঐ বিতর্কে অংশগ্রহণ করে স্যার চার্লস্‌ উড্‌ বলেন ঃ "We have to legislate for different races with different languages, religions, manners and customs and establish for all time an alibi for continuance of British control."[১১] রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে 'ভেদনীতি'

জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে ও সভা-সমিতিতে ভারতীয়গণের কণ্ঠ পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় ইংরেজদের মস্তিষ্কে নূতন চিন্তার উদয় হয়।

যে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার সে কথা ইংরেজরা ভালভাবেই জানতেন। যেকালে ইংরেজরা ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন তার আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের (এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর) প্রাচীনতম আইনগ্রন্থ প্রণেতা মনু শত্রুভাবাপন্নদের প্রতি রাজব্যবহারের চারটি মূলনীতি নির্দেশ করে গিয়েছেন। মনুর মতে এই চারটি নীতি হল—সাম (appeasement), দান (bribing), ভেদ (dividing the enemy's ranks) ও দন্ড (subjugation by force)। ইংরেজরা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের জন্য এই চারটি নীতিরই অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন। প্রথমে প্রচুর সংখ্যক ভারতবাসীর খ্রিস্টানীকরণের মাধ্যমে ভারতীয় জাতিকে বিভক্তকরণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তার দ্বারা আশানুরূপ ফল অর্জিত না হওয়ায় ইংরেজরা 'সাংস্কৃতিক বিজয়ের' নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতির মর্ম হল শিক্ষিত হিন্দুদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটানো এবং 'সাম' ও 'দান' নীতির প্রয়োগপূর্বক দক্ষিণহস্ত দ্বারা তাদের কোলে টেনে নেওয়া ও বামহস্তের দ্বারা মুসলমানগণকে দূরে ঠেলে রাখা। উনিশ শকতের শেষ থেকেই ইংরেজরা অনুভব করলেন যে সাংস্কৃতিক বিজয়ের নীতির দ্বারা যতটুকু বাঞ্ছিত ফল অর্জন করা সম্ভব ছিল তা হয়ে গিয়েছে। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী জাগৃতিকে রুখবার পক্ষে ইঙ্গীকৃত ভারতবাসিদের ইংরেজানুগত্য বিশেষ কোন কাজে আসবে না। অতএব তাঁরা নূতন যে নীতিপরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হলেন সেটা হল গোটা মুসলমান সম্প্রদায়কে কোলে টেনে নিয়ে জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃজনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা এবং এই উপায়ে ভারতীয় জাতির বিভক্তকরণ। সোজাসুজি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতীয় জাতির বিভক্তকরণ (Dividing the Indians communitywise)। ইংরেজরা আরও জানতেন যে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধের বন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ়। সুতরাং ধর্মভেদের ভিত্তিতে ভারতবাসীগণের বিভক্তকরণ খুব বেশী আয়াসসাধ্য হবে না।

স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের উপদেশ ব্রিটিশনীতির মোড় ফেরানোর ইঙ্গিত

ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে স্যার উইলিয়াম হাণ্টার তাঁর স্বজাতীয়গণের প্রতি আহ্বান জানালেন মুসলিম জাতির প্রতি ন্যায়পরায়ণ হওয়ার জন্য। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *Indian Mussalmans* পুস্তকে হাণ্টার সাহেব লিখলেন ঃ

"The English Government can hold no parley with the traitors-in arms. Those who appeal to the sword, must perish by the sword. But while firm towards disaffection, we are bound to see that no just cause exists for discontent. This, however, it can do only by removing the chronic sense of wrong which has grown into the hearts of the Mahommadans under the British rule."[২২]

অতপর হাণ্টার সাহেব ব্রিটিশ শাসনের আমলে কিভাবে ভারতীয় মুসলমানগণকে ক্ষমতা ও যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, কিভাবে তাদেরকে দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব অনুদান প্রচলিত ছিল তা কেমন করে ইংরেজদের হাতে পড়ে নষ্ট হয়েছে, ইত্যাদির এক আকর্ষণীয় বর্ণনা দিলেন তাঁর পুস্তকে।

হাণ্টার সাহেবের নিম্নলিখিত উপদেশ খুব তাৎপর্যপূর্ণ :

"We should thus have the Mahommadan youth educated in its own plan without interfering in any way with their religion, and in the very process of enabling them to learn their religious duties, we should render their religion perhaps not less sincere,but less fanatic. The rising generation of the Mahommadans would tread the steps which have conducted the Hindus long ago, the most bigotted nation on the earth, into their present state of easy tolerence."[২৩]

হাণ্টারের এই উক্তির মধ্যে মুসলমান যুবকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আপাত-নির্দোষ আগ্রহের অন্তরালে এক নূতন সাম্রাজ্যবাদী দূরভিসন্ধির বক্রদৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার করা হয়েছিল শিক্ষিত হিন্দুগণের ইঙ্গীকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। এতে প্রথম দিকে ইংরেজরা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেও কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজীশিক্ষার দ্রুত বিস্তার এমন ফলও প্রসব করলো যা ছিল ইংরেজদের কাছে নিতান্ত অবাঞ্ছিত। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে নব্যশিক্ষিতদের মানসে প্রথমদিকে ইংরেজের প্রতি আনুগত্যে অভিষিক্ত হল বটে, কিন্তু সাথে সাথে শিক্ষিত মানসে এনে দিল আধুনিকতার জোয়ার এবং উন্মেষশীল পুঁজিবাদের গর্ভজাত গণতান্ত্রিক চেতনা যা ঐ নব্যশিক্ষিতদেরই একাংশের মানসে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-কামনাকে তীব্রতর করে তুললো। সুতরাং হাণ্টার তাঁর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির মধ্য দিয়ে মুসলমান যুবকদের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন তার মধ্যে শিক্ষিত মুসলমানদের মনে প্রাচীনপন্থী ও আধুনিকতাবিরোধী ধ্যান ধারণাকে সযত্নে লালন করবার ও মুসলিম মানসকে আধুনিকতার স্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার এক অশুভ প্রয়াস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হাণ্টারের উক্তির মধ্য দিয়ে মুসলমান জাতি সম্পর্কে ইংরেজদের যে নূতন বাৎসল্যনীতির আভাস ফুটে উঠেছে তার সারমর্ম হল—শুধু মুসলমানগণকে 'কোলে-টানা' নয়—তাদেরকে আধুনিকতার সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা—তারা যাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের মত-চিরকাল ইংরেজদের-অঙ্কলগ্ন হয়ে থাকে, সামাজিক চিন্তার দিক দিয়ে প্রাচীনপন্থী ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকে, আধুনিকতার আলোক তাদের অন্তরে প্রবেশ না করে, ইংরেজের অভিভাবকত্ব চিরদিনের জন্য তারা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করে—সেই ভাবে মুসলিম শিক্ষানীতির রূপায়ণ। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনা শুধু যে ভারতীয় জাতির পক্ষে ক্ষতিকর ছিল তাই নয়, সমাজবোধের ব্যাপারে এর মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের চিরন্তন নাবালকত্ব কায়েম করবার চক্রান্ত লুক্কায়িত ছিল। হাণ্টার হিন্দুদের-সম্পর্কে "The most bigotted nation on the earth" বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁর হিন্দুবিদ্বেষের সাক্ষ্য বহন করে। মুসলমান সম্প্রদায় সাধারণভাবে ইংরেজী শিক্ষার আঙ্গিনা থেকে, নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলেও উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজভুক্ত কতক ব্যক্তি ইংরেজী শিক্ষার আশীর্বাদধন্য হয়ে যেভাবে নূতন আভিজাত্যের অধিকারী হতে লাগলেন তা দেখে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত

সাম্প্রদায়িক রাজ-নীতির ভিত্তি বনন সৈয়দ আমীর আলী ও স্যার সৈয়দ আহম্মদের প্রয়াস

মুসলমান সম্প্রদায়ের এক ক্ষুদ্র অংশ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজীশিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন সৈয়দ আমীর আলি ও অপরজন সৈয়দ আহম্মদ খাঁ। এঁরা উভয়েই অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। আমীর আলির জন্ম হয় চুঁচুড়ার এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে। তিনি বিলাত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে আসেন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি। নানা উচ্চপদ লাভ করে শেষ জীবনে তিনি বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটীর সভ্যপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলি ছিলেন প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দুদের মতই কায়মনোবাক্যে ইংরেজভক্ত ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধ সমর্থক। কিন্তু ইঙ্গীকৃত হিন্দুদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কোন মস্তিষ্কপীড়া ছিল না। আমীর আলি ছিলেন নৈষ্ঠিক ইস্‌লামপন্থী—এবং 'জাতি' বলতে 'মুসলিমজাতি' ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না। তাঁর সম্পর্কে লিওনার্ড গর্ডন মন্তব্য করেছেন ঃ

"Like the first generation of Congressmen. Ameer Ali remained a conscious loyalist throughout his life. He was devoted to the Muslim community, but he was also devoted to the interests of the British Empire. He identified himself with what he called the 'forces of order' during the *Swadeshi* period and wanted a firmer government hand to be applied to troublemakers....he lavished praise upon Lord Curzon and when the Muslim League became critical of the government. Ali resigned."[২৪]

সৈয়দ আমীর আলি মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে National Mahommadan Association নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। পরে Central National Mahommadan Association নাম দিয়ে এই সংস্থাকে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়া হয়। সম্ভবত মুসলমানগণের সর্বপ্রথম সম্প্রদায়ভিত্তিক সঙ্ঘ ছিল। সৈয়দ আমীর আলির ধারণা এই প্রকার ছিল যে তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের সূচনা হয় ভারতে মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে—তার পূর্বে ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস ছিল না![২৫] তাঁর ধারণা ছিল ঃ "Afghans, and then the Mughals were bringers of order and culture to a backward. idolatrous and divided land."[২৬]

হিন্দু সম্প্রদায় ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলি নানা অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন। তাঁর মতে "Hinduism was divisive, pervasive and conservative"[২৭] এবং "He dismissed Hinduism as a combination of mysticism, pantheism and fetishism run riot."[২৮] ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকবর্গকে তিনি পিতৃস্থানীয় মনে করতেন। "He called upon the British officials to take action which would benefit the Muslims. The father had a responsibility to help the lagging child."[২৯] আমীর আলি হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে দুই জাতি বলে মনে করতেন। "All argues that Hindus and Muslims were always two communities or nations. He uses these terms

interchangably...,"[৩০] কিন্তু তিনি কখনও দুই জাতির জন্য দুই পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের কল্পনা করেননি, কারণ উভয় জাতির পক্ষেই সুদীর্ঘকালব্যাপী ইংরেজের অভিভাবকত্ব তিনি অপরিহার্য বলে মনে করতেন। তিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রথা সমর্থন করতেন। "He claimed credit for swinging Morley arround to acceptance of seperate electorates."[৩১]

ইংরেজরা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে ধরনের শিক্ষিত মুসলমান তৈয়ারীর পরিকল্পনা করেছিলেন, সৈয়াদ আমীর ছিলেন তার একটি অবিকল প্রোটোটাইপ। তাঁর সমসাময়িক ইঙ্গীকৃত ন্যাশনালিস্ট নেতা ডব্লিউ. সি. বোনারজি (W. C. Bonerji)-র মত তিনিও ইংলন্ডের মাটিতে দেহরক্ষা করেন। উভয়েই ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। উভয়েই ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ— যদিও এঁদের দুজনের পথ ছিল স্বতন্ত্র। একজন ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব দাবি করে ভারতবাসী উচ্চমধ্যবিত্তদের শ্রেণীস্বার্থের পোষকতায় কাজ করেছেন। অপর জন মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সেজে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থের পোষকতায় কাজ করেছেন।

স্যার সৈয়দ আহম্মদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দিল্লীর অধিবাসী (এঁরা আফগানিস্তানের হিরাট থেকে এসে দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন)। সৈয়দ আহম্মদের মাতামহ শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের পিতা সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ কৈশোর কাল থেকেই হৃত গৌরব মুগল সাম্রাজ্যের শেষ দুই অধীশ্বরের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আরবি ও ফার্সী ভাষায় কিছুটা লেখাপড়া শিখেই তিনি তখনকার ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সেরেস্তাদারের চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তিনি আপন চেষ্টায় নিজের শিক্ষাকেও উন্নত করেন এবং আপন যোগ্যতার বলে মুন্সেফ হন। তিনি যখন সংযুক্ত প্রদেশের বিজনৌরে মুন্সেফ পদে অধিষ্ঠিত সেই সময়ে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ঘটে। মহাবিদ্রোহের সময়ে জীবন রক্ষার্থে তিনি মীরাটের ক্যান্টনমেন্টে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে ইংরেজগণকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন। এই সাহায্যের পুরস্কার হিসাবে ইংরেজ সরকার তাঁকে মাসিক দুইশত টাকার বিশেষ পেন্‌সন মঞ্জুর করেন, এবং আদেশ দেন যে ঐ পেন্‌সন স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পরেও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আজীবন ভোগ করতে পারবেন। তাছাড়া তাঁকে তরবারি, পোষাক ও মুক্তার মালা উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের আজীবন অক্লান্ত প্রয়াস স্যার সৈয়দের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। কিন্তু খ্রিস্টান ইংরেজদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার দরুণ মুসলিমসমাজ বিক্ষুব্ধ হয় এবং তাকে 'বিধর্মী' বলে ঘোষণা করে মক্কা থেকে ফতোয়া আসে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলিগড়ে 'মোহামেডান্ অ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ' নাম দিয়ে একটি কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী কালে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি গঠিত হয়। সামান্য সেরেস্তাদার হিসাবে চাকুরীজীবন শুরু করে তিনি জেলাজজ হয়ে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যপদে নিযুক্ত হন।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে স্যার সৈয়দ আহম্মদ প্রথম থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন

না। তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে 'একজাতি' (one nation) বলে মনে করতেন এবং আরও মনে করতেন যে সমগ্র ভারতীয় জাতির নামই 'হিন্দুজাতি'। তিনি বলতেন, 'হিন্দু' শব্দের দ্বারা কোন বিশেষ ধর্ম বুঝায় না। 'হিন্দু' ও 'ভারতবাসী' এই শব্দ দুইটি সমার্থক।

কিন্তু কিভাবে তিনি পরবর্তীকালে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীতে রূপান্তরিত হলেন তার রহস্য সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে তাঁর এই মঞ্চবদলের পশ্চাতে যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর হাত ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আলিগড় এম. এ. ও. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আলিগড়ই মুসলিম রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এই কলেজে প্রায়শই শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হত। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মিঃ বেক্ (Mr. Beck) নামে এক ব্যক্তি অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন ঃ

"The British realised that to counteract the growing nationalism, the time had come to draw under their protecting wings the Muslims who had so far been lookd upon with disfavour. Mr Beck carried this policy through with missionary zeal. Mr.Beck assiduously tried to wean Sir Sayed away from nationalism, to transfer his political attachment from the British liberals to the Conservatives, and evoke in him an enthusiasm for a rapproachment between the Muslims and the Government. He was singularly successful in his object."[৩২]

মোহাম্যাডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে একটা *Institute Gezette* বা পত্রিকা প্রকাশিত হত—স্যার সৈয়দ ছিলেন তার সম্পাদক। মিঃ বেক কৌশলে এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিজের হাতে নিলেন কিন্তু সম্পাদক হিসাবে স্যার সৈয়দের নামই প্রকাশিত হতে লাগলো।

তখনও পর্যন্ত স্যার সৈয়দ ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীগণ ছিলেন পরস্পরের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন। স্যার সৈয়দ বাঙ্গালীদের দেশাত্মবোধ, শিক্ষাবিস্তারের ও সামাজিক সংস্কারে তাঁদের উৎসাহ, উদ্যম—এ সকলের প্রশংসা করতেন। বাঙ্গালীরাও স্যার সৈয়দের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন এবং নিজসম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রয়াসকে স-প্রশংস দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু এম. এ. ও. কলেজের গেজেটে বাঙ্গালীদের ও তাদের দ্বারা পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি নিন্দাসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো। প্রবন্ধগুলি সবই ছিল মিঃ বেকের লেখনীপ্রসূত। কিন্তু মিঃ বেক সেগুলি স্বলিখিত প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত করতেন না। এগুলি সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হত। বাঙ্গালী পাঠকেরা ওগুলিকে স্যার সৈয়দের লেখনীপ্রসূত বলে মনে করলেন এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক পার্শ্বপরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং বাংলা থেকে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাসমূহেও স্যার সৈয়দের প্রতি আক্রমণমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো। মিঃ বেক্ এটাই চেয়েছিলেন। কূটকৌশলের দ্বারা তিনি স্যার সৈয়দ ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যে সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল তাকে তিক্ত সম্পর্কে পরিণত করলেন। নিঃসন্দেহে, এ কাজ তিনি করেছিলেন ব্রিটিশ শাসকশক্তির এজেন্ট রূপে। কারণ, শাসককূলের দ্বারা পরিকল্পিত 'মুসলিম সম্পর্কিত নূতন নীতির' সফলতার জন্য স্যার সৈয়দের মত ব্যক্তিত্বকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির

মঞ্চের পুরোভাগে স্থাপনা করা ইংরেজদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন বসে মাদ্রাজে, ন্যাশনালিস্ট মুসলিম নেতা বদরুদ্দিন তায়েবজীর সভাপতিত্বে। ঠিক সেই সময়ে লখনৌতে 'মোহাম্যাডান্ এডুকেশন কংগ্রেস' নাম দিয়ে এক সমাবেশ আহুত হয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানগণের উদ্যোগে। এই সমাবেশেই স্যার সৈয়দ আহম্মদ সর্বপ্রথম জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করবার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রকাশ্য ভাষণ দান করেন।

অতঃপর স্যার সৈয়দ বিপুল উদ্যমে কংগ্রেসবিরোধী প্রচারকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। মিঃ বেকের প্ররোচনায় তিনি আলিগড় কলেজের শিক্ষকগণকে এই প্রচারকার্যে নিযুক্ত করেন, এই আলিগড়ই তখন থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে; এই প্রচার কার্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যম সুপরিকল্পিত রূপে সংযোগসূত্র রক্ষা করে অগ্রসর হতে লাগলো।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট ডাফরিণ নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য বিলাতে প্রেরণ করেন :

"To hand over power of the Government of India either partially or otherwise to such a body [i.e. the Congress] would simply be placing millions of men under dozens of nationalists and hundreds of most stupendous interests under the domination of a microscopic minority....In view of India's multifarious and violent latent forces, its wonderous mosaic of nationalities, strong external and independent element was necessary to preserve a just equilibrium between its heterogenous constituent parts."[৩৩]

বিলাতের পার্লামেন্টের কয়েকশত সদস্যকেও অবশ্যই গ্রেট ব্রিটেনের জনসংখ্যার তুলনায় 'মুষ্টিমেয় রাজনীতিক' (handful of politicians) আখ্যা দেওয়া চলে। ঐ মুষ্টিমেয়র হাতে—শুধু গ্রেটব্রিটেনের নয়—সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোটি কোটি প্রজার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত করা যায়। কারণ সেটা বিলাত। কিন্তু ভারতবর্ষে নানা জাতির ও নানা স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন বিদেশী এবং পূর্ণকর্তৃত্বসম্পন্ন শক্তির (of a strong external and independant element) হাতে শাসনভার ন্যস্ত থাকা উচিত। এই নূতন যুক্তির প্রচারণা চলতে লাগলো ভারতবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবির প্রতিকূলে। বলা বাহুল্য—বিলাতেও, স্কচ, আইরিশ, অ্যাংলো স্যাক্সন প্রভৃতি নানা জাতির সমাবেশ আছে এবং নানা বিচিত্র্য স্বার্থের দ্বন্দ্বও সেখানে আছে। তথাপি যে গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ ব্রিটেনবাসীরা ভোগ করে তা, (এমনকি অংশতও) ভারতবাসীদের হাতে ন্যস্ত করা যায় না—এই হল সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি।

এদিকে, ঐ ১৮৮৮ সালেই মিঃ বেক্ ও স্যার সৈয়দের উদ্যোগে আলিগড়ে 'ভারতীয় সংযুক্ত দেশপ্রেমিক সমিতি' (United Indian Patriotic Association) নাম দিয়ে একটা সংস্থা গজিয়ে উঠলো—যার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল :

(ক) ভারতের সকল সম্প্রদায় যে কংগ্রেসের সাথে নেই এই বৃত্তান্ত সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে নিয়ত অবহিত রাখা।

(খ) কংগ্রেসবিরোধী সংস্থাগুলির মতামত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গোচরীভূত করা, এবং

(গ) ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করা ও কংগ্রেসবিরোধী জনমত সৃষ্টি করা। দেখা যাচ্ছে যে 'দেশপ্রেমিক' সঙ্ঘের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে ও বিলাতে উভয়ত্র ভারতবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা।

'দেশপ্রেমিক সমিতি' সম্ভবত তার সঙ্কল্পিত কাজে খুব বেশীদূর এগোতে পারেনি। সেই জন্য কয়েক বৎসর পরে মিঃ বেকের প্ররোচনায় স্যার সৈয়দ আলিগড়ে আর একটি সঙ্ঘ গঠন করলেন যার নাম দেওয়া হল—'Mahommadan Anglo-oriental Defence Association.' এদিকে ইংলন্ডের উদারনীতিক দলের (Liberal Party-র) অনেক সভ্য ভারতবাসীদেরকে অংশত ও ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রীতিপদ্ধতির অনুসারী গণতান্ত্রিক অধিকার অর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য স্যার সৈয়দ আহম্মদ ও বেক্ সাহেবের 'দেশপ্রেমিক' সমিতি বিলাতে বিরোধী প্রচার কার্যের কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিল।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে বিলাতের পার্লামেন্টের সভ্য চার্লস্ ব্র্যাড্ল' (Charles Bradlaw) আমন্ত্রিত অতিথি রূপে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের সহকর্মী ছিলেন ও ভারতহিতৈষী রূপে পরিচিত ছিলেন। এই কংগ্রেসে সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন একজন ভারতহিতৈসী ইংরেজ—স্যার উইলিয়ম ওয়েভারবার্ণ। এই কংগ্রেসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট সংশোধন করে অধিকতর ভারতীয় প্রতিনিধিসম্পন্ন 'কৌন্সিল' (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা) গঠনের উদ্দেশ্যে একটি আইনের খস্ড়া (Bill) উপস্থিত করবার জন্য ব্রাড্ল'কে অনুরোধ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় (এই প্রস্তাব সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হবে)। মিঃ ব্র্যাড্ল বিলাতে ফিরে কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি Bill উপস্থিত করলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। মিঃ বেক্ ভারত-বিরোধী প্রচারের এই সুযোগ কাজে লাগালেন। তিনি কালবিলম্ব না করে কলেজ গেজেটে একটি প্রবন্ধ ছাপালেন এবং বললেন ঃ

"It is imperative for the Muslims and the British to unite with a view to fighting the agitators [i.e. the Congress] and prevent the introduction of democratic form of Government unsuited as it is to the needs and genius of the country. We therefore advocate loyalty to the Government and Anglo-Muslim collaboration."[৩৪]

মিঃ বেক্ শুধু প্রবন্ধ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি মুসলমান রাজভক্তদের পক্ষে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করলেন বিলাতে। ঐ আবেদন পত্রে Mr. Bradlaw কর্তৃক উত্থাপিত Bill-এর প্রতিবাদ জানানো হল। শুধু তাই নয় ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রবর্তন সম্পর্কে কংগ্রেসের যে প্রস্তাব ছিল সে প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করা হল। এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি চাকুরিতে প্রার্থী বাছাই-এর প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করা হল। মিঃ বেক বললেন, "Muslims should rather depend on their loyalty to the British Crown for securing higher appointments."

স্যার সৈয়দ আহম্মদের মানসিক পরিবর্তন তাঁকে কতদূরে নিয়ে গিয়েছিল তার সম্পর্কে

জনৈক পাশ্চাত্য লেখক কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দেই স্যার সৈয়দ (যিনি ইতিপূর্বে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ইত্যাদি সকলকেই 'হিন্দুজাতি' নামক একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন এবং বলতেন 'হিন্দু' ও 'ভারতবাসী' এ দুটি শব্দ সমার্থক) তিনি একটি বক্তৃতায় স্পষ্টতঃ দ্বি-জাতি তত্ত্ব প্রচার করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন ঃ

"Now suppose that all the English were to leave India. Then, who would be the rulers of India? Is it possible in those circumstances, that the two nations—the Mahommadan and the Hindu can sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both should remain equal is to desire the impossible."[২২]

স্যার সৈয়দ আহম্মদ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আলিগড়ে নিজভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার এক বছর পরে মিঃ বেকের মৃত্যু হয়।

স্যার সৈয়দ আহম্মদকে নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতাব্দীর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব বলে আখ্যাত করা যায়। তিনি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের প্রতিভূ কুটকৌশলী মিঃ বেক অত্যন্ত সার্থকভাবে এই প্রতিভাশালী পুরুষের মগজ ধোলাই করতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্যার সৈয়দ ভারতীয় রাজনীতিতে একটি স্থায়ী সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম মঞ্চের বনিয়াদ প্রস্তুত করে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর এই কার্যের ফলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় বিষজর্জ্জর হয়ে কী বীভৎস আত্মহননে রত হল তা চিন্তা করতে গেলে আজও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। উত্তরকালে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ভারতীয় জাতির যত ক্ষতি করেছে, পরিণামে সর্বনাশ করেছে—সেই সর্বনাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত সম্পূর্ণ করে রেখে গেলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ, যিনি শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকের দুষ্টু প্রভাবাধীন না হলে হয়ত ভারতের ভাগ্য অন্যরূপ হত।

সূত্রনির্দেশ

১। Major B D. Basu, *History of Education under the East India Company.*

২। Goutam Chattopadhyaya, *Bengal--Early Nineteenth Century—Selected Documents*, p.25 [Reproducton of article published in the *Kaliedoscope*--ed—H. L. V. Derozeo, 3rd. Issue, October 1829].

৩। *Ibid* , p. 33-34 (reproduction from the *Kaliedoscope* 2nd. issue).

৪। Major B. D. Basu. *History of Education under the East India Company.*

৫। Leonard. A. Gordon, *Bengal—The Nationalist Movement--1876-1940*, p.18.

৬। Dr. Hemendranath Dasgupta. *The Indian National Congress*, p. 126.

৭। Shankar Ghosh (Ed.). *Congress Presidential Speeches—A Selection*, p.3.

৮। Dr. Hemendranath Dasgupta, *The Indian National Congress*, p. 186.

৯। Shankar Ghosh, *Congress Presidential Speeches-- A Selection*, p. 15

১০। *Ibid*., p. 19.

১১। *Ibid., p. 20.*

১২। Dr. Nihar Ranjan Ray, 'From Cultural to Militant Nationalism' : article in *Freedom Struggle and Anushilan Samiti*. Vol. I (edited by Dr Buddhadev Bhattacharya), p.5.

১৩। Dr. Rajendra Prasad. *India Divided*, p. 91.

১৪। W. W Hunter. *The Indian Mussalmans*, p. 20

১৫। Dr. Rajendra Prasad. *India Divided*, p. 92

১৬। *Ibid*., p. 94

১৭। *ভারতকোষ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭২৬।

১৮। Dr. Bhupendranath Dutta. *The Dialectics of Land Economics of India*, p 90.

১৯। *ভারতকোষ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৯।

২০। Dr. Rajendra Prasad. *India Divided*, p 94-95

২১। Quoted by Dr Amalesh Tripathi in *The Extremist Challenge*, p. 156-57.

২২। W. W. Hunter. *Indian Mussalamans*, p. 147.

২৩। W. W. Hunter. *Indian Mussalmans*, p 157.

২৪। Leonard. A. Gordon. *Bengal- The Nationalist Movement- -1876-1940*, p 66

২৫। *Ibid*.. p. 70 [Quoted from a paper probably written in 1912 by Sayed Amir Ali-- "It can hardly be disputed that the real history of India commences from the entry of the Mussalmans"].

২৬। *Ibid*.

২৭। *Ibid*.

২৮। *Ibid*., p 69.

২৯। *Ibid* . p. 70.

৩০। *Ibid*.. p. 71.

৩১। *Ibid*.. p.65.

৩২। Mehta and Patwardhan. *The Communal Triangle*, p. 88.

৩৩। Dr. Amalesh Tripathi. *The Extremist Challange*, p 157.

৩৪। Benoyendranath Choudhury. *Muslim Politics in India*, p. 10.

৩৫। Richard Symonds. *The making of Pakistan*, p. 31.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিষবৃক্ষ রোপণ পর্ব

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ ও তাঁর পরামর্শদাতা কূটকৌশলী মিঃ বেক্ জীবনরঙ্গমঞ্চে তাঁদের শেষ অভিনয় সমাপ্ত করে বিদায় গ্রহণ করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীর সূর্য পশ্চিম আকাশের ললাটে সিন্দুর লেপন করে অদৃশ্য হলেন অস্তগিরির অন্তরালে। মহাকালের রথ বহন করে নিয়ে এলো নূতন শতাব্দীকে।

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বিংশ শতাব্দী অবিস্মরণীয়। ঘুমন্ত জাতির নিদ্রাভঙ্গের স্বাক্ষর রেখে উনিশ শতক অন্তর্হিত হল। ঝড়ো হাওয়ায় কেতন উড়িয়ে আসরে প্রবেশ করলো বিংশ শতাব্দী। ভারতের বুকের উপরে ঝড়ের তান্ডব চললো প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী। সেই ঝড় শেষ পর্যন্ত বিদেশী রাজশক্তির সিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে গেল কিন্তু ভারতজননীর দেহখানিকেও অক্ষত রেখে গেল না—তাঁর হাত দুখানি ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

বিশ শতকের সূচনাকাল নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই শতকের প্রথম দশকেই এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটলো যার রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। শতাব্দী তার দ্বিতীয় বৎসরে প্রবেশ করতে না করতেই ভারতবাসীর মুক্তিসংগ্রামে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হল। ঐ বছর অর্থাৎ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ইংরেজর সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর উচ্ছেদের সঙ্কল্প নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল নূতন বৈপ্লবিক সংস্থা—অনুশীলন সমিতি। একদিকে প্রশাসনিক স্তরে ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচার-আচরণ, দেশীয় লোকদের প্রতি 'নেটিভ' আখ্যা দিয়ে তাদের প্রতি সদা সর্বদা ঘৃণা ও অবজ্ঞার নিষ্ঠীবান বর্ষণ, অন্যদিকে কংগ্রেসপন্থী জাতীয় নেতাদের বজ্রগর্ভ বাগবিস্তারের অবগুণ্ঠনের আড়ালে দাস্যতাসুলভ অনুকম্পাভিক্ষার রাজনীতি, আবার অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্রমাগত মাত্রাবৃদ্ধি মধ্যবিত্ত যুবমানসকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই সশস্ত্র প্রতিরোধের দুঃসাহসী পথে যুবকদের পদক্ষেপের আভাস পাওয়া যায়। বলবন্ত ফাড়্কের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের বৈপ্লবিক প্রবণতার মধ্যে দিয়ে বিপ্লববাদের অগ্নিশিখা আত্মপ্রকাশ করে ১৮৮০-৮২ খ্রিস্টাব্দে। কিছুকাল পরে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে পুনার প্লেগ কমিশনার র‍্যান্ড সাহেবের হত্যা—ও তার ফলে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি যুবমানসকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। কিন্তু ঐগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক কার্য। বাঙ্গলার যুবকেরা ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি স্থাপন করে সুসংগঠিত বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের নূতন পথ উন্মোচিত করে। ইংরেজরা আতঙ্কিত হয়।

এদিকে কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী (extremist) -দের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধিও ইংরেজদেরকে উদ্‌বিগ্ন করে তোলে। ইংরেজরা তাদের পূর্বানুসৃত 'Woo the Hindus' নীতির উপরে আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং 'মুসলিম সম্প্রদায়কে কোলে টানা'র নীতির দিকে বেশী করে ঝুঁকে পড়ে।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের অধিকৃত পূর্বভারতীয় এলাকাগুলি একত্র করে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী'' নামে একটি শাসনতান্ত্রিক ইউনিট গঠন করে একজন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণরকে ঐ ইউনিটের প্রধান প্রশাসক পদে নিযুক্ত করা হয়। ঐ এলাকাগুলি হল—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম। এইভাবে 'প্রেসিডেন্সী' গঠনের কালে ঐ চারটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-এলাকা (linguistic regions) একত্রিত হয়ে একটি 'প্রদেশে' (province)-এ পরিণত হল। কিন্তু প্রশাসনিক অসুবিধার জন্য কুড়ি বছর পরে—অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসামকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি চীফ-কমিশনার-শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হয় এবং সেই সাথে শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি কতকগুলি বঙ্গ-ভাষাভাষী এলাকা বাংলা থেকে কেটে নিয়ে আসামের সাথে জুড়ে দেওয়া হল। বঙ্গদেশকে খণ্ডিত করবার এটাই প্রথম ব্রিটিশ-পরিকল্পনা। এরপর উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে আর একটি চিন্তা ইংরেজদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করতে থাকে। চট্টগ্রাম বিভাগকেও (অর্থাৎ চট্টগ্রাম ত্রিপুরা নোয়াখালি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম—এই চারটি জেলাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে ছেঁটে ফেলে আসামের সাথে জুড়ে দেওয়ার একটি প্রস্তাব নিয়ে এই সময়ে ইংরেজ শাসকমহলে আলাপ চলতে থাকে। এই প্রস্তাবের উপরে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্বেই ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কট্টর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট পদে নিযুক্ত হয়ে ভারতে আসেন। ঐতিহাসিক অতুলচন্দ্র রায় লর্ড কার্জন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

বঙ্গ বিভাজন পরিকল্পনার পশ্চাৎপট

''ভারতের বড়লাট রূপে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াই লর্ড কার্জনের প্রথম কাজ হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনা করা। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী তাঁহার নীতির ও কার্যের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। তিনি উপলব্ধি করেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙ্গালীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। সুতরাং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র বাংলা তথা বাঙ্গালীকে দুর্বল করিতে হইলে বিভাজন-নীতি (Divide and Rule) গ্রহণের প্রয়োজন কার্জন অনুভব করেন।'' [১]

এই সময় স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ছিলেন মধ্যপ্রদেশের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর। কার্জন এই ব্যক্তিকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং ফ্রেজার সহজেই কার্জনের বিশ্বস্ত উপদেষ্টারূপে কাজ করতে থাকেন। ফ্রেজারের মস্তিষ্ক থেকেই বঙ্গভঙ্গের সঠিক পরিকল্পনাটি প্রসূত হয় এবং পরিকল্পনাটি সহজেই কার্জনের অনুমোদন লাভ করে। সরকারিভাবে প্রস্তাবটি প্রকাশ করা হয় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। প্রস্তাব করা হয় যে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সাথে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর শাসিত একটি প্রদেশ গঠিত হবে আর বিহার ও উড়িষ্যার সাথে খণ্ডিত বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ জুড়ে দিয়ে আর একটি লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর শাসিত প্রাদেশিক ইউনিট বহাল থাকবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী নামে। সমগ্র ভারতের মধ্যে শুধু বাঙ্গালীদেরকে দ্বিধাভিভক্ত করে জোর করে 'হাঁড়ি পৃথক' করে দেওয়ার পরিকল্পনা যে সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি প্রসূত ছিল তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। একটি যৌথ পরিবার এক বাড়িতে এক সাথে বাস করছে। অকস্মাৎ যদি সরকারি চাপরাশধারী পেয়াদা এসে বলে

'বাড়ীটার মাঝখান দিয়ে দড়ি টেনে সেই দড়ি বরাবর প্রাচীর তোল—এক বাড়ীতে সকলের থাকা চল্‌বে না' তা হ'লে যে কোন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই জবরদস্তির প্রতিবাদ করবেন। কার্জনের পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার আগে পদ্মাপারের বাঙ্গালীরা নিজেরা ত কেউ এমন কথা উচ্চারণ করেন নি যে নদীর এপারের বাসিন্দারা নদীর ওপারে বাসিন্দাদের সাথে এক হাঁড়িতে অন্নপাক করতে অসম্মত; ইংরেজের উদ্ধত হস্ত পারিবারিক বাড়ীর মধ্যে প্রাচীর তুলে এক পরিবারকে জোর করে দুইভাগ করে দেবে এত বড় প্রশাসনিক জবরদস্তির নজির বোধ হয় ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বঙ্গবিভাজন পরিকল্পনা যে দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে খর্ব করে ভারতবর্ষের উপরে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করবার অভিসন্ধিপ্রসূত একটি চাতুর্যপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস, প্রশাসনিক সৌকার্যের স্বার্থে যে ঐ বিভাজন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় নাই, সে বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার নানা তথ্য উপস্থিত করেছেন।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনার পূর্বকথা

ভারতের বড়লাটের সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই কার্জন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ভারতবিষয়ক মন্ত্রীর (Secretary of State for India) বরাবরে প্রেরিত একখানি পত্রে এইরূপ সংকল্প প্রকাশ করেন যে তিনি তার শাসনকালের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের সমাধি রচনা সম্পূর্ণ করবেন।[২] লর্ড কার্জনের নিয়োগের কয়েক বৎসর পূর্বে থেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে নিরত হয়েছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ওল্ডহ্যাম প্রস্তাব করেন যে মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অবশিষ্টাংশে বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্তমান আশঙ্কাজনক রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খর্ব হবে। কার্জন বড়লাটের গদীতে অধিষ্ঠিত হলে অ্যান্ড্রু ফ্রেজার কার্জনকে জানান যে হিন্দুদের রাজনীতিক ক্ষমতা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে সুতরাং বঙ্গদেশের এক অংশ পৃথক করে এই বিপদ দূর করা উচিত। কার্জন ফ্রেজারের এই মন্তব্য সমর্থন করেন কিন্তু নির্দেশ দেন যে এই প্রকার উদ্দেশ্যের কথা যেন সরকারি দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ না থাকে।

ডঃ মজুমদার জানাচ্ছেন ঃ "লর্ড কার্জন ১৭ই জানুয়ারী (১৯০৪) ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেট ব্রডরিককে প্রেরিত এক চিঠিতে লেখেন 'বাঙ্গালীরা মনে করে তাহারা একটি জাতি এবং স্বপ্ন দেখে যে ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া একজন বাঙ্গালী 'বাবুই' বড়লাট হইয়া কলিকাতা রাজভবনে বাস করিবেন। বঙ্গভঙ্গ হইলে তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য নষ্ট হইবে এবং এই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে—এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধে এত প্রবল আন্দোলন চালাইতেছে। আজ যদি আমরা তাহাদের চীৎকারে বঙ্গভঙ্গ রহিত করি তবে আর কোন দিন বাঙ্গালীর শক্তি খর্ব করা যাইবে না।' "

"এই চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে আন্দোলনের প্রবলতায় শঙ্কিত হইয়া সেক্রেটারী অফ ষ্টেট টেলিগ্রাম করিলেন (২০ শে মে, ১৯০৫) যে বঙ্গদেশ বিভক্ত না করিয়া ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাকে পৃথক করা হউক। তখন কার্জন ক্রোধে গর্জন করিয়া লিখিলেন—'এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বাঙ্গালীদের ঐক্য ও ক্ষমতা আরও বাড়িবে, এবং যে অনিষ্ট বন্ধ করার জন্য

আমরা বঙ্গভঙ্গ করিতে চাই তাহা আরো বৃদ্ধি পাইবে।"[৩]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠি অতি স্বল্পকথায় বঙ্গব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার মধ্যে লুক্কায়িত সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ডঃ ত্রিপাঠি বলেছেন ঃ

"By creating a Muslim-majority province it would render Bengali Hindus, the most persuasive leaders of the moderate Congress and alas! also the most ardent recruits of the extremist views, innocuous. They would be a religious minority in Eastern Bengal and Assam, and a linguistic minority in the truncated Bengal."[৪]

কার্জনের পরিকল্পনায় বাঙ্গালী হিন্দুদের রাজনৈতিক গুরুত্বকে সমূলে বিনষ্ট করবার চক্রান্ত লুক্কায়িত ছিল—কারণ ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী হলে তা বিভক্ত দুই প্রদেশেই বাঙ্গালী হিন্দুদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করে। পূর্ববঙ্গ ও আসামে তারা হবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আর খন্ডিত বঙ্গে (অর্থাৎ অর্দ্ধবঙ্গের সাথে বিহার ও উড়িষ্যা যুক্ত করে যে প্রদেশ গঠিত হবে সেখানে) বাঙ্গালীরা হবে ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

'বাঙ্গালী হিন্দু' বলতে অবশ্যই কোনরূপ ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ বা প্রাদেশিকতাদুষ্ট সঙ্কীর্ণতাকে লেখক প্রাধান্য দান করেন নি। ঘটনাচক্রে ঐ সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুরাই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের সর্বাধিক আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। বঙ্গদেশ থেকেই ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী জয়যাত্রা সুরু হয়। তার বহুপূর্বে যখন বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা স্বপ্নেও কারও চিত্তে উদয় হয় নি, সেই সময় থেকেই কলকাতা ছিল ইংরেজ বণিকদের ভারতীয় হেড্ কোয়ার্টার আর সেই সুবাদে কলকাতা হল ইংরেজশাসিত ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী। এজন্য বাঙ্গালীরাই সর্বাগ্রে ইংরেজী শিক্ষার সুফল আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী জাগরণে বাঙ্গালীরাই সারা ভারতের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মুসলমানেরা সম্প্রদায়গতভাবে জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে অবস্থান করেছেন।[৫] তার ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বাঙ্গালী হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। ইংরেজের সিংহাসনের বড় শত্রু তখন বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এই কারণে ইংরেজেরা মনে করেছিলেন বাঙ্গালী হিন্দুর রাজনৈতিক গুরুত্ব খর্ব করতে পারলেই ভাবতবর্ষে জাতীয়তাবাদী 'এজিটেশন' স্তিমিত হয়ে যাবে ও ব্রিটিশের শাসন ও শোষণ নিরাপদ হবে।

ডঃ ত্রিপাঠি সমগ্র পরিকল্পনা আরও একটু বিষদভাবে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন ঃ

"A separate administration, a separate High Court and a separate University at Dacca would give extra opportunities to the Muslim middle class to emerge from their backward state and weaken the economic base of the Hindu middle class. The Hindu zaminder patrons of the Congress would find the Muslim peasanty ranged against them, secure in support of the Dacca Secretariat. It would divide the nationalist ranks once for all, while gaining for the government the loyalty and gratitude of the Muslim community. The partition, though annulled in 1911 sowed the seeds of jealousy and ill–will

between Hindus and Muslims, as anticipated. It strengthened the separatists tendencies of the Muslims–a legacy from the Wahabi days."[৩]

কার্জনের দুষ্ট পরিকল্পনা কিন্তু কার্যত বিপরীত ফল প্রসব করলো। সংগোপনে কৃত ঐ পরিকল্পনার কথা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে সারা দেশে প্রতিবাদের প্লাবন বয়ে গেল। এক বঙ্গদেশেই দুই মাসের মধ্যে প্রায় পাঁচশত জনসভা থেকে দৃপ্ত প্রতিবাদ ঘোষিত হল।

ষাট হাজার বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমানের দ্বারা স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র প্রেরিত হল বিলাতের কমন্সসভার সভ্যদের কাছে। হার্বার্ট রবার্টস্ নামে কমন্সসভার একজন সদস্য কার্জন পরিকল্পনা বাতিলের জন্য ভারতসচিবকে অনুরোধ করেন কিন্তু ভারতসচিব তাঁকে জানান যে কার্জন পরিকল্পনা তিনি অনুমোদন করেছেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কাশীধামে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে তৎকালীন জাতীয় নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখেল ঘোষণা করেন ঃ

"... an opposition in which all classes of Indians, high and low, educated and uneducated, Hindus and Mahommadans had joined–an opposition than which nothing more intense, nothing more spontaneous, had been seen in this country in the whole course of our political agitation ..."

আন্দোলনের প্রবলতায় কার্জন অধিকতর আতঙ্কিত এবং উত্তেজিত হয়ে মূল পরিকল্পনা সংশোধন করে সম্পূর্ণ ঢাকা বিভাগ, রাজসাহী বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সাথে যুক্ত করে নূতন 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এই প্রস্তাবই ভারতসচিব কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্যার হেনরী কটন যিনি পরপর সাত জন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসনকালে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারীর কার্য করেছেন। (অবসর গ্রহণান্তে কংগ্রেস অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেছেন) স্যার হেনরী ঐ সভায় তাঁর ভাষণে বলেন ঃ "শাসন সৌকার্যের জন্য আবশ্যকবোধ করিলে বিহার ও ছোটনাগপুরকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় এই দুই বঙ্গভাষাভাষী জেলা বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত করিয়া একটি গভর্নরশাসিত প্রদেশ গঠন করা হউক।"[৪]

এটিঅত্যন্তসঙ্গতপ্রস্তাব ছিল।কিন্তু 'শাসনতান্ত্রিকপ্রয়োজনে বিভাজন-প্রস্তাব করা হয়েছে'— এটা ত কার্জনের দুরভিসন্ধিকে গোপন করবার প্রয়াসপ্রসূত একটি ধাপ্পা ছিল মাত্র। মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালী জাতিকে ভাগ করে ইংরেজশাসন বিরোধী আন্দোলনকে পঙ্গু করে দেওয়া।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্ব

সর্বশ্রেণীর ভারতবাসী বিভাজন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। এমন কি *ইংলিসম্যান* পত্রিকা, শ্বেতাঙ্গদের বণিক্‌সভা, কোন কোন শ্বেতাঙ্গ ব্যারিষ্টার ও কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এস. প্রভৃতি ইংরেজদের একান্ত সমর্থক অনেকে বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন—(যদিও শ্বেতাঙ্গ -স্বার্থ-বোধপ্রণোদিত হয়ে শেষের দিকে এঁরা বিরোধিতা প্রত্যাহার করেন)।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই আন্দোলনের ক্ষেত্র যদিও ছিল বঙ্গদেশ, তথাপি সারা ভারতে এর প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনই ছিল সর্বপ্রথম ব্যাপক অথচ নিরস্ত্র গণপ্রতিরোধ। এই আন্দোলন আবেদন-নিবেদনসর্বস্ব ক্লীব রাজনীতির সমাধি রচনা করে। বিলাতীদ্রব্য বর্জন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমের মধ্যে, 'আঘাতের উত্তরে প্রত্যাঘাতের নীতি' কে একটি ফলপ্রদ রণকৌশল রূপে প্রতিষ্ঠা দান করে। এতদিন পর্যন্ত বাছাই-করা ইংরেজী শব্দে বিরচিত বজ্রগর্ভ ভাষণ স্বাদেশিকতার প্রশস্ত পরিচয় বলে জনমনে যে সমাদর লাভ করত বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন সেই ভাষণকলার সমস্ত উজ্জ্বলতা হরণ করে তাকে একেবারে নিষ্প্রভ করে দিল। দেশের জন্য ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলে জনমনে স্বীকৃতি লাভ করলো এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম এই আন্দোলনের প্রভাবেই 'সংগ্রামী স্তরে' উন্নীত হল। এই আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অসামান্য বলিষ্ঠতায় অভিসিক্ত করলো। এই আন্দোলনের সর্বস্তরগামী প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে বিভিন্ন স্থানে রজকগণ সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তাঁরা বিলাতী বস্ত্র ধৌত করবেন না। জুতা-মেরামতকারীরা ঐ প্রকার নিজ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিলাতী জুতা মেরামত করতে অস্বীকার করেন। কোন বাড়ীতে বিলাতী লবণ (Liverpool salt) ব্যবহৃত হয় জানতে পারলে, গ্রামবাসিরা সে বাড়ীতে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন না। দৃপ্ত প্রতিবাদপ্রবণতা বঙ্গদেশের জনচিত্তকে সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিকতার বিরুদ্ধে এক সুদৃঢ় প্রাচীর রূপে খাড়া করে।

গান্ধীজী ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ

"বঙ্গভঙ্গের পরেই ভারতের প্রকৃত নবজাগরণ ঘটিয়াছে—এই বঙ্গবিভাগই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভাগের কারণ হইবে....বঙ্গভঙ্গের পরে মানুষ বুঝিয়াছে যে আবেদন সফল করিতে হইলে তাহার পশ্চাতে শক্তির, বলপ্রয়োগের এবং কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতার নিদর্শন থাকা চাই। .....এই নূতন মনোবলের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল সংবাদপত্রে নির্ভীক মতামত প্রকাশে। পূর্বে যাহা ভয়ে ভয়ে গোপনে বলা হইত, এখন তাহা প্রকাশ্যে বলা এবং লেখা হইতেছে। আগে যুবা বৃদ্ধ সকলেই সাহেব দেখিলে পলায়ন করিত— এখন কেহ সাহেব দেখিলে তোয়াক্কা করে না। এখন লোকে গোলোযোগের সৃষ্টি করিতে বা জেলে যাইতে কিছুমাত্র ভয় পায় না। .....এই মনোবৃত্তি বঙ্গদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, এখন পাঞ্জাব হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"[৯]

গোপালকৃষ্ণ গোখেল রাজনীতি ক্ষেত্রে নরমপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রভৃতি রাজনীতি বহির্ভূত সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির যোগদানের কথা উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত গোখেল ১৯০৫ সালে বারানসী কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে মন্তব্য করেন ঃ

"If opinions of even such men are to be brushed aside with contempt, if all Indians are to be treated as no better than dumb-driven cattle, if men

whom any other country would delight to honour are to be thus made to realise the utter humiliation and helplessness of their position in their own land. then all I can say is 'good bye to all hope of co-operating in any way with the bureaucracy in the interests of the people'. I can conceive of no graver indictment of British Rule in India than that such a state of things should be possible after a hundred years of that Rule."[১০] ইতঃপূর্বে কোন মডারেট পন্থী কংগ্রেস সভাপতির কণ্ঠ থেকে এই ধরনের তেজগর্ভ উক্তি শ্রুত হয় নি।

কার্জন প্রথমদিকে তাঁর দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত পরিকল্পনার পিছনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জন করতে পারেন নি। উক্ত পরিকল্পনার প্রতিবাদে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তুল্যরূপে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯০৪-এর জানুয়ারী থেকে ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর—যেদিন থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়—সেইদিন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রায় তিন হাজার জনসভায় সহস্র সহস্র মুসলমান উৎসাহের সাথে যোগদান করেন। ১৯০৫-এর ২৩-সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে জননায়ক আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে মুসলমানগণের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানগণের সমর্থন নেই বলে সরকারের তরফ থেকে মিথ্যা প্রচারণা করা হচ্ছে। প্রস্তাবে সরকারের ঐ মিথ্যা প্রচার সম্পর্কে জনগণকে সর্তক করে দিয়ে আন্দোলনের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবিভাগ চালু হওয়ার দিন থেকে যে দিন এক বৎসর পূর্ণ হয় সেদিন দেশব্যাপী প্রতিবাদের কর্মসূচী অনুসারে ঢাকা নগরীতে এক বিরাট জনসভা হয় ও ছয়টি মিছিল বাহির হয়। বহু মুসলমান ঐসব মিছিলে ও জনসভায় যোগদান করেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ সকলেই দোকান পাট বন্ধ রাখে। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকার নবাবপরিবারের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।[১১]

ঐতিহাসিক অতুলচন্দ্র রায় লিখেছেন ঃ "বিভেদনীতি প্রয়োগ করিয়া ব্রিটিশ সরকার মুসলমানগণকে এই আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন।"[১২] অতুলচন্দ্র রায় আরও লিখেছেন যে "১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অচিরেই জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান সমভাবেই এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। .....আন্দোলনকে দুর্বল করিবার জন্য লর্ড কার্জন ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ও তাঁহার দলবলকে স্বমতে আনিয়াছিলেন বটে কিন্তু মুসলমান জনগণ আন্দোলনকে সমর্থন করিয়া যাইতে থাকে।"[১৩]

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই উভয় এলাকার খ্যাতনামা মুসলিম জনগণের মধ্যে অনেকে সক্রিয় ভারে পার্টিসন পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন। এদের মধ্যে মৌলবী লিয়াকত হোসেন (কলকাতা), ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল (নিবাস কুমিল্লা), টাঙ্গাইলের জমিদার আবদুল হালিম গজনভী (পরবর্তীকালে স্যার এ. এইচ. গজনভী নামে পরিচিত), বর্দ্ধমানের খ্যাতনামা জননায়ক আবুল কাসেম, বরিশালের জমিদার মহম্মদ ইস্মাইল চৌধুরী, বিশিষ্ট বাগ্মী ইস্মাইল হোসেন সিরাজী (সিরাজগঞ্জ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতের মুসলমানগণ কোন সময়েই সম্প্রদায়গতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন না। ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কিছুসংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাত মুসলমানকে

নানারূপ প্রলোভন ও প্ররোচনার দ্বারা বশীভূত করে স্বাধীনতাকামী জাতীয় জাগৃতিকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই শ্রেণীর উচ্চাকাঙক্ষী ভাগ্যান্বেষী উচ্চবর্গের মুসলিম নেতাগণ সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করে জাতীয় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাত শক্ত করেছেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর বেশকিছু কাল পর্যন্ত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানকারী মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৮৮৬) মোট ৪০৬ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মুসলমান প্রতিনিধি ছিলেন ৩৮ জন। এঁদের মধ্যে রহিমতুল্লা সিয়ানি (বোম্বাই), রাজা আলি নবাব খাঁ (অযোধ্যা), ব্যারিষ্টার মিঃ সরফউদ্দিন (পাটনা) প্রভৃতি ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলির দলভুক্ত মুসলিমগণ এই কংগ্রেসে যোগদান করেন নি। নবাব আবদুল লতিফ কংগ্রেসে যোগদান না করলেও নিম্নলিখিত রূপ উৎসাহব্যঞ্জক পত্র প্রেরণ করেন।

"We are fully convinced that the aim of the forthcoming Congress is to promote measures, which it is considered, will tend to amelioration of the conditions of the people of India and they would greatly regret to do any thing which have even the appearence of with holding from such a worthy object, any support which their co-opration would give."[১৮]

এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কংগ্রেসে সংযুক্ত প্রদেশের তৎকালীন গর্ভনর স্যার অক্ল্যান্ড কল্‌ভিনের প্রবল প্রতিকূলতা স্বত্বেও মোট ১২৪৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ২২১ জন ছিলেন মুসলমান, এবং ২২০ জন ছিলেন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত পঞ্চম কংগ্রেসে মোট ১৮৮০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ২৫৮ জন ছিলেন মুসলমান।

এই সব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে জাতীয়তাবাদী ও ভারতের স্বাধীনতাকামী আন্দোলন সম্পর্কে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের এবং তাদের তাঁবেদার কোন কোন মুসলিম জননায়কের প্রচন্ড মিথ্যা প্রচারণা সত্ত্বেও যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিজেদেরকে যুক্ত রেখেছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার মধ্যে শুধু যে বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়কে দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্বল করে স্বাধীনতামুখী আন্দোলনের গতিবেগ নষ্ট করে দেওয়ার গুপ্ত উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল তাই নয়, তার চেয়েও বহুগুণে বেশী অনিষ্টকর আর একটি দুরভিসন্ধিও এই পরিকল্পনার গর্ভে লুকিয়ে ছিল। ইংরেজের লক্ষ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখী শিকার করা। তাঁরা আশা করেছিলেন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে একদিকে যেমন 'এজিটেটর' বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায় দুর্বল হবে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তির হ্রাস ঘটবে, অন্য দিকে তেমনি ভারতীয় জাতিকে চিরদিনের মত দ্বিধাবিভক্ত ও পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করে রেখে সেই ভেদ নীতির আশ্রয়ে ভারতের উপরে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীকে নিরাপদ ও চিরস্থায়ী করা যাবে। এই দ্বৈত অভিসন্ধির প্রথমটি ব্যর্থ হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রচন্ড শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের আঘাতে। কার্জন তাঁর কার্যফল দেখে যাওয়ার সুযোগ পেলেন না। আন্দোলনের চাপে কার্জনকে পদত্যাগ করে বিলাতে ফিরে যেতে হল। তাঁর

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার দ্বৈত অভিসন্ধি — প্রথমটি ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় অভিসন্ধির ব্যাপারে ইংরেজেরা জয়ী হয়েছে

বিশ্বস্ত দক্ষিণ হস্ত স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকেও পদত্যাগপূর্বক ভারত ত্যাগ করতে হয়েছে। আর স্বল্পকালের মধ্যেই (সাত বৎসর কালের মধ্যে) Settled fact unsettled হয়েছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজকে বঙ্গবিভাগ বাতিল করে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। ইংরাজদের দ্বিতীয় অভিসন্ধি ছিল ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্যের মূলোৎসাদন। ইংরেজদের এই অপ-সঙ্কল্পের রূপায়ন আমরা রুখতে পারি নি। এ ব্যাপারে আমরা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছি।

লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে প্রায় ফুটন্ত তপ্ততৈলপূর্ণ কটাহের মত অবস্থায় রেখে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে পদত্যাগপূর্বক স্বদেশে প্রস্থান করেন। তাঁর জায়গায় বড়লাট পদে নিযুক্ত হয়ে এলেন লর্ড মিন্টো। ভারতের রাজনীতির মঞ্চে ঐ সময়ে যে তপ্তবায়ুস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল, তা দেখে লর্ড মিন্টো আতঙ্কিত হন। কার্যভার গ্রহণের অল্প কিছুদিন পরেই মিন্টো ভারতের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে ভারত-সচিব লর্ড মর্লির কাছে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই চিঠিতে মিন্টো কংগ্রেসের পাল্টা এমন কোন একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন যা হবে ইংরেজের অন্ধ সমর্থক। তিনি লেখেন ঃ

লর্ড মিন্টোর চাতুর্যপূর্ণ নূতন নীতি

"As to Congress, we must recognise them and be friends with the best of them. Yet I am afraid, there is much that is disloyal in the movement, and that there is danger for future. .. .I have been thinking totaly of a possible counterpoise to Congress aim. I think we may find a solution in the form of a 'Council of Princes' or in an elaboration of that idea in a Privy Council—not only of Native Rulers but also of a few other big men, to meet once a year, for a week or fortnight at Delhi for instance.....but we should get different ideas from those of the Congress emanating from men possessing great interest for the good government of India."[১৫]

দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের বিদ্রোহতপ্ত মাটিতে পা দিয়েই লর্ড মিন্টোর মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আতঙ্ক ভর করেছিল তার নিরসনের জন্য দুইটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা তাঁর মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল। প্রথম—কংগ্রেসকে যথাসম্ভব স্বীকৃতি না দিলে ভারতীয়দের অসন্তোষের আগুনকে প্রশমিত করা সম্ভব হবে না—সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে the best men অর্থাৎ রাজভক্ত মডারেট রাজনীতিকগণকে খুশী করবার জন্য একটা যা হোক্ কিছু কিছু শাসন সংস্কার ভারতবাসীকে দিতে হবে। দ্বিতীয়—ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য উপর তলার অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে কংগ্রেসের পাল্টা একটা সংস্থা গঠন করতে হবে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মিন্টো উপলব্ধি করলেন যে 'রাজন্যসভা' (Council of Princes) বা বড়লাটের 'অন্তরঙ্গ পর্ষদ' (Privy Council) গঠন করে বিশেষ কোন সুবিধা হবে না। ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। উপরতলার ধনিক শ্রেণীর একাংশ ঐ আন্দোলনে সীমিত পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন কিন্তু আন্দোলনের সাংগঠনিক স্তরে তাঁদের প্রভাব ছিল নিতান্তই স্বল্প। সেইজন্য ইংরেজানুরাগী

পাল্টা মঞ্চ (counterpoise বা confrontation platform) গড়তে হলে অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য জনগোষ্ঠীর দিকে হাত বাড়ানো প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ভারত সচিব লর্ড মর্লির লেখা চিঠি (মিন্টো কর্তৃক লিখিত পূর্বোক্ত চিঠির জবাব) মিন্টোর হাতে এসে পৌঁছালো। চিঠিখানি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। মর্লি লিখেছেন ঃ "Everybody warns us that a new spirit is growing. Lawrence, Chiriol, Syney Low—all sing the same song. You shall deal with Congress Party and Congress priniciples whatever you may think of them. Be sure that before long the Mahommadans will throw their lot with the Congress against you."[১৬]

লর্ড মর্লির এই চিঠিখানি অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় লেখা। মর্লি মিন্টোকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ভারতীয় মানসে যে নূতন (সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী) চেতনা (a new spirit) দ্রুত পুষ্টিলাভ করছে সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণের চিত্তেও উদ্বেগ জেগেছে। অর্থাৎ এই নবীন চেতনার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, কৌশলে বলে দিয়েছেন যে এমন কোন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে যা কংগ্রেসের দিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভবনাকে বিনষ্ট করে।

লর্ড মিন্টো ভারত সচিবের পত্রের মধ্যে লুক্কায়িত গূঢ় ইঙ্গিত সহজেই অনুধাবন করলেন এবং কালক্ষেপ না করে ঐ ইঙ্গিতকে কার্যকর করবার দিকে মনোনিবেশ করলেন। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখছেন ঃ

"Lord Minto soon began to elaborate in consultation with his council, a plan for reforms which he hoped. would satisfy at least the moderate elements in India. In this connection, while on the one hand a scheme was being elaborated on the other hand an attempt was being made to wean away the Muslims from the politics of the country."[১৭]

মিন্টো নরমপন্থী কংগ্রেসনায়কদেরকে দলে টানবার উদ্দেশ্যে ভারতবাসীকে এক দফা শাসনসংস্কার দেওয়ার আশ্বাস ঘোষণা করেন। মিন্টোর এই ঘোষণা ছিল—'এক ঢিলে দুই পাখী মারা'র কৌশল। ছিটে ফোঁটা শাসনসংস্কার পেলেই মডারেট কংগ্রেসনায়কগণ আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন এবং ব্রিটিশ জাতির জয়গান শুরু করে দেবেন, মিন্টো ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সহায়তায় এটা বুঝতে পেরেছিলেন। অতএব রিফর্মসের ঢিল ছুড়ে প্রথম পাখী মডারেটদেরকে যে কব্জা করা যাবে এ বিষয়ে মিন্টোর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। দ্বিতীয় পাখী মুসলমান সম্প্রদায়। মিন্টো জানতেন যে রিফর্মসের ডাঁসা পেয়ারা ভারতের আঙ্গিনায় ছুঁড়ে দিলেই নরমপন্থী হিন্দু কংগ্রেসীরা এবং ভাগ্যান্বেষী বিত্তবান মুসলমান—এই উভয়পক্ষ সেই ডাঁসা পেয়ারাটা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করবে এবং পেয়ারার কত অংশ কে পাবে তাই নিয়ে হাতাহাতিও শুরু হয়ে যেতে পারে। আর তা যদি হয় তাহলে হিন্দু-মুসলমানে পারস্পরিক কলহ শুরু হয়ে যাবে এবং কংগ্রেসের হিন্দুনায়কদের প্রতি মুসলমানেরা বিদ্বিষ্ট হবে এবং কংগ্রেসের সাথে মুসলমানদের মিলন ঘটবার কিংবা মুসলমানদের কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হবে।

একটা সীমিত ধরনের 'রিফর্মস্-প্যাকেট' ছুঁড়ে দিলেই হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় তার ভাগাভাগি নিয়ে কলহে মত্ত হবে—এটা মিন্টোর জানা ছিল। কারণ ততদিনে আলিগড় কেন্দ্র থেকে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ভাগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়ার দাবি বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনেই মুসলিম ডেলিগেটদের একাংশ এই দাবি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

পূর্ব পরিচ্ছেদে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত পঞ্চম কংগ্রেসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারত-হিতৈষী সভ্য চার্লস্ ব্রাড্‌ল (Charles Bradlaw) অতিথিরূপে যোগদান করেন এবং 'ইণ্ডিয়া কৌন্সিল' বা তৎকালীন ছায়া পার্লামেন্টে অধিকতর ভারতীয় সভ্যগ্রহণের ও ভারতীয়দের হস্তে অধিকতর প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত করবার ব্যবস্থাসম্বলিত একটি Bill পার্লামেন্টে উত্থাপন করবার জন্য মিঃ ব্র্যাড্‌ল'কে অনুরোধ জানিয়ে ঐ কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কি ধরনের শাসন সংস্কার পরিকল্পনা প্রস্তাবিত bill-এর মধ্যে থাকবে তারও একটা খস্‌ড়া পূর্বোক্ত প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই খস্‌ড়ার প্রথম ধারায় ছিল যে—'কেন্দ্রীয় আইন সভায় ও সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভায় অন্যূন অর্দ্ধেক সদস্য হবে ভারতীয়দের দ্বারা নির্বাচিত এবং বাকী অর্দ্ধেকের একচতুর্থাংশ হবে পদাধিকার বলে নিযুক্ত (Ex-officio) সরকারি কর্মচারী আর বাকী তিনচতুর্থাংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত বে-সরকারি সদস্য'। পরবর্তী একটি ধারায় সুপারিশ করা হয়েছিল যে—'যে অর্দ্ধাংশ সদস্য নির্বাচনের দ্বারা গৃহীত হবে তাদের নির্বাচনের ব্যাপারে যেন এমন নীতি অনুসৃত হয় যে, পার্সী, খ্রিস্টান, মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায় যদি কোন প্রদেশে সমগ্র জনসংখ্যার বিচারে 'সংখ্যালঘু' (minority) বলে পরিগণিত হন, তাহলে নির্বাচনবিধি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যে কোনো প্রাদেশিক আইনসভায় সেই প্রদেশের কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যা যেন এমন না হয় যা ঐ প্রদেশে ঐ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যানুপাতিক লোকবলকে প্রতিফলিত না করে (in suchwise that wherever the Parsees. Christians, Mahommadans or Hindus are in minority, total number of Parsees, Christians, Mahommadans or Hindus, as the case may be, elected to the Provincial Legislature, shall not, so far as may be possible. bear less proportion to the total number of members elected thereto than the total number of Parsees, Christians. Mahommadans and Hindus as the case may be in such electoral jurisdiction bear to the total population.)।

তৎকালীন আইনসভাগুলি যদিও ঠুঁটো জগন্নাথের মত বিকলাঙ্গ অর্থাৎ ক্ষমতাহীন ছিল তথাপি এই ধরনের সুপারিশের দ্বারা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের প্রতি এই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন যে ভবিষ্যতে সংবিধানে আইনসভাসমূহে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি কংগ্রেস স্বীকার করে নিচ্ছেন। এই প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন মিঃ আর্ডলি নর্টন (পরবর্তীকালে যিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার রূপে পরিচিত হয়েছিলেন)। হিন্দু ডেলিগেটগণ সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব মেনে

নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের জন্মদাতা হিউম (Hume) সাহেব ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই প্রস্তাবের মূলনীতিকে অনুমোদন করতে পারেন নি। তিনি মন্তব্য করলেন ঃ "Indians are Indians. Why there should be majority or minority ?" লক্ষ্ণৌ-এর ব্যারিষ্টার মিঃ হামিদ আলি আইনসভার সদস্য সংখ্যার সম্প্রদায়ভিত্তিক ভাগবাঁটোয়ারার নীতি অনুমোদন করেন নি এবং তিনি নীতিগতভাবে ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু অযোধ্যার মুন্সী হেদায়েত্ রসুলএকটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে দাবি করেন যে প্রত্যেক প্রাদেশিক আইন সভাতেই হিন্দু ও মুসলমান সদস্যসংখ্যা সমান হতে হবে। ব্যারিষ্টার হামিদ আলির সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মন্তব্যে অন্য এক ডেলিগেট সৈয়দ ওয়াজেদ আলি বিওয়াজী উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন ঃ "The number of Muslim members in the Council should be thrice that of Hindus", কিন্তু সৈয়দ মীরউদ্দিন আহম্মদ বল্‌খী সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগির নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন ঃ "We have assembled here for one common object. On such an occassion the Mahommadans can not call themselves Mahommadans, nor the Hindus, *but rather forgetting all differences on creed caste and colour, we should call ourselves Indians."*

মুন্সী হেদায়েত রসুলের সংশোধনী প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পরিত্যক্ত হয়। মিঃ নর্টনের মূল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কংগ্রেসে উপস্থিত ২৫৮ জন মুসলমান ডেলিগেটের মধ্যে অনেকেই হেদায়েত রসুলের সংশোধনী প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দান করেন।[১৮]

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই কংগ্রেসে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগির প্রশ্নে যে বিতর্ক হয় সেটা অবশ্যই 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' গোছের একটা ব্যাপার। কংগ্রেস শাসনতান্ত্রিক রিফর্মের একটা খস্‌ড়া প্রস্তুত করে ব্র্যাড্‌ল সাহেবের হাতে দিচ্ছে— ঐরূপ খস্‌ড়ার বনিয়াদে একটি Bill প্রস্তুত করে পার্লামেন্টে উত্থাপনের জন্য। ইংরেজ আদৌ কোন 'রিফর্ম' দেবে কি না তা তখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ যেইমাত্র 'রিফর্ম' প্রার্থনা করা হল অমনি তৎক্ষণাৎ সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি নিয়ে বিতর্ক সুরু হয়ে গেল এবং মিঃ বেকের প্রচেষ্টায় এই সাম্প্রদায়িক পঙ্কিলতার স্রোত বিলাত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। লর্ড মিন্টো এ সকল ব্যাপার ভালভাবেই অবগত ছিলেন এবং তিনি খুব সচেতন ভাবেই 'রিফর্ম' প্রদানের চাতুর্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। চার্লস্ ব্র্যাড্‌ল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমন্স সভায় একটি Bill উত্থাপন করেন। ১৮৯১-এর জানুয়ারী মাসে ঐ Bill-এর দ্বিতীয় রীডিং শেষ হয়। কিন্তু তার পরেই ব্র্যাড্‌ল অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ১৮৯১-এর ৩০শে জানুয়ারী তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। সুতরাং পরিষদীয় নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তাব উত্থাপনকারী সভ্যের মৃত্যু হওয়ায় প্রস্তাবটি (অর্থ ঐ Bill) বাতিল হয়ে যায়। এই Bill নিয়ে কমন্স সভায় বিতর্কের সময়ে তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড ক্রস্ ও রক্ষণশীল সদস্য লর্ড স্যালিসবরি Bill-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে মুসলিম স্বার্থের ধুয়া তুলে বিলের বিরোধিতা করেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে অন্যতম প্রতিনিধি পাটনার ব্যারিষ্টার সৈয়দ সরফউদ্দিন লর্ড ক্রস্ ও লর্ড স্যালিস্‌বারির বিভেদপন্থী বক্তৃতার সমালোচনা করে এমন একটি সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন যার মূল্য ৯৬ বৎসর অতীত হয়ে যাওয়ার পর

আজও ম্লান হয় নি। তিনি বলেন ঃ

"Arguments that Muslims are minority and their interests will be jeopardised due to the reforms, have no value. Look at the Patna city. There are 20 seats in the Municipality, but in spite of Hindus being in majority they elect more Muslims. Out of 20, there are 13 Muslim Commissioners. In Bombay Hindus are in overwhelming majority, still 5 Parsees, 3 Europeans, 2 Hindus and 2 Mussalmans are members. In our country, no inconvinience has arisen so far regarding the question of majority, and as such no majority qnestion should arise."[১৯]

পূর্বোক্ত তথ্যগুলি থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ স্বাভাবিক নিয়মে ভারতের মাটিতে উদ্‌গত হয় নি। ইংরেজের হাত দিয়ে এই বিষবৃক্ষের চারা ভারতের মাটিতে রোপিত হয়েছে—ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পোষকতা দুরভিসন্ধিবশে। তারপর দীর্ঘদিন ইংরেজেরা সুকৌশলে এই বিষবৃক্ষ লালন করেছে ভারতীয় জনচিত্তকে বিষাক্ত করে দিয়ে ভারতীয় জাতির খণ্ডীকরণের অভিপ্রায়ে। তার পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ বা সংঘর্ষ যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু সেগুলি সমাজজীবনের স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবেই ছিল। এক পরিবারের মধ্যে বা দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কিংবা হিন্দুতে-হিন্দুতে এবং মুসলমানে-মুসলমানে যেমন সাময়িক বিরোধ বা সংঘর্ষ ঘটে, সেই প্রকার।

বিষবৃক্ষ রোপনের উদ্যোগ আলিগড়—ঢাকা দুষ্টচক্র

একদিকে যখন বঙ্গব্যবচ্ছেদ নিয়ে বাংলাদেশে ও ভারতের নানাস্থানে প্রচণ্ড ব্রিটিশবিরোধী উত্তেজনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সাথে আলিগড়-কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাণ্ডাদের শলা-পরামর্শ চলছে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে বলবান করে তুলে ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনকে দুর্বল করবার অসাধু অভিসন্ধিমূলে। আলিগড় কলেজকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কেন্দ্র হিসাবে গঠন করে যান কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ বেক্। বেকের প্রেরণায় ১৮৯৩ সালে এম. এ. ও. ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা জন্মলাভ করে (Defence অর্থে defence against Hindus)। এই সংস্থার জন্ম উপলক্ষে উদ্বোধনী ভাষণে মিঃ বেক্ বলেন ঃ

"The Mussalmans and Englishmen have become targets of these two movements (i.e., Congress movement and anti-cow slaughter movement). It is therefore necessary that Mussalmans and Englishmen should unite in opposing them and that the establishment of democratic political institutions should be opposed. We must therefore carry on propaganda in favour true loyalty and unity of action."[২০]

নবাব মহসীন-উল্-মুলুক স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁর জীবিতকালে আলিগড় এম.এ.ও. কলেজের সভাপতি ছিলেন, সেক্রেটারী ছিলেন স্যার সৈয়দ স্বয়ং। স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পরে নবাব মহসীন-উল্-মুলুক হন কলেজের সেক্রেটারী। (এর 'নবাব' উপাধি ভারত সরকার

কর্তৃক প্রদত্ত ছিল না, হায়দরাবাদের নিজাম কর্তৃক প্রদত্ত ছিল)। অচিরাৎ ভারতবাসীগণকে এক প্যাকেট শাসনতান্ত্রিক 'রিফর্মস' উপহার দেওয়া হবে, মিন্টোর প্রমুখাৎ এই প্রতিশ্রুতি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিশ্রুত 'রিফর্মস'-এর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে মুসলমানদের হাতে আসে সেই চেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম অভিজাতবর্গ তৎপর হয়ে উঠলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে লর্ড মিন্টো সিমলার শৈলাবাসে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে আলিগড়ের একজন 'রইস্' হাজী মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁও নৈনিতালে ছিলেন এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সাথে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ৩০শে জুলাই, ১৯০৬ তারিখে নবাব মহসীন-উল-মুলুকের কাছে একখণ্ড প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। তিনি নবাব সাহেবকে জানান যে আসন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের সম্প্রদায়গত স্বার্থের দাবিগুলি সম্পর্কে মুসলিম সমাজের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। এ কাজে অগ্রসর হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি আলিগড় কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ আর্চিবল্ড ছিলেন নবাব সাহেবের আপন লোক। নবাব সাহেব এ কাজে অগ্রসর হতে আর্চিবল্ডকে অনুরোধ করলেন। আর্চিবল্ড সিমলায় ছুটির অবসর উপভোগ করছিলেন। বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল ডান্‌লপ স্মিথের সাথে আর্চিবল্ডের হৃদ্যতা ছিল। আসন্ন শাসনসংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমস্বার্থের দাবিসমূহ নিয়ে আর্চিবল্ড ও স্মিথের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। এই আলাপ আলোচনার মধ্যে কথা ওঠে যে এ বিষয়ে বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলমানগণের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিমন্ডলী (ডেপুটেশন) প্রেরণ করা উচিত। অতঃপর আর্চিবল্ড ১০ই আগষ্ট তারিখে নবাব মহসীন-উল-মুলুকের কাছে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রখানি পরে মুদ্রিত করে প্রস্তাবিত ডেপুটেশনের সম্ভাব্য সভ্যদের মধ্যে বিলি করা হয়। পত্রখানির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

"Cornel Dunlop Smith (Private Secretary to the Viceroy) now writes to me that the Viceroy is prepared to receive the deputation of Mussalmans and intimates me that a formal petition be submitted for it. In this connection the following matters require consideration.

"The first question is that of sending the petition To my mind, it would be enough if some leaders of Mussalmans, even though they may not have been elected should put their signatures to it. The second is the question who the members of the deputation should be. They should be representatives of all provinces. The third question is the contents of the address. In this connection my opinion is that in the address, loyalty should be expressed. Thanks should be offered that in accordance with the settled policy steps are going to be taken in the direction of self government, according to which the door will be opened to Indians for high offices. *But apprehension should be expressed that by introducing elections, injury will be done to Mussalman minority,* and hopes should be expressed that in introducing the

system of nomination or granting representation on religious basis, the opinion of the Mussalmans will be given due weight. The opinion should also be given that in country like India, it is necessary that weight should be given to the views of the Zamindars."[২১]

অতঃপর আর্চিবল্ড উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের পক্ষে 'মনোনয়ন' (nomination) প্রথা সমর্থন করাই যুক্তি-যুক্ত হবে। কারণ নির্বাচন প্রথা (Elective system) প্রবর্তিত হলে মুসলমানেরা তাদের যোগ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হবে। আর্চিবল্ডের চিঠির মধ্যে জমিদারদের অভিমতের গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ নবাব মহসীন-উল-মুলুক স্বয়ং ছিলেন একজন বৃহৎ জমিদার এবং ঐ সময়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধ্বজাধারীগণের মধ্যে মুসলমান ভূ-স্বামীদের সংখ্যাই প্রবল ছিল।

আর্চিবল্ডের উপদেশ মত বড়লাটের কাছে দরখাস্ত করা হল ডেপুটেশনে তাঁর সম্মতি প্রার্থনা করে। এই সময়ে মিঃ হেয়ার* ডান্‌লপ স্মিথের কাছে এক পত্র লিখে বলেন যে মুসলমানদের ডেপুটেশনের বক্তব্য গ্রহণ করা বড়লাটের পক্ষে খুবই সমুচিত কার্য হবে। এ চিঠিতে হেয়ার লেখেন ঃ

"Mr. Morley may ask 'do this Mahommadan representatives really represent the Mahommadan opinion?' I answer, most certainly they do, ... no doubt in East Bengal Mahommadan leaders of position and distinction are few, but unless these leaders go counter to the Moulvis, the Mahommadans will follow their lead without hesitation and to a man almost. As a matter of fact all political agitation must be engineered."[২২]

হেয়ার বড়লাটের একান্ত সচিব ডান্‌লপ্ স্মিথের কাছে পত্র লেখার পূর্বেই স্বয়ং ২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬ তারিখে বড়লাটের কাছে এক পত্র লিখে তাঁকে জানান যে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লার চেষ্টায় মুসলমানেরা স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাল্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানান যে নবাব সাহেব যে সকল হিন্দু ধনিকদের থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তারা স্বদেশী 'এজিটেটর'দের প্ররোচনায় ঋণ শোধের জন্য নবাব সাহেবের উপরে প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে।[২৩]

লর্ড মিন্টো ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর নবাব মহসীন্-উল-মুলুক কর্তৃক আয়োজিত মুসলিম ডেপুটেশনের সাথে সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করেন। নেতৃত্বের জন্য প্রখ্যাত মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও সারা বিশ্বের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম বলে পরিচিত হিজ্ হাইনেস্ আগা খাঁয়ের দ্বারস্থ হলেন ডেপুটেশন-প্রার্থীগণ। আগা খাঁ ইতঃপূর্বে জাতীয়তাবাদী বলে এবং জাতীয়তাবাদী নেতা বদরউদ্দিন তায়েবজী ও ফিরোজ শাহ মেহতার অনুগামী বলে পরিচিত ছিলেন। অকস্মাৎ সাম্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চে তাঁর প্রবেশ ভারতবর্ষের রাজনীতিসচেতন

---

* মিঃ ল্যান্সলেট্ হেয়ার। পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর, ব্যামফিল্ড ফুলারের পদত্যাগের পর ২০ শে আগস্ট ১৯০৬, ইনি তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন।

ব্যক্তিগণকে বিস্মিত করলো। এ সম্পর্কে হিজ্ হাইনেস্ তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন ঃ

"By 1906, Mohsin-ul-Mulk and I, in common with other moslem leaders had come to the conclusion that our only hope lay along the line of independent action and that we must secure recognition from the British Government as a nation within nation."[২৪]

পূর্বনির্দ্ধারিত সময় অনুযায়ী লর্ড মিন্টো সিমলা শৈলবাসে ১লা অক্টোবর, ১৯০৬ তারিখের মুসলিম ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণ করলেন।

ডেপুটেশন ভারতের বড়লাটের কাছে যে বক্তব্য নিবেদন করেন, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠি তার নিম্নলিখিত রূপ সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

"The deputation presented arguments which had been mainly formulated by Archibald except for one item. Archibald supported nomination: Belgrami* and Moshin-Ul-Mulk, with an eye to younger generation, called for election though it was hedged with safeguard and was to be on the basis of religion. They said, they were a distinct community and they did not like the idea of placing their interests at the mercy of an unsympathetic majority (the Hindus) who would not back any but pro-Hindu moslems. In short *this was a demand for separate electorate.* Secondly, their representation should be commensurate with not merely their numerical strength but with their political importance and the value of contribution which they make to the defence of the empire, consideration being paid to the position which they occupied in India a little more than two hundred years ago."[২৫]

সুতরাং মুসলিম ডেপুটেশনের সভ্যগণের দাবির সারমর্ম হল নির্বাচন চাই। কিন্তু এমন নির্বাচন চাই যেখানে হিন্দুর ভোটের কোন প্রভাব থাকবে না। কারণ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভোটে শুধু সেই সব মুসলিম প্রার্থীই নির্বাচিত হতে পারে যারা হিন্দুদের তাঁবেদার। অতএব পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করতে হবে। দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ কৌন্সিলে মুসলমান আসনের সংখ্যা শুধু তাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হলেই চলবে না। তার চেয়ে বেশী আসন চাই। মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা, ২০০ বছর আগে (অর্থাৎ মুঘল শাসনের আমলে) তাদের যে মর্যাদা ছিল সে কথা, এবং মুসলমানেরা সাম্রাজ্য রক্ষায় যে সহায়তা করেছে এই সব কথা বিবেচনা করে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত থেকে বর্দ্ধিত হারে কৌন্সিলে মুসলিম আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হবে, অর্থাৎ weightage দিতে হবে।

ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণ করে লর্ড মিন্টো ডেপুটেশনের সভ্যদের কাছে একটি বক্তৃতা

* সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বিলাতে ভারত সচিবের উপদেষ্টা কমিটিতে দুইজন ভারতীয় সভ্য গ্রহণ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এই সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ও অবসরপ্রাপ্ত I.C.S. কে.জি. গুপ্ত।

করলেন। তিনি বললেনঃ "আপনারা মোটামুটি দুইটি দাবি উত্থাপন করেছেন। প্রথমত, সমস্ত নির্বাচনমূলক শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে আপনারা পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন— কারণ বর্তমান ব্যবস্থায় (অর্থাৎ যুক্তনির্বাচনের ব্যবস্থায়) মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভবনা নাই। দ্বিতীয়ত, আপনারা বলেছেন—আপনাদের সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা এবং সাম্রাজ্য রক্ষায় আপনাদের অবদানের কথা মনে রেখে, জনসংখ্যার অনুপাতে আপনাদের যে পরিমাণ আসন প্রাপ্য হয় তার চেয়েও বেশী হারে আপনাদের জন্য আসন সংখ্যা সংরক্ষিত করতে হবে।" অতঃপর মিন্টো বললেন ঃ

"I am entirely in agreement with you. I am as firmly convinced as I believe you to be, that any electoral representation in India would be doomed to mischievous failure which aimed at granting a personal enfranchisement regardless of the beliefs and traditions of the communities composing the population of the continent."[২৬]

মিন্টোর এই বক্তৃতা থেকেই বোঝা যায়, যে সমস্ত ব্যাপারটাই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতাদের সাথে সলাপরামর্শ করে কলকাতা ও লন্ডনের কর্তৃপক্ষগণের যোগাযোগে পূর্বপরিকল্পিত একটি প্ল্যান অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। লন্ডন কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত এ রকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতের বড়লাটের পক্ষে ঐ প্রকার অভিমত প্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না! জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্মের শক্তিহানি ঘটানোর জন্য মুসলিম জাতীয়তাবাদের উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে একটা পাল্টা প্ল্যাটফর্ম খাড়া করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, ভারতের বড়লাট সহ উচ্চ পর্যায়ের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীবৃন্দ ও জনসমর্থনহীন কতিপয় সংখ্যক অভিজাত মুসলমান নেতার সাথে একত্র হয়ে একটা ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। তারই ফল সিমলার ডেপুটেশন ও তারপর অল্পদিনের মধ্যে নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ নাম দিয়ে একটা সাম্প্রদায়িকতাপন্থী রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন। ডেপুটেশনের অব্যবহিত পরে যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে তার দ্বারাও পূর্বোক্ত মন্তব্য সমর্থিত হয়।

ডেপুটেশনের সংবাদ প্রচারিত হতেই বিলাতে ও ভারতে শ্বেতাঙ্গ মহলে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকটিত হল। *লন্ডন টাইমস্* পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশিত হল ঃ

"Mussalmans were never enamoured of representative councils on European model, there is no nation in India as in England. There are various religions" ইত্যাদি।[২৭] এ সম্পর্কে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর পুস্তকে মৌলভী তোফেল আহম্মদের নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "It appears from these articles how the English press looked upon Indians being one nation with the sense of shock and heart-burning and how pleased they were to see it broken to pieces, and how proud they felt in setting Indians against one another on the basis of religions and creating hostility between them."[২৮]

সিমলা সাক্ষাৎকারের পরদিন লেডি মিন্টো তাঁর ডায়েরীতে লেখেন ঃ "This morning I have received the following letter of an official—

"A very big thing has heppened today—a work of statesmanship that will affect India and Indian history for many a long year. It is nothing less than the pulling back of 62 millions of people from joining the ranks of the seditious opposition."

মিন্টো মুসলমান প্রতিনিধিমন্ডলীর কাছে যে বক্তৃতা করেন তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মিন্টোর জীবনীকার বুসার লিখেছেন ঃ

"The speech undoubtedly prevented the ranks of sedition being swollen by Muslim recruits-an inesteemable advantage in the day of trouble which is dawning."

সিমলার মুসলিম ডেপুটেশন সম্পর্কে মিন্টোর নিজের সাম্রাজ্যবাদী বিবেক যে কতটা পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৭.১০.০৬ তারিখে (অর্থাৎ সিমলা সাক্ষাৎকারের ১৬ দিন পরে) স্যার আর্থার গড্‌লের কাছে মিন্টোর নিজের লেখা একখানি পত্রের বয়ান থেকে। এই চিঠিতে মিন্টো লিখেছিলেন ঃ

"They (i.e.the deputationists) were much fortunate and have really done most to save the position, for, as you say they will be a useful reminder to the people of England that the Bengali is not everybody in India. In fact, the Mahommadan community when roused will be much stronger and more dangerous factors to deal with than the Bengalis."[২৯]

মিন্টোর এই মন্তব্যের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালীদের রাজনৈতিক গুরুত্ব খর্ব করবার একটা পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন—এজন্য আত্মপ্রসাদ এবং মুসলিম জাতিকে খেপিয়ে তুলে বাঙ্গালীদের (অর্থাৎ ইংরেজবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের) পক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়কে বিপজ্জনক করে তুলবার গুপ্ত অভিসন্ধি এই মন্তব্যের প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে।

এর পর ২৬.১০.০৬ তারিখে লর্ড মর্লি মিন্টোর কাছে একখানা পত্র লেখেন। এই চিঠিতে মর্লি মিন্টোকে জানান ঃ

"Among other good effects of your deliverence is this that it has completely damaged the plans and tactics of the critical faction here, that is to say, it has prevented them from any longer representing the Indian government as the ordinary case of bureaucracy vs. people. I hope that, even my strongest radical friends now see that the problem is not so simple as this."

মর্লির কথা অনুসারে মিন্টো-মর্লি-আর্চিবল্ড-আগা খাঁ চক্রান্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিরোধ সম্পর্কে নূতন অস্ত্র ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে তার সাথে আরও একটা শুভ ফল প্রসব করেছে। ভারত গভর্নমেন্টের দমননীতির বিরুদ্ধে বিলাতে যাঁরা একটু আধটু সমালোচনা করতেন, মিন্টোর বুদ্ধিমত্তা তাঁদের মুখও ভোঁতা করে দিয়েছে। ঐ চিঠিতে মর্লি নিম্নলিখিত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য লিখে পাঠান ঃ

"The Emergence of a *third party*, and that from amongest the Indians

would lessen the weight of the Congress and would give the government room for manouvering."[৩০]

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে *third party* বা মুসলিম লীগ গঠনের পরিকল্পনা এর পূর্ব থেকেই ঠিক্ঠাক্ হয়ে গিয়েছিল।

শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের প্ররোচনাতেই যে রাজনীতি ক্ষেত্রে পৃথক মুসলিম প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি হতে চলেছে ইংলন্ডের রাজনীতিক নেতাদের কাছে সে সংবাদ গোপন ছিল না। ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নেতা র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড (যিনি পরবর্তীকালে অনেকদিন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) *তাঁর Awakening of India* নামক পুস্তকে লিখেছেন ঃ

"The Mahommadan leaders are inspired by a certain Anglo-Indian officials and these officials have pulled wires at Simla, and in London. and of malice after thaught sowed discord between Hindu and Mahommadan Communities."[৩১]

ইংরেজরা স্থির করেই নিয়েছিলেন যে বাছাই করা ইংরেজভক্ত মুসলমানদের দিয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে পৃথক 'মুসলিম মঞ্চ' খাড়া করে ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত দাঁড়াকাকের মত সেই মঞ্চের নেতাদেরকেই সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে সর্বত্র জাহির করা হবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা 'সিমলা কন্‌ফারেন্সের' তিক্ত সমালোচনা করেছিলেন। লখনৌ-এর মৌলনা শিল্‌বি নৌমানী *মুসলিম গেজেট* পত্রিকায় নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন ঃ "The object of Simla Conference was, and it was frankly, to get a share for the Muslims in the political rights obtained by the Hindus. ....We do not underestimate the importance of Simla Deputation. It was the biggest show staged on communal platform. But are these quarrels between the two communities to be called politics? If they are politics, the High court is the foremost legislature. Politics means deciding the relations between the rulers and the ruled and not petty quarrels of the ruled amongst themselves."[৩২]

মর্লির ২৬শে অক্টোবর তারিখের পত্র ভারতবর্ষে পৌছোতে নিশ্চয়ই কিছু সময় লেগেছিল। কারণ তখনও আকাশযান আবিষ্কৃত হয় নি। জাহাজে চিঠি আসতো, কিন্তু এদিকে নির্দ্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের পৃথক মঞ্চ স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ৯ই নভেম্বর, ১৯০৬ তারিখে (অর্থাৎ মর্লির চিঠির ১৪ দিন পরে) ঢাকার নবাব সলিমুল্লা সাহেব ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা শহরে এক সর্বভারতীয় মুসলিম কন্‌ফারেন্স আহ্বান করে বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমান নেতাদের কাছে এক 'সার্কুলার লেটার' প্রেরণ করেন। নবাব সলিমুল্লার সম্পর্কে একটু পূর্ব ইতিহাস বিবৃত করা দরকার। কার্জন যখন শত চেষ্টা করেও বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের পক্ষে উল্লেখযোগ্যরূপে মুসলিম সমর্থন যোগাড় করতে পারলেন না তখন তাঁর নজর পড়লো নবাব সলিমুল্লার দিকে। সাধারণ মুসলমানদের চিরানুসৃত মনোভাব এই যে তাঁদের উপরে দুটি প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হয়— প্রথমত, পুরোহিত শ্রেণীর অর্থাৎ মোল্লা, মৌলবী ও উলেমাগণের প্রভাব, দ্বিতীয়ত, মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বৃহৎ

ভূ-স্বামীগণের প্রভাব। ঢাকার নবাব পরিবার একটি বিখ্যাত অভিজাত পরিবার ছিল। পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমানগণের অন্তরে ঢাকার নবাব বাহাদুরের প্রতি একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ ছিল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব যে কালে ঘোষিত হয়, সে সময়ে নবাব সলিমুল্লা সাহেব ছিলেন আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত—এবং তাঁর মহাজনগণ ছিলেন প্রায়শ হিন্দু। কার্জন সরকারি তহবিল থেকে তাঁকে মোটা টাকা ঋণ দান করেন। ডঃ মজুমদার বলেছেন এই ঋণের পরিমাণ ছিল চৌদ্দ লক্ষ টাকা।[৩৩] কিন্তু ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠি লিখেছেন ঃ "Dacca Nawab Salimulla was provided by Curzon of a million pound loan for his support of the partition plan."[৩৬] ইংরাজী 'মিলিয়ন' শব্দে ভারতীয় হিসাবে 'দশ লক্ষ' বোঝায়। এক 'মিলিয়ন' টাকা ভারতীয় হিসাবে দশ লক্ষ টাকা হবে। কিন্তু এক 'মিলিয়ন পাউণ্ডের' তখনকার মুদ্রামান অনুসারে মূল্য হবে 'এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকা'। কার্জন ঢাকার নবাবকে মোটা উৎকোচ প্রদান করে তাঁকে বঙ্গবিভাগ সমর্থনের জন্য ক্রয় করেছিলেন—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। এই টাকা পেয়ে নবাব সলিমুল্লার টাকার লোভ বেড়ে যায়। দেখা যাচ্ছে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হেয়ার নবাব সাহেবকে আরও ঋণ দানের পক্ষে ওকালতি করে বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে চিঠি লিখছেন। ডঃ ত্রিপাঠি জানাচ্ছেন ঃ

"Hare recommended grant of further loan to the Nawab to enable him to secure his share of the Ashanulla Estate from machinations of the agitator."[৩৭]

যদিও এতদিন আলিগড়ই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কেন্দ্র ছিল— তথাপি নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত হল ঢাকা। এই স্থান নির্বাচনের পশ্চাতেও সাম্রাজ্যবাদী মস্তিষ্ক সক্রিয় ছিল— এটা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ বঙ্গদেশই তখন ইংরেজদের প্রধানতম মস্তিষ্ক-পীড়া। বঙ্গদেশে বয়কট আন্দোলনের আঘাতে তখন ইংরেজ বণিকদের ভারতীয় বাণিজ্য ভয়ানক রকমে মার খাচ্ছে। ১৯০৪ থেকে ১৯০৫ এই এক বছরে বঙ্গদেশে বিলাতী কাপড়ের আমদানী শতকরা ৭৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। বিলাতী জুতার আমদানী এক বছরে শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে—বিলাতী লবণের আমদানী হ্রাস পেয়েছে—প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। এইভাবে প্রসাধন সামগ্রী, নানা বিলাস দ্রব—সব কিছুর আমদানী নীচে নেমে গেছে। ইংলন্ডের বণিকেরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভারত-নীতির সমালোচনায় মুখর হয়েছে। বাঙ্গালীরা তখন ইংরেজের আতঙ্ক। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান। সুতরাং জাতীয়তাবিরোধী 'পাল্টা মঞ্চের' প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র বাংলা। সম্মেলন বাংলায় হল বটে, কিন্তু সাংগঠনিক নেতৃত্ব দান করলেন আলিগড় গোষ্ঠী। নূতন সংস্থার নাম হল—'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'। নবাব বাকির-উল্ মুলুক ও নবাব মহসীন- উল্-মুলুক লীগের যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হলেন (এঁদের একজন তখন আলিগড় মুসলিম অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের পরিচালক পর্ষদের সভাপতি। অপরজন সেক্রেটারী)। আলিগড়-ঢাকা দুষ্টচক্র সাম্রাজ্যবাদী কামারশালায় ঢালাই পেটাই হয়ে বাংলার মাটিতে finished product রূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

মুসলিম লীগের জন্ম

নূতন সংস্থার তিনটি উদ্দেশ্য ঘোষিত হল ঃ

(1) To promote loyalty to the British Government.

(2) To protect and advance the political rights and interests of the Mussalmans of India and respectfully represent their needs and aspirations to the government.

(3) To prevent the rise among Mussalmans of any feeling of hostility towards other communities, without prejudice to other objects of the League.[৩৬]

পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের তারিখগুলি পুনরায় একটু স্মরণ করিয়ে দিলেই পাঠকগণ উপলব্ধি করতে পারবেন কি প্রকার তৎপরতার সাথে মিন্টোর পরিকল্পিত জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্মের একটা প্রতিপক্ষ (counterpoise) ও মর্লির পরিকল্পিত তৃতীয় দলের (third party-র) কাঠামো প্রস্তুত করে তার আনুষ্ঠানিক জন্ম ঘোষিত হল। বড়লাটের একান্ত সচিব ডান্‌লপ স্মিথের সাথে সলাপরামর্শ করে আর্চিবল্ড চিঠি লেখেন নবাব মহসীন-উল্-মুলুকের কাছে—১০ই আগষ্ট, ১৯০৬। তার অল্পদিন পরে হেয়ার সাহেব ৯ই সেপ্টেম্বর মিন্টোর কাছে চিঠি লিখে জানান যে নবাব সলিমুল্লার চেষ্টায় মুসলমানেরা ঢাকায় স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাল্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং নবাবের হিন্দু মহাজনগণ হিন্দু এজিটেটরদের প্ররোচনায় ঋণ শোধের জন্য নবাবের উপরে চাপ দিচ্ছে। তার পরেই মিন্টো মুসলিম ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণের জন্য ১লা অক্টোবর দিন ধার্য্য করেন। ১লা অক্টোবর ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণ করে মিন্টো তাঁদের আনুকূল্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। ১৭ই অক্টোবর মিন্টো তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ চিঠি লেখেন স্যার আর্থার গড্‌লের কাছে মুসলমানদের খেপিয়ে তুললে তারা 'এজিটেটরদের' পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে—এই আশা প্রকাশ করে। ২৬ শে অক্টোবর মর্লি চিঠি লেখেন মিন্টোকে তৃতীয় দল (third party) গঠনের ইঙ্গিত দিয়ে। ৯ই নভেম্বর নবাব সলিমুল্লা ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম কন্‌ফারেন্স আহ্বান করে বিভিন্ন প্রদেশের ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতাদের কাছে সার্কুলার লেটার প্রেরণ করেন। তদনুযায়ী ৩০শে ডিসেম্বর আলিগড়ের সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতা নবাব বাকির-উল্ মুলুকের সভাপতিত্বে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ঃ

"The League started by declaring partition beneficial to the Muslim interests and condemned all methods of agitation like boycotting."[৩৭]

মুসলিম লীগ নামক সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিষবৃক্ষ যে স্বাভাবিক নিয়মে জাত একটি উদ্ভিদ নয়, লন্ডন-কলকাতা-আলিগড়-ঢাকা দুষ্টচক্রের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত একটি চারা এবং ৩০ শে ডিসেম্বর ১৯০৬ তারিখে এই দুষ্টচক্রের পার্টনারগণ যে ঢাকায় সেই চারা রোপণের মহোৎসব অনুষ্ঠান করে মুসলিম লীগ স্থাপনের মাধ্যমে—তা পূর্বোক্ত মত বিভিন্ন ঘটনার তারিখগুলি পর্যালোচনা করলেই সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

লীগের উদ্দেশ্য বর্ণনার ৩ নং ধারাটিও অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় রচিত। ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সম্পর্কে মুসলমানদের মনে বৈরভাব সৃষ্টি লীগ প্রতিরোধ করবে—সর্তাধীনে। যদি ঐরূপ বৈরভাব প্রতিরোধ লীগের উদ্দেশ্য বিরোধী না হয় তা হলেই অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরভাব প্রতিরোধের দায়িত্ব লীগের প্রতি ন্যস্ত হবে, অন্যথা নয়। লীগের উদ্দেশ্য বিবৃতির প্রথম ধারাতেই লীগ রাজভক্তি প্রবর্দ্ধনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে এবং ৩০ শে ডিসেম্বরের

কন্‌ফারেন্সই বঙ্গবিভাগ সমর্থন করে এবং বয়কট প্রভৃতি সর্বপ্রকার আন্দোলনের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে—তখন অপর যে সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করছে ও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করছে, সেই সম্প্রদায়ের লোকদের ও মুসলমানদের মধ্যে বৈরভাব দেখা দিলে তা প্রতিরোধ করবার কোন দায়িত্ব লীগের থাকবে না—এ কথা প্রায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হল। ডঃ ত্রিপাঠি যথার্থ বলেছেন ঃ

"It (the League) would never have to fulfil the third pious wish. Sir Sayed's legacy was safe in the hands of Aligar and Bengal Nawabs. It would be pro-Landlord, pro-British, anti-bourgeoise and anti-Hindu."[৩৮]

মুসলিম লীগের জন্মের সাথে সাথেই বিলাতের *লণ্ডন টাইম্‌স্* পত্রিকায় এই নূতন সংস্থার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী (ব্রিটিশ বিরোধী) আন্দোলনের প্রতি উদ্যত তরবারি হাতে নিয়েই মুসলিম লীগ ভূমিষ্ঠ হয়। কন্‌ফারেন্সের সকল ভাষণ ও প্রস্তাবের মধ্যেই এই শস্ত্রাস্ফালন সুপরিস্ফুট।

মুসলিম লীগ গঠনের অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনাগুলি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইংরেজ গভর্নমেন্ট পূর্বোক্ত কূট-চক্রান্তেরমূলে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় বৃহৎ ভূস্বামীর ও কতিপয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাগ্যান্বেষী অভিজাত শ্রেণীর মুসলিম নেতার সমর্থন অর্জন করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জেলায় জেলায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের ও সরকারি কর্মচারীদের এক অশুভ আঁতাত সংগঠিত করা হয় হিন্দুদের উপরে পৈশাচিক দলননীতি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ

"অচিরাৎ ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক কলহ ও মারামারি সুরু হইল এবং সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন ও সহানুভূতি লাভ করিল। ....জামালপুরে ও কুমিল্লায় যেভাবে হিন্দুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত ও হিন্দু নরনারীর প্রতি অত্যাচার অবাধে কয়েকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল তাহা যে কোন গভর্নমেন্টের পক্ষে চরম কলঙ্কের কাহিনী। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব কুমিল্লায় গেলেন। মুসলমানেরা চারিদিন যাবৎ হিন্দুসম্প্রদায়ের দোকান লুঠ, বাড়ীঘর পোড়াইয়া দেওয়া, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রহার ও নানাবিধ অত্যাচার চালাইতে লাগিল—পুলিশ কিছুমাত্র বাধা দিল না। ....হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করিবার জন্য মুদ্রিত ইস্তাহার বিলি করা হইল। ইহাতে প্রকাশ্যে প্রচার করা হইল যে হিন্দুদের মারিলে গভর্নমেন্ট শাস্তি দিবেন না। ঢাকার নবাবের এই হুকুম—গোপনীয় পুলিশ রিপোর্টে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।"[৩৯]

আলোচ্য সময়ে লন্ডনের *ডেইলি নিউজ্* (*Daily News*) পত্রিকা H.W. Nevenson নামে একজন বিশেষ সংবাদদাতাকে বঙ্গদেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠানোর জন্য বাংলায় প্রেরণ করেন। ডঃ মজুমদার বাংলাদেশের সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে নেভিন্‌সন্ সাহেবের পুস্তক থেকে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, যেখানেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ঘটে সেখানেই সরকারি কর্মচারীরা মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করে। যে কোন উপায়ে হউক বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে মুসলমানের সমর্থন লাভ করিবার জন্য পূর্ববঙ্গে এই মনোবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল হিন্দুদের বিরুদ্ধেই ছোটখাটো অভিযোগ আনিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য

সরকারি কর্মচারীরা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। কেবল হিন্দুরাই সরকারি চাকুরী হইতে বঞ্চিত, কেবল হিন্দুদের স্কুলে সরকারি সাহায্য বন্ধ করা হইয়াছে। যখন মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর মারপিট করে তখন 'পিটুনী পুলিশ' (Punitive Police) হিন্দুদের বাড়ীতে ঢুকিয়া জিনিসপত্র তছনছ করে এবং হিন্দুদের পাড়াতেই গুর্খা সৈন্যদল বসানো হয়। নদীর তীরে কোনো স্থানে হিন্দুদের বসিবার অধিকার ছিল না।

"মুসলমান মোল্লারা সর্বত্র বলিয়া বেড়ায় যে গভর্নমেন্ট মুসলমানদের পক্ষে, আদালত তিনমাসের জন্য বন্ধ করা হইয়াছে। হিন্দুকে মারিলে বা হিন্দুর দোকান লুঠ করিলে অথবা হিন্দু বিধবাকে জোর করিয়া অপহরণ করিলে কোনরূপ শাস্তি পাইতে হইবে না। সরকারি চাকুরীর অধিকাংশই মুসলমানদের দেওয়া হয়। কোন পদের জন্য উপযুক্ত মুসলমান প্রার্থী না পাওয়া গেলে ঐ পদগুলিতে কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় না। ছোটলাট ফুলার সাহেব রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে মুসলমান প্রজারা তাঁহার সুয়োরানী আর হিন্দু প্রজারা দুয়োরানী। মুসলমানেরা এই নীতি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং মনে করে যে কোন হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিলে তাহার জন্য শাস্তি হইবে না।"[৪০]

মুসলিম লীগ গঠিত হইবার পরেই সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের হিংসাত্মক সংঘর্ষ একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল দাঙ্গার পশ্চাতে গোপন রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির প্রভাব ছিল। যখনই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূলে মোড় নেওয়ার অভিমুখী হয়েছে, তখনই শাসকশ্রেণী তাঁদের তাঁবেদার সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতাদের কাজে লাগিয়ে অল্পবুদ্ধি সাধারণ মুসলমানগণকে মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে তুলে সাম্প্রদায়িক হিংসার তান্ডব সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন সর্পের নাকি নিঃশ্বাসে বিষ থাকে। মুসলিম লীগ নামক সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের প্রতি শাখায়, পল্লবে তীব্র বিষ মাখানো ছিল। এমন বিষ যা হাওয়ার দ্বারা স্পৃষ্ট হলে হাওয়ার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং বায়ুবাহী হয়ে সেই বিষ নিকটে ও দূরে, নগরে, গ্রামে, প্রাসাদে, কুটীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং মনুষ্যসমাজকে বিষাক্ত করে। বিশ শতকের প্রথমার্দ্ধ ব্যাপী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে এই বিষের ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রভাব ভারতের জাতীয় জীবনের সুস্থতাকে পুনঃপুনঃ পর্যুদস্ত করেছে।

সূত্রনির্দেশ

১। অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮১।

২। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩।

৩। যথাপূর্ব, পৃঃ ২৭।

৪। Dr. Amalesh Tripathi, *The Extremist Challenge*, p.150.

৫। এ বিষয়ে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কোকোনদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিরূপে মৌলানা মহম্মদ আলি বলেছিলেন : "Nevertheless, a generation of Mahommadans kept

sullenly aloof from all contact with the culture of the new rulers, which, in their heart of hearts, they despised. They were in no mood to take advantage of the education provided by Calcutta, Bombay and Madras Universities."

৬। Dr. Amalesh Tripathi, *The Extremist Challenge*, p.157.

৭। G K. Gokhale. Presidential Speech at the Benares Session of the Indian National Congress in 1905.

৮। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২২-২৩।

৯। মহাত্মা গান্ধীর রচনার অনুবাদ; ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৬।

১০। Quoted from Presidential address of G.K. Gokhale at the Benares Session of Indian National Congress in 1905.

১১। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১।

১২। অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।

১৩। যথাপূর্ব।

১৪। Dr. Hemendranath Dasgupta. *The Indian National Congress*, p.185.

১৫। India-Minto and Morley, quoted by Dr. Rajendra Prasad in *India Divided*. p.28-29.

১৬। Morley to Minto. Quoted by Dr. Rajendra Prasad in *India Divided*. p.111-12.

১৭। Dr. Rajendra Prasad, *India Divided*. p 112.

১৮। Dr. Hemendranath Dasgupta. *The Indian National Congress*. p.192-95.

১৯। *Ibid* . p 216-17.

২০। Mr. Beck's speech at the opening of M.A.O Defence Association quoted by Dr. Rajendra Prasad in *India divided*, p.105.

২১। Dr. Rajendra Prasad, *India Divided*, p.112-13.

২২। Dr Amalesh Tripathi. *The Extremist Challenge*, p.161.

২৩। *Ibid*.

২৪। Memoris of H.H. Aga Khan, p.33.

২৫। Dr. Amalesh Tripathi, *The Extremist Callenge*. p.163.

২৬। Dr. Rajendra Prasad. *India Divided*. p.114 (quoted from 'India Minto and Morley' by Lady Minto. p.25-47).

২৭। Dr. Rajendra Prasad. *India Divided*. p.115.

২৮। *Ibid*. p.69.

২৯। Minto's letter dated 17.10.06 quoted by Dr Amalesh Tripathi in. *The Extremist Challenge*, p.164.

৩০। Morley's letter to Minto dated 26 10.06.

৩১। Extract from "Awakening of India" by Ramsay Macdonald. quoted by Dr. Rajendra Prasad in *India Divided*. p.116.

৩২। Moulana Shilbi's comments published in the "Muslim Gezette" of Lucknow. quoted by Mehta and Patwardhan in *Communal Triangle in India*. p.16-17.

৩৩। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠঃ ৭২।

৩৪। Dr. Amalesh Tripathi. *The Extremist Callenge*. p.166.

৩৫। *Ibid* . p.94.

৩৬। *Ibid* . p 165.

৩৭। *Ibid*.. p 166.

৩৮। *Ibid*.

৩৯। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭২-৭৩।

৪০। যথাপূর্ব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ

লর্ড মিন্টোর প্রতিশ্রুত শাসনসংস্কারের পেটিকা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নামক কারখানায় ঢালাই পেটাই হয়ে রাজকীয় অনুমোদনের সীলমোহর যুক্ত সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভান্তে ভারতবাসীর হাতে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হল ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। এই উপহার-পেটিকার মধ্যে ভারতবাসীদের হাতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতার কণামাত্রের হস্তান্তরেরও কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। ইতঃপূর্বে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়া কৌন্সিল অ্যাক্টের বিধানমতে ভারতের শাসনকার্য নির্বাহ হচ্ছিল।

মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার; ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়া-কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট

এতে প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ক্ষমতাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও তাঁদের প্রতিনিধি ভারতের বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কেন্দ্রে, এবং বঙ্গ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি করে ছায়া-বিধানসভা খাড়া করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেগুলি ছিল কায়াহীন ছায়ামাত্র। নামে বিধানসভা হলেও কার্যত আইনপ্রণয়নের কোন ক্ষমতা ঐসব ছায়া-সভার ছিল না, ঐ সব সভার সভ্যগণের দ্বারা গৃহীত কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত প্রশাসকগণের উপরে বাধ্যকর ছিল না। মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার নামধারী নূতন আইনে শুধু পূর্বোক্ত ছায়া-বিধানসভাসমূহের আয়তন বৃদ্ধি করা হল। ভারতের বড়লাটের সাহায্যের জন্য একটি কার্যকরী পরিষদ (Executive Council) গঠিত হত। এতদিন পর্যন্ত তার সমস্ত সদস্যই গৃহীত হত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। নূতন আইনে এইটুকু দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হল যে অতঃপর কার্যকরী পরিষদে বড়লাট কর্তৃক মনোনীত একজন ভারতীয় সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা হবে। নূতন আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ছায়া বিধানসভাগুলির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হল। তবে সেখানে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য পূর্বের মতই বজায় রাখা হল। ১৮৯২ সালের কৌন্সিল অ্যাক্ট অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভার (ইন্ডিয়া কৌন্সিলের) সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। নূতন আইনে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত করে ষাটজন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় কৌন্সিল গঠনের ব্যবস্থা করা হল। এতে বড়লাট কর্তৃক মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ২৮ জন নির্দ্ধারিত করা হয় ও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য আরও পাঁচজন সদস্য মনোনয়নের অধিকার বড়লাটকে প্রদান করা হয়। ফলে ব্যাপার এরূপ দাঁড়ায় যে কৌন্সিলের ষাটজন সদস্যের মধ্যে, মনোনীত সদস্য হয় ৩৩জন। বাকী ২৭ জনের মধ্যেও কলকাতা ও বোম্বাইয়ের শ্বেতাঙ্গ-বণিকসভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। অবশিষ্ট ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন বৃহৎ ভূস্বামী প্রভৃতি কায়েমীস্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর দ্বারা এবং মুসলমানগণের জন্যও নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং কোন কালেই বড়লাটের অনভিপ্রেত কোন প্রস্তাব যাতে কৌন্সিলে পাশ না হতে পারে

তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হল। কৌন্সিলের এক্তিয়ারের মধ্যে রইল শুধু আইন ও প্রশাসন সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ আলোচনার অধিকার। কাউন্সিলের কোন সিদ্ধান্ত বড়লাটের উপরে বাধ্যকর হবে না।

প্রাদেশিক স্তরেও ছায়া-বিধানসভাগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে তথাকথিত 'নির্বাচিত' সদস্যগণের সংখ্যাধিক্য প্রতীয়মান হলেও নির্বাচনযোগ্য আসনগুলির বন্টন এমন ভাবে করা হয় যে শাসকগণের অনুগত পক্ষের সংখ্যাধিক্য সর্বদা বজায় থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিভক্ত বঙ্গের দুটি ছায়া-বিধানসভার গঠনবিধি আলোচনা করা যেতে পারে। বিভক্ত বাংলার যে অংশ বঙ্গদেশ নামেই থেকে গেল (অর্থাৎ বিহার ও উড়িষ্যা সহ পশ্চিমবঙ্গ) সেই খণ্ডিত প্রদেশে বিধানসভার সভ্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হল ৫১ জন, তার মধ্যে গভর্নর ও দুইজন একজিকিউটিভ কাউন্সিলর সহ মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ২৫ জন (তার মধ্যে ২০ জন হবে সরকারি কর্মচারী)। নির্বাচিতদের মধ্যে দুইজন থাকবে শ্বেতাঙ্গ বণিকসভার প্রতিনিধি, একজন কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের প্রতিনিধি (এঁরা সর্বদাই সরকারপক্ষে থাকবেন), সুতরাং মনোনীত সদস্য ২৫-এর সাথে এই তিনজন যুক্ত হলে সরকার পক্ষীয় নিশ্চিত সমর্থকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮। এঁদের বাদ দিয়ে বাকী সব সদস্য একজোট হলেও তাঁদের সংখ্যা ২৩-এর বেশী হয় না। এই ২৩ জনের বন্টন নিম্নরূপ ঃ

প্রদেশের বিভিন্ন জেলা বোর্ডের দ্বারা নির্বাচিত	৬
,, ,, মিউনিসিপ্যালিটির ,, ,,	৬
জমিদারবর্গের প্রতিনিধি	৫
মুসলমান প্রতিনিধি	৪
কলিকাতা কর্পোরেশন	১
,, বিশ্ববিদ্যালয়	১
	২৩

পূর্ববঙ্গ ও আসাম নাম দিয়ে যে নূতন প্রদেশ গঠিত হল, তার ছায়া বিধানসভার গঠনবিধি নিম্নরূপ ঃ

	গভর্নর	১
	মনোনীত সদস্য	২২
নির্বাচিত	জেলাবোর্ড সমূহের প্রতিনিধি	৫
	মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের প্রতিনিধি	৩
	জমিদার-শ্রেণীর ,,	২
	মুসলমান ,,	৪
	চা বাগান মালিকদের ,,	২
	পাট শিল্পের	১
	চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনার্স	১
		মোট ৪১

চা-বাগান মালিক, পাটশিল্প ও পোর্ট কমিশনার্স— এদের দ্বারা নির্বাচিত ৪ জন সহ এই ছায়া-বিধানসভায় সরকারপক্ষের নিশ্চিত সমর্থকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ জন। বাদবাকী সদস্যেরা সকলে একত্র হলেও তাঁদের সংখ্যা কখনই চৌদ্দজনের বেশী হতে পারে না।

বলা বাহুল্য এই ভাবে সুনিশ্চিত রূপে সরকারি-সংখ্যাধিক্যপুষ্ট তথাকথিত আইনসভার হাতেও বিশেষ কোন ক্ষমতা অর্পিত হয় নাই। তৎসত্ত্বেও সরকারের অনভিপ্রেত কোন ব্যক্তি যাতে কোন ক্রমে এই আলোচনা মজলিশে প্রবেশের সুযোগ লাভ না করতে পারে তদুদ্দেশ্যে কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করা হল। সাংবিধানিক আইনে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হল যে যারা ছয় মাসের বেশী সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে এমন কোন অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হয়েছে, কিংবা যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭, ১০৮, ১০৯ বা ১১০ ধারা অনুসারে জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ হওয়ার আদেশ প্রদত্ত হয়েছে, তারা ঐ সব ছায়া-বিধানসভার সভ্যনির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। তাছাড়া যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সরকার এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে তার অতীত কার্য্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তার বিধানসভায় প্রবেশ জনস্বার্থের অনুকূল হবে না, তবে সেই ব্যক্তিও নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। অর্থাৎ বিধান সভার গঠনবিধিই এমন ভাবে প্রস্তুত করা হল যে কেবলমাত্র নরমপন্থী মডারেট রাজনীতিক এবং ইংরেজভক্ত খয়ের খাঁ শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্যেরা বিধানসভার সভ্যপদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে না।

মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার অনুসারে যে ধরনের আইনসভা বা কৌন্সিল পরিকল্পিত হয়েছিল তা অনেকটা কলেজ-ছাত্রদের রাজনীতিশাস্ত্র চর্চার উদ্দেশ্যে গঠিত নকল-পরিষদ বা mock-Parliament-এর মতো। শুধু বাগ্‌জাল বিস্তারের দ্বারা পরিষদীয় রাজনীতির শিক্ষানবিসী করা ছাড়া এর সভ্যদের কোন দায়িত্ব বা অধিকার ছিল না। বার্ষিক বাজেট নিয়ে সভ্যগণ আলোচনা করতে পারতেন কিন্তু সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা বা না করা একান্তভাবে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটগণের ইচ্ছাধীন ছিল। দেশীয় রাজ্য (native states), সামরিক ব্যাপার (military affairs) কিংবা সরকারের বৈদেশিক নীতি (foreign affairs) সম্পর্কিত কোন প্রস্তাব, প্রশ্ন বা আলোচনা কৌন্সিলে হতে পারবে না, এ কথাও আইনে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিল। গৃহস্থ যেমন বালকের কান্না থামানোর উদ্দেশ্যে রাংতা-মোড়া কাঠের ছুরি বালকের হাতে দেয়, বালক তার উপরের চাকচিক্য দেখে মোহিত হয়—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও ছুরি কোন কাজে লাগে না—সেই প্রকার মডারেট রাজনীতিকদের ও অভিজাত-মুসলিম হোম্‌রা-চোমরাদের 'এজিটেশন' বন্ধ করাবার উদ্দেশ্যে মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার নামক রাংতামোড়া কাঠের ছুরি নাবালক 'এজিটেটর'দের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ শাসকগণ দূরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলেন।

কিন্তু মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কারকে শুধু খেল্‌না বলে উপেক্ষা করতে পারলে ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলজনক হ'ত। এ খেল্‌নার মধ্যে সর্বনাশের বীজ লুকানো ছিল। এ খেল্‌না শকুনির হাতের পাশা যা ভ্রাতৃবিরোধের বিষ ছড়িয়ে সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী রাজবংশকে দুইভাগে বিভক্ত করেছিল এবং তার পরিণামে গোটা ভারতের ইতিহাস এক অন্ধকারযুগের দ্বার-প্রান্তে এসে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কারের পেটিকার মধ্যে খেল্‌নার সাথে আরও

একটি পদার্থ ছিল। সে একটি কীলক। শাসন-সংস্কারের ছদ্মনামে ইংরেজেরা এই কীলকটি ভারতীয় জাতির দেহের মধ্যে প্রোথিত করে দিল। এই কীলক ভারতীয় জাতিকে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করল এবং পরিণামে ভারতবর্ষকেও খন্ডিত ও বিভক্ত করল। এই কীলকের নাম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন (Seperate communal electorate)।

'পৃথক নির্বাচন' বা Seperate electorate বলতে বুঝায় ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ কিংবা ঐ ধরনের কোন গোষ্ঠীতান্ত্রিক স্বাজাত্যবোধের ভিত্তিতে পরিষদীয় নির্বাচনে (এমন কি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনেও) নির্বাচকমন্ডলী (Constitucncy) সমূহের গোষ্ঠীতান্ত্রিক বিভাজন। যেখানে ধর্মীয় গোষ্ঠীতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে 'পৃথক নির্বাচন' হবে—সেখানে ভোটারগণকে গোষ্ঠীমাফিক ভাগ করে দেওয়া হবে—এবং শুধু এইভাবে গোষ্ঠীগতরূপে বিভক্ত ভোটারগণই নিজ গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার লাভ করবে।

মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন বলতে বোঝায়—মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিনিধিরা শুধু মুসলমান ভোটারদের দ্বারাই নির্বাচিত হবেন—তাঁদের নির্বাচনে অপরাপর সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারগণের কোন প্রভাব থাকবে না। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নির্বাচকমন্ডলসমূহকে 'মুসলমান' ও 'অ-মুসলমান' এইভাবে ভাগ করা হয়েছিল। একই গ্রামে বা এক ইউনিয়ন বা এক থানার অধীন এলাকায় পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান ভোটারগণ হয়ত বসবাস করছেন। আঞ্চলিক স্বার্থ হয়ত সকলেরই এক প্রকার। একই প্রকার সমস্যাতেই হয়ত উভয় সম্প্রদায়ের লোক জর্জরিত। স্থানীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা সকলে যৌথভাবে কোন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন না। 'ক' প্রার্থী হয়ত 'ক' গ্রামের স্থানীয় অধিবাসী কিন্তু তিনি ধর্মে হিন্দু। এখানে 'ক' গ্রামের মুসলমান ভোটারগণ স্থানীয় অধিবাসী জেনেও হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন না। হয়ত বহু দূরবর্তী 'খ' গ্রামের অধিবাসী মুসলিম প্রার্থীকে তাঁরা ভোট দেবেন—'ক' গ্রাম ও 'খ' গ্রামের অধিবাসীগণ তুল্যরূপ আঞ্চলিক স্বার্থবিশিষ্ট নয়, তাদের পারস্পরিক অভাব অভিযোগ বা দাবিদাওয়াসমূহ এক প্রকারের নয় একথা জেনেও।

সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন প্রথা সর্বক্ষেত্রেই জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী—জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করণের উপযোগী

রাষ্ট্রনীতির বিচারেই হোক, আর, বিজ্ঞানসম্মত প্রশাসনিক রীতি পদ্ধতির বিচারেই হোক, ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন প্রথা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক ও জনস্বার্থের ক্ষতিকারক। রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের নিকট থেকে নাগরিকদের যা প্রাপ্য, কিংবা রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যগত বাধ্যবাধকতা, এর কোনটাই ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে বিন্যস্ত নয়। রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের উপরে যদি কোন অন্যায় 'কর' আরোপিত হয় তা হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই তুল্যরূপে আঘাত করবে। কোন অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজের প্রকল্প কার্যকরী হলে তত্রত্য হিন্দু-মুসলমান তুল্যভাবে উপকৃত হবে—কোন অঞ্চলের সুখ-সুবিধা বা উন্নয়নের ব্যাপারে প্রশাসকগণ যদি অবহেলা প্রদর্শন করেন তবে সেই অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকেরা তুল্যভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। জনসাধারণের জলকষ্ট দূর করবার জন্য যদি কোন স্থানে একটি জলাশয় খননের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিংবা কোথাও

মহামারী বা প্লাবন ঘটলে যদি রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়, তবে সেই রাষ্ট্রীয় সাহায্যব্যবস্থা সম্পর্কে বিপন্ন অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণ সমস্বার্থবিশিষ্ট। কে হিন্দু আর কে মুসলমান এ বিবেচনা এসব ক্ষেত্রে একেবারে অচল।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগঠনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অবাস্তব। উত্তর প্রদেশের ছত্রীর নবাব বাহাদুর একজন বিশিষ্ট ইংরেজভক্ত রাজনীতিক ছিলেন। ইংরেজদের কাছে তাঁর সমাদর এতদূর ছিল যে তিনি আট মাস কাল আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের (অর্থাৎ বর্তমান উত্তর-প্রদেশের) অস্থায়ী গভর্নর পদে আসীন ছিলেন। ইংরেজ আমলে এক লর্ড সিংহ (সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ) ছাড়া আর কোন ভারতীয়ের ভাগ্যেই এত দীর্ঘকাল প্রাদেশিক গভর্নরের আসনে উপবিষ্ট থাকবার সৌভাগ্য হয় নাই। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি 'এগ্রিকাল্‌চারিষ্ট পার্টি' নামে এক দল গঠন করে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। খাঁটি ইংরাজভক্ত নবাবসাহেব ঐ সময়ে এমন একটি কথা বলেছিলেন, যার সত্যতা ও গুরুত্ব কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেছিলেন ঃ "সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন সম্ভব হবে কি প্রকারে? How can we expect that on a debatable question of land reforms, the Muslim Zamindar and the Muslim socialist will walk into the same lobby,"

কৃষকের জমিকে করমুক্ত করা হবে কিনা কিংবা কৃষকগণের নিকট থেকে ভুস্বামীগণ কর্তৃক উপস্বত্ব আদায়ের পরিমাণ কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে কিনা, কিংবা ভূমিস্বত্বের ব্যক্তিগত উপরস্থ মালিকানার প্রথার বিলুপ্তি হবে কিনা, কিংবা উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে উৎপাদক শ্রেণী ও বণিক শ্রেণীর মুনাফার হার রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে কিনা, মহাজনী ঋণের ব্যাপারে সুদের সর্বোচ্চ হার কত হওয়া উচিত, কিংবা কলে কারখানায় শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী কত হবে—এ সকল প্রশ্নে ভূস্বামী ও কৃষক প্রতিনিধি, শিল্পপতি ও বণিকদের প্রতিনিধি এবং ভোক্তা (Consumers) জনসাধারণের প্রতিনিধি কখনও একমত হতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিত্তবান পরশ্রমভোগী শ্রেণী এবং মেহনৎকারী মানুষদের সমাবেশ রয়েছে। স্বার্থের বিরোধ শ্রেণীগত ব্যাপার, সম্প্রদায়গত ব্যাপার নয়। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা বৃহৎ ভুস্বামী কিংবা বৃহৎ ব্যবসায়ী কিংবা পুঁজিপতি তাঁদের সাথে সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধ— এ বিরোধ একান্তভাবে শ্রেণীভিত্তিক। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তাই। বড় বড় নবাব, জমিদার, বড় জোতাদার, বড় ব্যবসায়ী, এবং শিল্পপতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছেন। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মিথ্যা কুহকজাল সৃষ্টি করে 'সব মুসলমানের স্বার্থ এক' বলে ঢাক পেটানোর একটাই উদ্দেশ্য এবং একটাই ফল হতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার কুহকের দ্বারা সাধারণ মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়ে শোষকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করা। এ ছাড়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আর কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না, আর কোন ফলও আশা করা যেতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাম্প্রাদায়িক রাজনীতির যাঁরা বড় বড় প্রবক্তা তাঁদের শ্রেণী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলেই এ কথা সুস্পষ্ট হবে যে দেশের উচ্চবিত্ত শোষক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের পোষকতার উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুহকজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী

হিন্দুনেতা ও মুসলিমনেতা যাত্রার দলের ভীম দুর্যোধনের মত প্রকাশ্য আসরে পরস্পরের প্রতি উত্তপ্ত তর্জন গর্জন ও গদা-আস্ফালন করে দর্শকরূপী সাধারণ মানুষদের মোহগ্রস্ত করছেন এবং পরক্ষণেই সাজঘরে গিয়ে গলাগলি হয়ে হাসিতামাসা করতে করতে এক হুঁকায় তামাক খাচ্ছেন।

পৃথক নির্বাচন প্রথা যদি শুধুই একটি অবাস্তব প্রয়াস হত তা হলে হয় ত তাকে সহ্য করা যেতো। কিন্তু এই প্রথা শুধু অবাস্তব নয় জাতীয় ঐক্যকে দ্বিধাবিভক্ত করে একটা গোটা জাতিকে খণ্ডিত করবার পক্ষে সবচেয়ে সার্থক হাতিয়ার হচ্ছে এই 'সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন'।

পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে হিন্দু প্রার্থীকে আদৌ মুসলিম ভোটারদের দ্বারস্থ হতে হয় না কিংবা মুসলিম ভোটারদের প্রতি তাঁর কোন দায়িত্বও থাকে না। পক্ষান্তরে কোন মুসলিম প্রার্থীকে কোন হিন্দু ভোটারের দ্বারস্থ হতে হয় না এবং বিজয়ী মুসলিম প্রার্থী হিন্দু ভোটারগণ সম্পর্কে কোনরূপ দায়িত্বও অনুভব করেন না। ফলে নির্বাচনী প্রচারের সময়ে সমগ্র দেশ হিন্দু ও মুসলমান এই দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রার্থীরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ও কুৎসা রটনার মাধ্যমে স্ব-সম্প্রদায়ের ভোটারদের কাছে নিজেকে 'খাঁটি হিন্দু' অথবা 'খাঁটি মুসলমান' বলে জাহির করবার অবাধ সুযোগ লাভ করেন এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও কুৎসা প্রচারের প্রতিযোগিতায় যিনি যত এগিয়ে যেতে পারেন জয়লাভ তাঁর কাছে তত সহজ বলে মনে হয়। অতএব, পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বৈরিতার উত্তেজনা-সৃজন একটি ফলপ্রদ নির্বাচনী কৌশলরূপে বিবেচিত হয়।

১৯০৯ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে যখনই নূতন কোন শাসনসংস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা জেগেছে বা কোন সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হয়েছে তখনই সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা ব্যাপক হিংসাত্মক সঙ্ঘর্ষে পর্যবসিত হয়েছে। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন ঃ

"If the history of Communal riots, say during the last thirty years or so, is studied without prejudice, it will show that these riots show a knack of appearing at critical moments in political history of the country. We find them occurring whenever the demand for transfer of power from British to the Indian hands has become insistent and strong and whenever the two major communities in India have shown unity of purpose and action."[১]

সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচন জাতীয় ঐক্যের ছেদক ও নাশক একখানি মারণাস্ত্র। অপরপক্ষে, যৌথ নির্বাচন প্রথা জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতির সতর্ক প্রহরী। যৌথ নির্বাচন প্রথা জনসাধারণের মন থেকে বিভেদপন্থী অশুভ প্রবণতাকে বিদূরিত করে। যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রবর্দ্ধিত হয়। যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি দেশবাসিগণের মধ্যে একজাতীয়তাবোধের প্রসার ঘটায়, তারফলে জাতীয় সংহতি দৃঢ়মূল হয়। এই পদ্ধতিতে নির্বাচনী সাফল্যের জন্য হিন্দু প্রার্থীকে মুসলমান ভোটের উপরে নির্ভর করতে হয়, এবং

জাতিয় সংহতির পোষক যৌথ নির্বাচন প্রথার বিসর্জন ও পৃথক নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্তন।

মুসলমান প্রার্থীগণকেও অনুরূপ ভাবে হিন্দু ভোটারগণের ভোটের উপরে নির্ভর করতে হয়। সেইজন্য নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অথবা নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক কাজকর্মে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার কিংবা সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় গ্রহণ কোন প্রার্থীর পক্ষেই সুফলপ্রসূ হয় না। কারণ, কোন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করলে কিংবা কোন এক সম্প্রদায়ের অনুকুলে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করলে প্রার্থীর পক্ষে অপর সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারদের সমর্থন হারাবার ভয় থাকে এবং নির্বাচনী সংগ্রামে তাঁর জয়ের আশা হয় সুদূর পরাহত। এমন কি, কোন এক নির্বাচন ক্ষেত্রে যদি কোন এক সম্প্রদায়ের ভোটারগণের প্রচুর সংখ্যাধিক্য থাকে তা হলেও সাম্প্রদায়িক বৈরিতা প্রচারিত হলে গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীরও জয়ের আশা দূরবর্তী হয়ে পড়ে। কারণ প্রতি নির্বাচনেই দেখা গিয়েছে নির্বাচনযোগ্য প্রার্থীর নির্দিষ্ট সংখ্যা যে ক্ষেত্রে মাত্র একজন সে ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা ৬, ৮ কিংবা ১২ পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রার্থীদের কাছে অল্প ভোটও মূল্যবান বিবেচিত হয়ে থাকে।

ধূর্ত ইংরেজ শাসকগণ কিছু সংখ্যক ভাগ্যান্বেষী উচ্চবিত্ত মুসলমান নাগরিককে তাদের ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণের প্রলোভন দেখিয়ে, তাদের মাধ্যমে সুকৌশলে সর্বনাশা পৃথক নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি পূরণের অজুহাতে জাতীয় সংহতির পোষক যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিকে বঙ্গোপসাগরের জলে নিক্ষেপ করতঃ বিভেদপন্থী পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তনের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির পরিপূরণ করলো।

মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবি কার মস্তিষ্ক-প্রসূত?

আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখেছি যে সিমলা ডেপুটেশনের উদ্যোক্তা আর্চিবল্ড বড়লাটের একান্ত সচিব ডান্‌লপ স্মিথের সাথে পরামর্শ করে ১০ই আগষ্ট ১৯০৬ তারিখে সিমলা ডেপুটেশনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের উপদেশ দিয়ে নবাব মহ্‌সীন-উল-মুলুকের কাছে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তার মধ্যে পৃথক নির্বাচনের দাবির কথা ছিল না। তার মধ্যে মুসলমান প্রতিনিধিরা তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসংখ্যার আনুপাতিক হার অপেক্ষা উচ্চতর হারে সভ্যপদ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখার দাবি করেন। কথা ছিল যে, সেই সাথে এই দাবিও থাকবে যে সমস্ত কৌন্সিলেই মুসলমান সভ্যগণ হবেন বড়লাটের দ্বারা মনোনীত (nominated)। আর্চিবল্ডের ঐ চিঠিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে বড়লাটের কাছে মুসলিম নেতাদের পক্ষ থেকে যে প্রতিবেদন (Memorial) দাখিল করা হবে তার মধ্যে যেন এইরূপ উক্তি থাকে যে নির্বাচন প্রথা ভারতবর্ষের উপযোগী নয়, যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে সভ্য সংগৃহীত হলে প্রকৃত মুসলমান প্রতিনিধি কখনই নির্বাচিত হতে পারবে না। যাঁরা নির্বাচিত হবেন তাঁরা হবেন হিন্দুদের তাঁবেদার। দেশে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, সুতরাং নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বিসর্জন না দিয়ে কোন মুসলমান প্রার্থীর পক্ষেই ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভবপর হবে না।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ১লা অক্টোবর ১৯০৬ তারিখে বড়লাটের সাথে সাক্ষাৎকারের সময়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ যে দীর্ঘ প্রতিবেদন দাখিল করেন তার মধ্যে 'নমিনেশনের' দাবি উত্থাপন না করে 'পৃথক নির্বাচনের' দাবি করা হয়েছে। সুতরাং ১০ই আগষ্ট থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর এই সময়ের মধ্যে মুসলিম নেতাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে, এবং তাঁরা 'নমিনেশনের' দাবি না করে পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই মনোভাব পরিবর্তনের

রহস্য কি? একমাস কুড়ি দিনের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটলো যার ফলে মুসলিম নেতারা পূর্ব-পরিকল্পিত দাবি সংশোধন করে 'নমিনেশনের' বদলে 'পৃথক নির্বাচন' দাবি করলেন?

এ বিষয়ে যুক্তিসম্মতরূপেই যে কোন বিবেচক ব্যক্তির মনে এই সিদ্ধান্তের উদয় হবে যে 'নমিনেশন' প্রথার অনুকূলে আর্চিবল্ড মুসলিম নেতৃবর্গকে যে প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছিলেন, বিলাতের কর্তৃপক্ষ সেটা অনুমোদন করতে পারেন নি। সমস্ত ব্যাপারটাই রূপায়িত হয়েছিল লন্ডন-কলকাতা-আলিগড়-ঢাকা দুষ্টচক্রের মাধ্যমে মর্লি, মিন্টো, আর্চিবল্ড ও হেয়ারের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সূত্র অনুসরণ করে। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী (Extremist) গোষ্ঠীর উদ্ভব মর্লি ও মিন্টো উভয়েরই শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। উভয়েই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন—জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ (counterpoise) হিসাবে নৈষ্ঠিক ইংরাজ-ভক্তদের নিয়ে একটি ব্লক খাড়া করবার জন্য এবং উভয়েই অনুভব করেছিলেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে দুর্বল আক্রমণোপযোগী স্থান (vulnerable point) হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় বিভেদ। সেইখানটায় সার্থকরূপে আঘাত হানতে পারলে ভারতীয় জাতিকে সুস্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া যায়—এবং তারই একাংশকে কোলে টেনে নিয়ে অপরাংশের বিরুদ্ধে তাকে লেলিয়ে দেওয়া যায়, আর এই ভাবে ভেদনীতির প্রয়োগের দ্বারা ভারতের উপরে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। ৬ই জুন ১৯০৬ তারিখে মর্লি লর্ড মিন্টোকে যে পত্র প্রেরণ করেন তার মধ্যে অবিলম্বে মুসলমানদের নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই প্রকার প্রতিপক্ষ দল বা counterpoise গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হতে মিন্টোর প্রতি মর্লির প্রচ্ছন্ন নির্দেশ ছিল। ঐ চিঠির শেষাংশে মর্লি লিখেছিলেনঃ

"You may deal with the Congress party and Congress principles whatever you may think of them but be sure that before long the Mahommadans will throw their lot with the Congress against you."[২]

এর চেয়ে স্পষ্টতর ভাষায় একজন গভর্নর জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া একজন ব্রিটিশ মন্ত্রীর পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে ৩০শে জুলাই ১৯০৬ তারিখে আলিগড়ের 'রইস্' হাজী মহম্মদ ইস্মাইল খাঁ নবাব মহ্সীন-উল-মুলুকের কাছে চিঠি লিখে মুসলমানদের তরফে বিশেষ অধিকার দাবির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নবাব সাহেবকে আহ্বান জানান। তার পরেই আর্চিবল্ডের লেখা ১০ই আগষ্ট তারিখের পত্র নবাব সাহেবের হস্তগত হয়—এই দশদিনের মধ্যে আর্চিবল্ড বড়লাটের সেক্রেটারী ডান্‌লপ স্মিথের সাথে কথাবার্তা বলে সমস্ত পরিকল্পনা ঠিক্‌ঠাক্ করে ফেলেছেন। আর্চিবল্ডের পত্রখানি মুদ্রিত করে বিভিন্ন প্রদেশের অভিজাত শ্রেণীভুক্ত মুসলমান নেতাদের মধ্যে বিলি করা হয়। অতএব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে এই চিঠির মুদ্রিত অনুলিপি বিলাত পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

সঙ্গত কারণেই আর্চিবল্ডের পত্রে লিখিত 'নমিনেশন' প্রথার দ্বারা আইনপরিষদসমূহে মুসলিম আসনগুলি পূরণ করবার প্রস্তাব বিলাতের কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করতে পারেন নি। ভেদনীতির কার্যকারিতার দ্বারা একদল উচ্চবিত্ত মুসলিম নেতাকে শুধু দলে ভেড়াতে পারলেই

ইংরেজদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। দেশীয় ও বিদেশীয় লোকদের চক্ষে এটা প্রতিভাত হওয়া চাই যে, ঐ সকল ইংরেজভক্ত মুসলমান অভিজাতবর্গই মুসলমান জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট এবং তাঁরাই মুসলমান সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদী প্রতিনিধি। বিলাতে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে যে সকল সমালোচক ছিলেন, তাঁদের মুখ বন্ধ করবার জন্যও ভারতের ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতাদেরকে স্বসম্প্রদায়ের সমর্থনপুষ্ট মুখপাত্র হিসাবে জাহির করবার প্রয়োজন ছিল। পরিষদীয় মুসলিম আসনসমূহ 'নমিনেশনের' দ্বারা পূরণ করলে বড়লাট কর্তৃক 'মনোনীত' নেতারা লোকচক্ষে ইংরেজের অনুগ্রহজীবী বলেই প্রতিভাত হবেন। তাঁদেরকে কেউ মুসলিম জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে মনে করবে না।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনপর্ব জনমানসকে আলোড়িত করবার পক্ষে একটি কার্যকরী মাধ্যম। পুনঃ পুনঃ ভোটদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই জনমানস উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করে। মুসলিম প্রতিনিধির আসনসমূহ মনোনয়নের দ্বারা পূরণ করা হলে মুসলিম জনসাধারণ নির্বাচনপর্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়বে এবং সে ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশে যে ব্রিটিশবিরোধী প্রবণতা আলোচ্য সময়ে সোচ্চার হয়ে উঠছিল তার প্রভাব মুসলমান জনসাধারণের উপরেও পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। বিশেষ করে আলোচ্য সময়ে তুরস্ক ও পারস্যে গণতান্ত্রিক শাসনের সপক্ষে যে যুব-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমান যুবসমাজও কংগ্রেসপন্থী হয়ে যেতে পারে, এ আশঙ্কাও বিলাতের কর্তৃপক্ষের মনে উদিত হয়েছিল।

তৃতীয়ত, 'নমিনেশন' প্রথার পরিবর্তে 'পৃথক নির্বাচন' প্রথা প্রবর্তিত হলে পুনঃ পুনঃ নির্বাচনী প্রচারকার্যের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের ফাঁকটি উত্তরোত্তর প্রশস্ততর হবে এবং ভারতীয়গণের জাতীয় ঐক্য কোন দিনই দানা বাঁধতে পারবে না। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যথার্থ বলেছেন ঃ

"The result of separate electorate has been not only to create a gulf, but to widen it progressively."[৩]

জাতীয় অনৈক্যের শক্ত মাটিতে নোঙর গেড়ে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের জাহাজগুলি নিরাপদে শোষণ ও লুণ্ঠনের ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারবে।

উপরিলিখিত সম্ভাবনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে 'পৃথক নির্বাচন প্রথার' ভাবনা যে শাসককুলের মস্তিষ্কপ্রসূত হয়ে সিমলা ডেপুটেশনের উদ্যোক্তাদের সমীপে প্রেরিত হয়েছিল এবং ডেপুটেশন কর্তৃক বড়লাট সমীপে দাখিলী প্রতিবেদনের অঙ্গীভূত হয়েছিল এরূপ অনুমান সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসিদ্ধ। ডেপুটেশনের নেতা মহামান্য আগা খাঁ লর্ড মিন্টোর সমক্ষে যে দীর্ঘ প্রতিবেদনখানি পাঠ করেন, তার মুসাবিদাও যে স্বয়ং আর্চিবল্ডের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায়। কোন জায়গা থেকে ধূম উঠছে দেখলেই মানুষ স্বচক্ষে আগুন না দেখেও অনুমান করে নিতে পারে যে যেখান থেকে ধূম উঠছে সেখানে অবশ্যই আগুন আছে। আর্চিবল্ড ১০ই আগষ্ট ১৯০৬ তারিখে আলিগড় এম. এ. ও. কলেজের সেক্রেটারী নবাব মহসীন-উল্-মুলুককে যে পত্র লেখেন তার শেষাংশ পাঠ করলেই নিঃসংশয়ে জানা যাবে যে পূর্বোক্ত প্রতিবেদনখানির রচয়িতা ছিলেন আর্চিবল্ড। চিঠির শেষাংশে তিনি লিখছেন ঃ

"But in all these matters, I want to remain behind the screen, and this move should come from you. You are aware how anxious I am for the good of the Mussalmans and I would therefore render all help with the greatest pleasure. I can prepare and draft the address for you. If it be prepared in Bombay, then I can revise it because I know the art of drawing up petitions in good language. But Nawab Shaheb, please remember that if within a short time any great and effective action has to be taken, then you should act quickly."[৪]

মুসলিম লীগের রাজনীতি ১৯০৬-১৯১২

লীগ রাজনীতি প্রথম থেকেই দুটি মৌলিক নীতির উপরে ভর করে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম ইংরেজ শাসকশ্রেণীর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য; দ্বিতীয়, সর্বপ্রকার জাতীয়তাবাদী ও ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ। মুসলিম সমাজের প্রতি লীগনেতাদের নির্দেশ ছিল সরকারবিরোধী সর্বপ্রকার বিক্ষোভ ও আন্দোলন থেকে দূরে অবস্থান করা এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে ঐ সব আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়া। মুসলমানগণের বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইংরেজের দাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর করা ছাড়া অপর কোন কর্মসূচী লীগ রাজনীতির মধ্যে ছিল না। এবং মুসলমান সমাজের উন্নতি বলতে লীগ নেতারা বুঝতেন—উচ্চবিত্ত অভিজাত মুসলমানদের সমৃদ্ধি ও তাঁদের জন্য ইংরেজের অঙ্কাশ্রিত রাজনীতিক ও সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন। মডারেট মতাবলম্বী হিন্দু রাজনৈতিক নেতাদেরও রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় একই প্রকার ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে উভয় শ্রেণীর কার্যক্রমের মধ্যে কোন প্রকার ঐক্যবদ্ধতা বা সহযোগিতা ছিল না, কারণ ইংরেজের হাত দিয়ে ভারতীয়গণের জন্য যে দাক্ষিণ্যের পেটিকা পরিবেশিত হবে তার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে কাড়াকাড়ি ছিল এবং এই পিঠাভাগের দ্বন্দ্বই ছিল মুসলিম লীগের একমাত্র সংগ্রামী কর্মসূচী। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিলুপ্তি যেমন মডারেট দলভুক্ত জাতীয় নেতাদের অনভিপ্রেত ছিল তেমনি লীগপন্থী নেতাদেরও অনভিপ্রেত ছিল। লীগ রাজনীতির বনিয়াদ এমন একটা কল্পিত সিদ্ধান্তের উপরে গঠিত হয়েছিল যে ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারী চিরস্থায়ী হবে, ভারতবাসিগণের স্বাধিকার কিংবা গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে যতকিছু আন্দোলন হবে মুসলমানেরা তার বিরোধিতা করবে। তৎসত্ত্বেও আন্দোলনের চাপে যদি কিছু শাসনসংস্কার (reforms) আসে তবে ইংরেজরা তার মধ্য থেকে একটা মোটা রকমের অংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখবে। ভারতবর্ষের উপরে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারী যদি অপসৃত হয় তখন ভারতের জাতীয় রাজনীতি কোন পথে চলবে, সে সম্পর্কে মডারেট দলভুক্ত রাজনীতিকদের কিংবা লীগ-নেতাদের মস্তিষ্কে কোন চিন্তার উদয় ঘটে নি।

মুসলিম লীগের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আলিগড় শহরে। এই অধিবেশনেও বঙ্গব্যবচ্ছেদকে অভিনন্দিত করে এবং স্বদেশী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৫] লীগের পরবর্তী সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে হিজ হাইনেস্ আগা খাঁয়ের সভাপতিত্বে। ততদিনে মর্লি-মিন্টো রিফর্মস্

পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী মহলে অসন্তোষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে—কারণ রিফর্মসের ভিতরে সারবস্তু বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু পৃথক নির্বাচনরূপী শক্তিশেলখানি 'রিফর্মস্'-এর প্যাকেটের ভিতরে পুরে ভারতবর্ষে চালান করা হয়েছিল। মুসলিম লীগ দিল্লীর অধিবেশনে মর্লি-মিন্টো রিফর্মস্‌কে অভিনন্দিত করে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ঐ সভায় রিফর্মস্ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমালোচনা বা নিন্দামূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে ঐ পরিকল্পনার সমালোচনা বা নিন্দা প্রচার করা হলে ইংরেজেরা রুষ্ট হয়ে 'রিফর্মস্' প্রত্যাহার করে নিতে পারে।[৬]

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বাকর উল মুলুকের সাথে আলিগড় এম. এ. ও. কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষের বিরোধ বাধে (ঐ সময়ে বাকর উল্ মুলুক ছিলেন কলেজের সেক্রেটারী)। সংযুক্ত প্রদেশের লেফটন্যান্ট গভর্নর স্যর অ্যান্টনী ম্যাক্‌ডোনেল কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষকে সমর্থন করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্যার অ্যান্টনি লীগের প্রেসিডেন্ট হিজ হাইনেস্ আগা খাঁকে প্রভাবিত করে লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় আলিগড় থেকে লখ্‌নৌতে স্থানান্তরিত করান।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এলাহাবাদে। মহম্মদ আলি জিন্না তখন ছিলেন কংগ্রেসের একজন নেতা। এলাহাবাদ কংগ্রেসে মিঃ জিন্না 'পৃথক নির্বাচন' প্রথার নিন্দা করে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখেছেন ঃ

"In Allahabad session of the congress in 1910 Mr. Mahommad Ali Zinna, a staunch Congresman then, moved a strongly worded resolution condemning separate electorate and cursed in a strong speech the obnoxious virus introduced into the body politic of India with evil design."[৭]

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হলেন কি

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে ঘোষণা প্রচার করেন। এই ঘোষণার বলে খণ্ডিত বঙ্গের দুই অংশ একত্রিত হয়ে যুক্তবঙ্গ একটি পৃথক গভর্নর শাসিত প্রদেশ রূপে সংগঠিত হয়। বিহার ও উড়িষ্যাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক লেফটেন্যান্ট গভর্নর শাসিত প্রদেশ রূপে সংগঠন করা হয় এবং বাঙ্গালী প্রধান শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা দুইটিকে আসামের সাথে সংযুক্ত করে আসামকে পুনরায় একটি চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হয়। ঘোষণাটি সরকারিভাবে প্রচার করা হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে স্বয়ং ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখনিসৃত বাণীর মাধ্যমে। পরে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1912) পাশ করেন। এই পরিকল্পনায় উল্লিখিত অংশগুলি বাঙ্গালীদের দুর্বার প্রতিরোধশক্তির জয়ের স্বীকৃতিজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীরা বিস্মিত ও উল্লসিত হলেন। কিন্তু বৃশ্চিকের বিষ থাকে তার 'হুল' বা লেজে (The sting was in its tail)। এই পরিকল্পনা বলে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হল। ভারতের রাজনীতিতে বাঙ্গালীদের প্রাধান্য খর্ব করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজের নূতন ও কার্যকরী কৌশল হল রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে সুদূর দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া। অনেকের কাছেই

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বঙ্গব্যবচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্ত ছিল অপ্রত্যাশিত, এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অকস্মাৎ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেকের কাছেই একটি রহস্যপূর্ণ ঘটনা বলে মনে হল। ভারতবাসীদের সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছিল এমন কথা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সহজে বিশ্বাস করতে পারবেন না। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল এবং অনেক ভেবেচিন্তে ইংরেজেরা এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল তখন লর্ড মর্লি দম্ভভরে বলেছিলেনঃ "Partition of Bengal is a settled fact"—এর কোন নড়চড় হবে না। বিক্ষুব্ধ ভারতবাসিগণের মুখপাত্র হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মর্লির ঐ উক্তির জবাবে বলিষ্ঠ ঘোষণা করেছিলেনঃ "We shall unsettle the settled fact"। ভারতীয় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ইংরেজরা বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে সহৃদয়তার পরিচয় দিলেন এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। ইংরেজরা কখনও স্বেচ্ছায় ভারতীয় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত বদল করেছেন—সুদীর্ঘকালের ইংরেজশাসনের ইতিহাসে এ প্রকার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। সুতরাং কি জন্য ইংরেজরা এত ঘটা করে বঙ্গ বিভাগ সম্পন্ন করবার পরে পাঁচ বছরের মধ্যে সিদ্ধান্ত বদল করলেন এ প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে সম্রাটের মুখ দিয়ে একই সাথে বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সিদ্ধান্ত ও ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বোঝা যায় দুটি ঘোষণাই একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান কলকাতাকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষের সকল অংশে বিস্তার লাভ করে। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতাই ছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তৎপরতার হৃৎকেন্দ্র। স্বাভাবিক ভাবেই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতায় এবং কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিগণ শাসক সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের অধিকতর সুযোগ লাভ করল এবং নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থার যে সকল নূতন সুযোগসুবিধার দ্বার উন্মোচন করে দিল সেই সব সুযোগ সুবিধার সিংহভাগ উদ্যমশীল বঙ্গবাসিগণেরই করায়ত্ত হল। এই ভাবে কলকাতায় নবযুগের ভাবধারায় অভিষিক্ত একটি বাঙ্গালী শিক্ষিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সেই কারণে কলকাতাই হল উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী জাগৃতির পথিকৃৎ। আদিযুগের কংগ্রেসের মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে যে সম্মিলিত রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হল তার সর্ববিধ রাজনৈতিক তৎপরতার হৃৎকেন্দ্র হল কলকাতা। সর্বভারতীয় স্তরে যে চরমপন্থী রাজনীতি (Extremist politics) শৈশবেই সাম্রাজ্যবাদী মস্তিষ্ককে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে পেরেছিল তারও জন্মস্থান কলকাতা—কারণ অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন চরমপন্থী রাজনীতির পুরোভাগে—যদিও মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক ও পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এই নূতন রাজনীতির অপর দুই স্তম্ভ বলে বিবেচিত হতেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই ব্রিটিশ বিরোধিতার যে অগ্নিশিখা সারা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে রক্তিম আভা ছিটিয়ে দিল তার উৎসস্থলও ছিল কলকাতা।

সুতরাং অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীতে যে কলকাতা ছিল ইংরেজের শক্তির দুর্গ, তাদের

শ্রীবৃদ্ধির উৎসভূমি, তাদের স্নেহ-প্রীতি-উদ্যমের পরিচয়বাহী প্রাচ্যের 'হোম' (home) বিংশশতকের প্রভাতকালে সেই কলকাতার রক্তচক্ষু ইংরেজমানসে বিভীষিকার সঞ্চার করলো। ইংরেজরা বুঝতে পারলেন যে বাঙ্গালীকে খর্ব না করতে পারলে যেমন তাঁদের সিংহাসনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয় না তেমনি কলকাতাকে খর্ব করতে না পারলে বাঙ্গালীকে খর্ব করা যায় না। তাঁরা আরও বুঝলেন যে রাজধানী যদি কলকাতায় অবস্থিত থাকে তা হলে ভারতীয়গণের রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলনের হৃৎকেন্দ্রও হবে কলকাতা এবং তার প্রকৃতি হবে বলিষ্ঠ, গতি হবে দুর্বার।

দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে ইংরেজরা একটি পৃথক রাজভক্ত মুসলিম ব্লক গঠনের যে পরিকল্পনাকে অপরিহার্য মনে করেছিলেন তাকে উপযুক্তরূপে কাজে লাগাতে হলে ভারতবর্ষের মুসলিম প্রধান অঞ্চলের নিকটবর্তী কোন স্থানে রাজধানীর অবস্থিতি প্রয়োজন। পূর্বভারতে একমাত্র পূর্ববঙ্গ ছাড়া আর কোন মুসলিম প্রধান অঞ্চল নাই। মুসলিম রাজনীতির বিশিষ্ট নেতারা বেশীর ভাগই ছিলেন অবাঙ্গালী। পাঞ্জাব, তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত 'সিন্ধু' অঞ্চল, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, বেলুচ অঞ্চল এগুলি পরস্পর সন্নিহিত এক বিরাট মুসলিম এলাকা এবং আগ্রা অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ যেখানকার মুসলমানেরা মুসলিম রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন—সেই প্রদেশও পূর্বোক্ত মুসলিম অঞ্চলের সন্নিহিত। তা ছাড়া দিল্লী সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। সমগ্র মুসলিম যুগে মুসলমান সুলতান ও বাদশাহগণের সিংহাসন স্থাপিত ছিল দিল্লীতে; সেই কারণে মুসলিম মানসে দিল্লীর একটা ভাবালুতাসমৃদ্ধ মর্যাদা আছে বলে ইংরেজরা ধারণা করেছিলেন।

বঙ্গবিভাগ হয়ে যাওয়ার পরে ইংরেজ শাসকেরা লক্ষ্য করলেন—পৃথক মুসলিমপ্রধান প্রদেশ সৃষ্টি করতে দিয়ে তাঁরা পরোক্ষভাবে রাজধানীতে হিন্দুদের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য করেছেন, কারণ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত প্রদেশে হিন্দুরা প্রচুররূপে সংখ্যাগুরু। পৃথক পূর্ববঙ্গ মুসলিমপ্রধান প্রদেশ হলেও ঢাকা থেকে কলকাতায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার আয়াসসাধ্য। বরং বিহার ও উড়িষ্যাকে ছেঁটে ফেলে সমগ্র বঙ্গ একটি প্রদেশভুক্ত হলে কলকাতার রাজনীতির উপরে মুসলিম প্রভাবের চাপ সৃষ্টি অনেক সহজ কাজ হবে। অতএব ইংরেজরা দেখলেন খণ্ডিত বঙ্গের দুই অংশকে একত্র করে একটি প্রদেশ গঠন করলে সেটা অধিকতর রূপে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পোষক হবে।

অন্যদিকে বয়কট আন্দোলনের চাপে ইংরেজ বণিকদের ভারতীয় বাণিজ্য প্রচন্ড ভাবে মার খাচ্ছিল। তার ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভারতশাসননীতির বিরুদ্ধে ইংলন্ডের বণিক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তুষ্টি ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তের পিছনে এটাও অন্যতম কারণ। বঙ্গভঙ্গরহিত-করণের ব্যাপারে আরও একটি গুরুতর পরিস্থিতি ব্রিটিশ শাসকগণের মনের উপরে প্রবল চাপ সৃষ্টি করছিল। কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব ও তার প্রভাবের দ্রুত সম্প্রসারণ ইংরেজদের যতটা মস্তিষ্কপীড়া সৃষ্টি করেছিল, তার চেয়েও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায়, সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী এক দুর্বার শক্তির অভ্যুদয় দেখে। অনুশীলন সমিতির জন্ম হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। বঙ্গভঙ্গ যখন কার্যকরী হয় তখন পর্যন্ত বিপ্লবীদের আক্রমণাত্মক কর্মকান্ড ইংরেজের মনে উদ্বেগ

সৃষ্টির উপযোগী স্তরে উন্নীত হয় নাই। কিন্তু ১৯০৭ থেকে ১৯১১ এই পাঁচ বছরে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামিগণ তাঁদের দুঃসাহসিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে যেমন ভারতীয় জনচিত্তে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন, তেমনি শাসকগণের চিত্তেও ভীতি ও অসহায়তাবোধ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। ইতোমধ্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের ভারত বিষয়ক মন্ত্রী অর্থাৎ ভারত সচিব মর্লি পদত্যাগ করায় তাঁর স্থলে লর্ড ক্রু (Lord Crew) ভারতসচিব নিযুক্ত হন। এদিকে বড়লাট মিন্টোর কার্যকাল শেষ হয়, তিনি বিলাতে ফিরে যান। তাঁর স্থলে ভারতের বড়লাট পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge)। ভারতে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা ইংরাজ শাসককুলকে কতটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল তার পরিচয় মিলবে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের দ্বারা লিখিত একটি মন্তব্য থেকে, যা তিনি কার্যভার গ্রহণের অল্পদিন পরেই নথিভুক্ত করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখনীপ্রসূত ঐ মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্বৃত হল। লর্ড হার্ডিঞ্জ লেখেন ঃ "আমি ভারতে আসিবার পূর্বে শুনিতাম যে বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে সেখানে বিদ্রোহ খুব ব্যাপকভাবে বিরাজমান। ডাকাতি এবং পুলিশ কর্মচারী ও গুপ্তচরদিগের হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ সাধারণ আদালতের বিচারে অপরাধ প্রমাণ ও অপরাধীর শাস্তি দেওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় পৌছিয়া রাজনীতিক গোলমাল ও সন্ত্রাসবাদের যে পরিচয় পাইলাম তাহা ধারণাও করিতে পারি নাই। বিশেষত রাজদ্রোহের এত অভিযোগ আদালতে বিচারাধীন আছে যে এক বৎসরের মধ্যেও বিচার শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অধিকাংশ অভিযোগই এরূপ যে তাহা প্রমাণ করিয়া অভিযুক্তকে শাস্তি দিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এগুলি সবই ছোটলাট স্যার এডোয়ার্ড বেকার ও তাঁহার আইনজ্ঞ পরামর্শদাতাদের অবিমৃশ্যকারিতার (short sightedness) ফল। ইহার ফলে গভর্নমেন্টের প্রতিপত্তি কমিয়াছে এবং অরাজকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।"[৮]

বঙ্গদেশে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা পূর্বোক্ত পাঁচ বছরে (১৯০৬ থেকে ১৯১১) যেরূপ বিস্ময়কর বেগে প্রবর্দ্ধিত হয়েছিল, তা যে ইংরেজদের শিরঃপীড়া উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গীয় শাখা ঢাকা অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে অল্পদিনের মধ্যেই এই সমিতির সংগঠন বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এর ৫০০ শাখা-সমিতি কর্মতৎপর হয়ে ওঠে।[৯]

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে ডিসেম্বর গোয়ালন্দ ঘাটে ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেন সাহেব গুলিবিদ্ধ হন। তিনি তার পরেই চিরতরে ভারতের মাটি পরিত্যাগ করে বিলাতে প্রস্থান করেন এবং তিনি আদৌ জীবিত অবস্থায় বিলাতে পৌছেছিলেন কিনা তাও জানা যায় নি। ওই বছরেই মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে ছোটলাটের গাড়ী উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারায়ণগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দমা স্থাপিত হয়, কিন্তু সাক্ষীর অভাবে মোকর্দমা ফেঁসে যায়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ২১ টি বৈপ্লবিক অপরাধের তালিকা দেওয়া আছে সিডিসন কমিটির রিপোর্টে। মজঃফরপুরের হত্যাকান্ড এবং আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দমা ১৯০৮ সালেরই ঘটনা। নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যা করা হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা

সেপ্টেম্বর। ৭ই নভেম্বর ওভারটুন হলে ছোটলাট স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের উপরে গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। এই বছরে অনুষ্ঠিত পাঁচটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের মধ্যে নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা ছাড়া অপর একটিরও অপরাধী পুলিশ ধরতে পারেনি। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ১৬টি বৈপ্লবিক অপরাধ সংঘটিত হয় বলে সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ৯টি বৈপ্লবিক অপরাধের মধ্যে দুটি ঘটনা ছাড়া আর কোন ঘটনার অপরাধীর হদিস পাওয়া যায়নি। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ১৬টি বৈপ্লবিক অপরাধ সিডিসন কমিটি তালিকাভুক্ত করেছেন। তার মধ্যে মাত্র সারাচর ডাকাতির একজন আসামী ও সোনারং ডাকপিওন প্রহার মোকর্দমার আসামী পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পেরেছিল।

ইংরেজদের মনে এই আশঙ্কা জন্মেছিল যে বিপ্লবী রাজনীতির কালো মেঘ যে ভাবে দ্রুত গতিতে ভারতবর্ষের পূর্বাকাশের ক্রোড়ে জড়ো হচ্ছিল, তার প্রতিরোধের জন্য কোন কার্যকরী উপায় অবলম্বন না করতে পারলে অল্পদিনের মধ্যেই সেই জলদপুঞ্জ সারা ভারতের আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সুগঠিত পুলিশ বাহিনীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও বৈপ্লবিক অপরাধসমূহের অনুষ্ঠাতাদের সম্পর্কে কোন সংবাদ সংগ্রহ করা যায়নি। এতে শাসকমন্ডলীর আতঙ্ক দ্বিগুণিত হয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন সাধারণভাবে দেশের অধিবাসীবৃন্দ বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বিদেশী শাসকগণের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন। অতএব, এমন কিছু করা প্রয়োজন যা ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজের সদিচ্ছার পরিচয় বহন করবে এবং বঙ্গবিভাজনের ফলে জনমনে যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের পরিব্যাপ্তি ঘটেছে তা অপসৃত হবে। ইংরেজরা মনে করেছিলেন বঙ্গবিভাজন বাতিল করে খন্ডিত বঙ্গকে একত্র করে দিলে বঙ্গদেশে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা স্তিমিত হবে এবং বাঙ্গালীদের মনে ইংরেজশাসনের প্রতি আস্থা ফিরে আসবে এবং বৈপ্লবিক প্রবণতা দমনের ব্যাপারে অন্তত একশ্রেণীর বাঙ্গালীর সহযোগিতা অর্জন সম্ভবপর হবে। অতএব, ভারতসম্রাটের ঘোষণার দ্বারা ইংরেজরা এক ঢিলে দুই পাখী শিকারের ব্যবস্থা করলেন। নূতন ব্যবস্থার ফলে এদিকে যেমন বাঙ্গালীমানসের ব্যাপক অসন্তোষকে উল্লেখযোগ্যরূপে অপসৃত করা হল, অন্ততঃ নরমপন্থী বাঙ্গালী রাজনীতিকদের কৃতজ্ঞতা ও সহযোগিতা অর্জনের পথ উন্মুক্ত করা হল, অন্যদিকে তেমনি তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশ থেকে বিহার ও উড়িষ্যার বিচ্ছিন্নকরণ ও রাজধানীর স্থানান্তরীকরণের মাধ্যমে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাঙ্গালীদের প্রাধান্য খর্ব করবার ব্যবস্থাও সম্পন্ন করা গেল। ইংরেজরা ভেবেছিলেন এর ফলে বৈপ্লবিক তৎপরতাও স্থিমিত হবে, কিন্তু তাঁদের সে আশা সফল হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ঘোষণা দেশের মধ্যে স্বস্তি ও সন্তোষের পরিবেশ ফিরিয়ে আনে। কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হয়। মডারেটগণ সারা বাংলার রাজনীতিতে তাঁদের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে অতিশয় আনন্দিত হন। চরমপন্থিগণ ঐ ঘোষণাকে জাতীয় প্রতিরোধ শক্তির বিজয়রূপে অভিনন্দিত করেন। অপরপক্ষে মুসলিম লীগপন্থী নেতৃবর্গ এই ঘোষণার আকস্মিক আঘাতে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাঁরা অনুভব করেন যে ব্রিটিশ দাক্ষিণ্যের মাটি তাদের পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা পূর্বোক্ত ঘোষণার ফলে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। ঘোষণার অল্পদিন পরেই ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁর সভাপতিত্বে কলকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম

লীগের বার্ষিক অধিবেশন হয়। নবাব সাহেব ঐ সমাবেশেই ঘোষণা করেন যে তিনি রাজনীতি থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করছেন। এর অল্পদিন পরেই নবাব সাহেবের মৃত্যু ঘটে।

খণ্ডিত বঙ্গের পুনরায় একত্রীকরণের ঘোষণায় কংগ্রেসপন্থী রাজনীতিকগণ আনন্দে আত্মহারা হন এবং সেই আনন্দের জোয়ারের মধ্যে কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণের কথা তাঁদের মনে এলো না। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন প্রকারের। বিপ্লবীরা বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সিদ্ধান্তকে জাতীয় প্রতিরোধশক্তি বিজয়ের পরিচিতিবাহী বলে স্বীকার করে নিয়েও তা নিয়ে কংগ্রসপন্থী রাজনীতিকগণের অতিশয়িত মাতামাতিতে বিরক্তি বোধ করলেন। শুধু বঙ্গভঙ্গ রদ করেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণের প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করা যাবে না—শাসকমন্ডলীকে ও দেশবাসীকে একথা হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে তাঁরা কোন একটি তাৎপর্যপূর্ণ কার্য্য অনুষ্ঠানের সংকল্প গ্রহণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে ১১ই ডিসেম্বর ১৯১১ সারা ভারতে উৎসবের দিন বলে ধার্য করা হয়। ঐদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজকীয় ঘোষণা উচ্চরিত হওয়ার কথা। অনুশীলন সমিতির গোপন বৈঠকে স্থির হয় ঐদিন রাজকীয় উৎসবের জাঁকজমকের মধ্যেই একজন অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে পূর্বোক্তরূপ প্রতিবাদ জানানো হবে। ঐ তারিখে সন্ধ্যার সময় বরিশাল শহরে দীপালোকসজ্জিত ও উৎসরমুখর রাজপথের উপরে অত্যাচারী পুলিশ ইনেস্‌পেক্টর মনমোহন ঘোষকে হত্যা করা হয়। এই কার্য সম্পন্ন করেন বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী(পরবর্তী কালে যিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে 'মহারাজ' নামে খ্যাত হয়েছিলেন)। পুলিশ হত্যাকারীর কোন হদিস পায়নি।[১০]

বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ফলে লীগপন্থীদের ব্রিটিশভক্তি এবং ব্রিটিশের উপরে একান্ত নির্ভরতার মনোভাবের উপরে বিষম ধাক্কা লাগে। প্রায় সমকালে ইউরোপীয় ভূখন্ডে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার প্রভাব ভারতীয় মুসলিম মানসে ব্রিটিশের প্রতি বিরূপতাকে তীব্রতর করে তোলে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বলকান যুদ্ধ (Balkan War) সংঘটিত হয়। বলকান যুদ্ধের ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তুর্কীর সুলতান মুসলিম জগতের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু বা 'খালিফা' হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃত ছিলেন। বলকান যুদ্ধের ফলে তুর্কীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিস্তর এলাকা অপরাপর ইউরোপীয় রাষ্ট্রের দখলে চলে যায়। এই সুযোগে ইতালি তুর্কী-সাম্রাজ্যভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র 'ত্রিপলি' বলপূর্বক দখল করে নেয়। এই ব্যাপারে গ্রেটব্রিটেনের ভূমিকা তুরস্কের অনুকূল ছিল না। বস্তুত ব্রিটেন তুর্কীসাম্রাজ্যের ব্যাপক অঙ্গ-চ্ছেদে পরোক্ষ সহায়তাই দান করেছিল। এতে ভারতীয় মুসলমানগণের হৃদয়স্থিত ব্রিটিশ ভক্তির বনিয়াদে প্রচন্ড ধাক্কা লাগলো। বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখেছেন ঃ

ইউরোপের আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমলীগ রাজনীতির গতিভঙ্গীর পরিবর্তন।

"Events in Europe showed however friendly England might appear towards Muslim separatist ambitions in India, her attitude to Turkey was particularly hostile. She worked for the dismemberment of Turkish Empire as assiduously as she flirted with the Indian Muslims. ...Inside the country the communalist elements got a rebuff."[১১]

"Naturally the League which was founded upon and which throve under British blessings and patronage, felt weak and discomfitted at what appeared to it to be a withdrawal of British blessing, apparently owing to what the British feared to be the pan-Islamic tendency of the muslims which made them express sympathy with Turkey and send a medical mission to that country in 1912."[১২]

তুরস্কে মেডিক্যাল মিশন নিয়ে গিয়েছিলেন কংগ্রেসনেতা ডঃ আনসারী। তুর্কীর মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশের প্রতিকূল আচরণ ভারতীয় মুসলমানদের মনে ব্রিটিশবিরোধিতা উদ্দীপিত করলো। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ভাষায় ঃ

"The policy followed by Great Britain towards Turkey during the Tripoli and Balkan wars showed the British in their true colours and demonstrated to the Indian Muslims the hollowness and insincerity of British professions of friendship. On the other hand Moslem hearts were touched by the expressions of brotherly sympathy in the Indian nationalist press for them in their grief over the treatment meted out to Turkey by the European nations."[১৩]

একদিকে ইস্‌লামিক শক্তি ও সংস্কৃতির পীঠস্থান তুর্কীর বিপর্যয়ের দিনে গ্রেটব্রিটেনের তুরস্কবিরোধী ভূমিকা, অন্যদিকে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মহলে ও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহে তুরস্কের বিপর্যয়ের জন্য তার প্রতি ক্রমাগতরূপ সহানুভূতি প্রকাশ ও ব্রিটিশের প্রতি ধিক্কার বর্ষণ লীগপন্থী মুসলিম নেতৃবর্গের মনোভঙ্গীর সাময়িক পরিবর্তন আনয়ন করে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌ নগরীতে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগ সম্মেলনে মুসলিমলীগ নেতৃবর্গের মানসিক পালাবদলের পরিচয় পাওয়া গেল। ঐ সম্মেলনে লীগের উদ্দেশ্যবিষয়ক নূতন ঘোষণাপত্র রচিত হয়। এই নূতন উদ্দেশ্যপত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে একথাও বলা হয় যে "ভারতীয়গণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য (national unity) প্রবর্দ্ধিত করে এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের সাথে একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থেকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ধারাবাহিক ভাবে বর্তমান শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধন লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য।" দেখা যাচ্ছে উক্তরূপ ঘোষণার দ্বারা লীগের উদ্দেশ্য (object) জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষিত উদ্দেশ্যের কাছাকাছি এসে যায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মান পক্ষে যোগদান করায় মুসলিম জননায়কগণের ব্রিটিশ বিরোধিতা তীব্রতর হয়। ১৯১৫ ও ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে একই শহরে, একই তারিখে এবং একই স্থানে কংগ্রেস ও মুললিম লীগ— উভয়ের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেসের ডেলিগেটগণ 'দর্শক' হিসাবে লীগ সম্মেলনে যোগদান করেন ও লীগের ডেলিগেটগণ 'দর্শক' হিসাবে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা যে শুভ ও অভিনন্দনযোগ্য ব্যাপার সে বিষয়ে দ্বৈতমতের অবকাশ নাই। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। লীগের মনোভঙ্গীর যে পরিবর্তনমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তা ছিল নিতান্তই সাময়িক। একটু লক্ষ্য

করলেই দেখা যাবে, লীগনেতারা যে কংগ্রেসের সান্নিধ্যলাভে আগ্রহী হয়েছিলেন ও স্বাধীনতার দাবির দিকে ঝুঁকেছিলেন তার প্রেরণার উৎস ছিল তুরস্কের মুসলমানগণের সহিত ভারতীয় মুসলমানগণের ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ। সেখানে স্বদেশানুরাগের ভূমিকা ছিল গৌণ। অধিকাংশ মুসলমান নেতা তুরস্ক, ইরান, আরব ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের প্রতি যে পরিমাণে ভ্রাতৃত্ববোধ অন্তরে পোষণ করতেন, ভারতবাসী হিন্দু, শিখ বা খ্রিস্টানদের প্রতি তত্তুল্য আত্মীয়তাবোধ তাঁদের অন্তরে সঞ্চিত ছিল না। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ইস্‌লামিক রাষ্ট্র তুরস্কের মর্যাদাহানির সহায়তা করেছেন বলে তাঁদের মনে সাময়িক ভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা উদগত হয়েছিল এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী মহল তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিতে সোচ্চার হয়েছিলেন বলে মুসলিম মানসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সাময়িক অনুকূলতা জেগেছিল। এর অল্প পরেই প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয় এবং ঐ যুদ্ধে তুরস্ক ইংরেজের বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে। তার ফলে ভারতীয় মুসলিম মানসে ইংরেজ প্রতিকূলতা তীব্রতর হয়। এই যুদ্ধের পরিণতিতে খেলাফৎ সমস্যা উদ্ভূত হয়। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে। সুতরাং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুস্তাফা কামাল পাশা কর্তৃক তুরস্কের প্রশাসনিক নেতৃত্ব গ্রহণ ও খেলাফতের উচ্ছেদ ঘোষণা—এই প্রায় একাদশ বৎসরকাল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখতে পেরেছিল।

সূত্রনির্দেশ

১। Dr. Rajendra Prasad, *India Divided*, p 124.

২। Morley's letter to Minto quoted by Dr. Rajendra Prasad in *India Divided*, p.111-112.

৩। Dr. Rajendra Prasad, *India Divided*, p 118.

৪। Tofail Ahmad, Roshan Mustaquebal—Quoted in *India Divided*, p.113

৫। Dr. Amalesh Tripathi, *The Extremist Challenge*, p. 167.

৬। Dr. Rajendra Prasad, *India Divided*, p 116.

৭। Benoyendranath Raychoudhury, *Muslim Politics in India*, p 20.

৮। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৭.

৯। *Sedition Committee Report*, Para 29.

১০। *Sedition Committee Report*, Para 52.

১১। Benoyendranath Raychoudhury, *Muslim Politics in India*, p.20

১২। *Ibid*

১৩। Dr. Rajendra Prasad, *India Divided*, p 117.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিশ্বযুদ্ধ, লক্ষ্ণৌ চুক্তি ও মন্টেগু চেম্সফোর্ড রিফর্মস্

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগষ্ট গ্রেটব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রায় সমগ্র ইউরোপ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অক্টোবর মাসের শেষদিকে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। এশিয়াখন্ডেও যুদ্ধের প্রকোপ পরিব্যাপ্ত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ইংরেজদের মিত্রশক্তি হিসাবে যুদ্ধে যোগদান করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহের পর্যালোচনা অথবা তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান বর্তমান গ্রন্থের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে ভারতবর্ষ যেহেতু তৎকালে গ্রেটব্রিটেনের শাসনাধীন ছিল সেই হেতু তৎকালীন ভারত সরকার ভারতবাসীগণের অভিমত যাচাই-এর কোন চেষ্টা না করেই বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের সহায়করূপে ভারতকেও যুদ্ধে লিপ্ত করেন এবং ইংরেজদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকেও জার্মানী ও তৎপক্ষীয় শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

ভারতবর্ষের পক্ষে এভাবে যুদ্ধেলিপ্ত হওয়া ভারতবর্ষের প্রচন্ড ক্ষতি ও ভারতবাসীর অপরিসীম দুর্দশার কারণ হয়। ভারতবর্ষ তার তিনলক্ষ সন্তানকে 'সাম্রাজ্যরক্ষার' সদুদ্দেশ্যে (?) সৈনিকরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করে এবং এই সৈন্যদলের সকল ব্যয়ভার ভারতকেই বহন করতে হয়। এর মধ্যে একলক্ষ ভারতীয় সৈনিক ইংরেজদের জয় অর্জনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বলি দেন। এ ছাড়া ধনী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সকলের পকেট কেটে দশকোটি পাউন্ড (অর্থাৎ ১৩০ কোটি টাকা) 'স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান' রূপে ভারতের পক্ষ থেকে গ্রেটব্রিটেনকে উপহার দেওয়া হয়। 'সাম্রাজ্যরক্ষার' স্বার্থে ব্যাপকভাবে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়, খাদ্যদ্রব্য ও গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর মূল্য প্রাক্-যুদ্ধকালীন মূল্যমানের অনুপাতে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়, দরিদ্র গৃহস্থের অকিঞ্চিৎকর আহারও দুইবেলা জোটানো অনেকেরই সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। দরিদ্রের কটিবস্ত্র বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়, ধুতির বদলে হাফপ্যান্ট পরিধান অপরিহার্য হয়ে ওঠে, নারীদের লজ্জানিবারণের উপযোগী দেহাবরণ দুষ্প্রাপ্য হয়, অনেক গৃহস্থবধূর পক্ষে লোকচক্ষুর সম্মুখবর্তী হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। সারাদেশের উপরে এক শ্বাসরোধকারী বিভীষিকা নেমে আসে। যুদ্ধের ফলে ভারতের জাতীয় ঋণ শতকরা তেত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রে দুই বিপরীত কোণে দুই পরস্পর বিরোধী তৎপরতা প্রবল হয়ে ওঠে। জাতীয় কংগ্রেস তখন ইংরেজভক্ত মডারেট রাজনীতিকদের কবলিত। মডারেট রাজনীতিকগণ চূড়ান্ত রাজভক্তির পরিচয় দেওয়ার আগ্রহে

পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় মত্ত হন। চরমপন্থী গোষ্ঠী তৎকালে ছিলেন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত। তাঁরা অনেকে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হোমরুল লীগের সাথে যুক্ত হয়ে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে থাকেন। অপরদিকে বিপ্লববাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য এক বিস্ময়কর ও দুঃসাহসিক প্রয়াস সুরু করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে একদিকে যেমন বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা, দেশপ্রেম, শৌর্য, সাহসিকতা ও অকুতোভয় আত্মবিসর্জনের উজ্জ্বল স্বাক্ষরে ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ও গৌরবসমৃদ্ধ অধ্যায় রচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মডারেট কংগ্রেসনেতাদের অতিশয়িত প্রভুভক্তিপ্রণোদিত দাস্যতা বিজড়িত বাগ্‌বিস্তার বিশ্বজনের সমক্ষে ভারতীয় চরিত্রের হীনতাকে প্রকট করেছে। এ সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন ঃ

"যুদ্ধের সময় কংগ্রেসের নরমপন্থীদল রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে ১৯১৪ ও ১৯১৫ সনের দুটি বাঙ্গালী কংগ্রেস সভাপতির বক্তৃতা 'হাস্যকর' বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।"

ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৯১৪) বলিলেন ঃ

"সাম্রাজ্যের অন্য সকলের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই চরম সংকটের সময়ে ভারতের সকল প্রদেশ ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের কেবল একমাত্র চিন্তা—আমরা যুদ্ধ করিয়া আমাদের (?) সাম্রাজ্য রক্ষা করিব।" ১৯১৫ সনের সভাপতি সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বলিলেন 'আজ ভারতের সর্বত্র, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যে রাজভক্তির প্রবল বন্যা বহিতেছে। .....আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, এই নিদারুণ সঙ্কটের সময় আমরা গভর্নমেন্টকে কোনরূপে বিব্রত করিতে চাই না। আমার দেশবাসীরা যে ভাবে বিনাদ্বিধায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সরকারকে যুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছে তাহার জন্য আমরা কোন অনুগ্রহ বা সুবিধার দাবি করিব না।" [১]

এই কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যে ভাষণ দেন তার সম্পর্কে ডঃ সীতারামাইয়া মন্তব্য করেছেন ঃ

"Sir S.P. Sinha made from the nationalist point of view, a most reactionary speech in which he described India as a patient whose fractured limbs were in splints. According to his conception the need was a reasoned ideal of India's future, such as will satisfy the aspirations and ambitions of the rising generation of India, and at the same time will meet the approval of those to whom India's destinies are committed."[২]

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দেই বিপ্লববাদিগণের কর্মতৎপরতা ব্যাপক বিদ্রোহের আকার ধারণ করে ও তার ফলে ব্রিটিশ জাতির হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বিপ্লবীদের দমন করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার '১৯১৫ সালের ভারত রক্ষা আইন' নামক একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন যা বিপ্লব দমনের ছদ্মনামে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী তরুণদের উপরে পৈশাচিক নির্যাতনের ঘৃণিত রেকর্ড সৃষ্টি করেছে ও তার ফলে জাতীয়তাবাদী মহলে 'কালাকানুন' বা Black Act আখ্যায়

চিহ্নিত হয়েছে। মডারেট রাজনীতিকগণ ইংরেজ তোষণের আগ্রহে এই Black Act-এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে ভারতবাসীর নামের উপরে অনপনেয় কলঙ্ক লেপন করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের বল্কান যুদ্ধের সময়ে তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙচুর ঘটানোর ব্যাপার মুসলিম মানসে ব্রিটিশ বিরোধিতার বীজ বপন করে এবং তার ফলে ঐ সময় থেকে একদল মুসলিম জননায়ক এবং মুসলিম লীগ জাতীয় কংগ্রেসের সান্নিধ্যে আসেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব পুষ্ট হতে থাকে।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করায় ভারতীয় মুসলমান রাজনীতিকগণ এক জটিল অবস্থার সম্মুখীন হন। মুসলিম রাজনীতি প্রথম থেকেই অকুণ্ঠ ইংরেজানুগত্যের নিরাপদ পথে অগ্রসর হতে থাকে। শ্বেতাঙ্গসমাজ ও সরকারের প্ররোচনা ও সহায়তার দ্বারা পুষ্ট সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম রাজনীতির মূলমন্ত্র হল loyalty বা নির্ভেজাল রাজভক্তি। মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য প্রকরণের প্রথম সর্তই ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। বল্কান যুদ্ধ এবং তুর্কীসাম্রাজ্যের বিপর্যয় যদিও ভারতের কোন জাতীয় সমস্যার সাথে কোন প্রকারে যুক্ত ছিল না, তথাপি ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ ও বিশ্ব ইস্‌লামিক ভ্রাতৃত্ববোধের ক্রোড়ে লালিত মুসলিম মানস তুরস্কের বিপর্যয়কে ইস্‌লামিক শক্তি খর্বকরণের উদ্দেশ্যপ্রসূত খ্রিস্টানী আক্রমণরূপেই গ্রহণ করে এবং ঐ ব্যাপারে গ্রেট ব্রিটেনের যে ভূমিকা ছিল মুসলমানগণ তাকে ইস্‌লামবিরোধী ভূমিকা বলেই মনে করতে থাকেন। এর ফলে মুসলিম রাজনীতিক মঞ্চের কতকাংশে ব্রিটিশবিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং তারই ফলস্বরূপ কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের পূর্বতন সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষভুক্ত হয়ে বিশ্বযুদ্ধের সরিকানায় অবতীর্ণ হলে সেই নূতন পরিস্থিতি ভারতীয় মুসলমানগণের সমক্ষে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে ভারত সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে ভারতের জনবল ও ধনবল ঐ যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে নিয়োজিত হতে চলেছে। মুসলমানেরা যদি ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের নীতিতে অবিচল থাকেন তা হলে তাঁদের সন্তানদের সৈন্যদলে ভর্তি করতে হবে ইংরেজদের সাহায্যের জন্য। ইংরেজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ওয়ার ফান্ডে চাঁদা দিতে হবে, যুদ্ধজয়ের জন্য ইংরেজ কর্তৃক ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যাপারে সহায়তা দান করতেও মুসলমানেরা বাধ্য হবেন। ভারতীয় সৈন্যদলে পূর্ব থেকেই অনেক মুসলমান সৈনিক ও অফিসার ছিলেন। এদেরকে ইংরেজরা অবশ্যই ওয়ার ফ্রন্টে নিয়ে যাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য। আর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার অর্থই হবে তুরস্কের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা। রণক্ষেত্রে কি করে ভারতীয় মুসলিম সৈনিক তুর্কীর পক্ষে যুদ্ধরত মুসলিম 'বেরাদরের' বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করবে! ইংরেজের স্বার্থে কি করে ভারতীয় মুসলমানেরা তুর্কী মুসলমানকে হত্যা করবে?

মুসলিম মানসে বিশ্ব-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

তুরস্ক ও ইস্‌লামিক দুনিয়ার ভবিষ্যতের প্রশ্ন নিয়ে ভারতীয় মুসলমানগণের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে ও ব্রিটিশবিরোধী উত্তেজনা দানা বাঁধছে একথা বুঝতে পেরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের

পক্ষ থেকে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল যে যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় অর্জিত হলে তুরস্কের প্রতি কোন 'অবিচার' করা হবে না এবং মুসলমানগণের পবিত্র ধর্মস্থানগুলির মর্যাদাহানিকর কোন কার্য করা হবে না। "British spokesmen had given assurances that Turkey would be *fairly treated* after the war and nothing would be done which would adversely affect the Muslim Holy places in Arabia and Mesopotamia."[৩]

এই ঘোষণার মধ্যে ভাষার যথেষ্ট অস্পষ্টতা ছিল। সুতরাং সাধারণভাবে মুসলিম নেতারা সন্তুষ্ট হলেন না। হিন্দুদের মত উচ্চবিত্ত মুসলমানদের মধ্যেও নৈষ্ঠিক ইংরেজভক্তের একটি গোষ্ঠী ছিল। এই গোষ্ঠিভুক্ত নেতারা পূর্ববৎ ইংরেজ তোষণে রত থাকলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের অনেক প্রবীণ নেতা উপলব্ধি করলেন যে, স্বায়ত্বশাসন অর্জনের লড়াইতে হিন্দুদের সাথে সহযোগিতা করে ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের প্রয়াসই ইসলামের স্বার্থের পক্ষে কল্যাণদায়ক হবে। তার ফলে কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। এদিকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অল্পকালের মধ্যেই সেখ্-উল-হিন্দ মৌলানা মহম্মদ হাসান, মৌলানা হোসেন আহম্মদ নাদ্‌ভি, মৌলভী আজিজ ওল প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে ভারতের বাইরে মাল্টায় অন্তরীণ করে রাখা হল। মৌলানা মহম্মদ আলি, তাঁর ভ্রাতা মৌলানা শওকত আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মৌলানা হজরত মোহানিকেও অন্তরীণ করা হল।

ইতঃপূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই দুই সংস্থারই বার্ষিক অধিবেশন একই তারিখে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসের গৃহীত ১৯ নং প্রস্তাবটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাবের দ্বারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ভারতের জন্য একটি সর্বসম্মত স্বায়ত্বশাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে উদ্যোগী হওয়ার জন্য। প্রস্তাবে খুব নরম সুরে যে দাবিগুলি করা হয় সেগুলি স্বাধীনতার দাবি নয়। ইংরাজের কাছে প্রার্থনা করা হয়ঃ "Substantial measures of reform towards self-Government so as to secure for the people an effective control over the Government by introduction of provincial autonomy, expansion and reform of Legislative Councils where they existed and their establishment in provinces where they did not exist, the reconstruction of various Executive Councils, and their establishment in provinces where they did not exist, the reform or abolition of India Council, and a liberal measure of local self-government."[৪]

কংগ্রেস যখন অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে 'থোড়া সা রিফর্মস্ দেলায় দে রাম' বলে ইংরেজের কাছে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরলেন, তার মাত্র কয়েক মাস আগে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে আয়োজিত সর্বভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের দুর্ধর্ষ পরিকল্পনা জনৈক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়—যার পরিণামে ইংরেজরা বিশেষ আইন জারী করে বিশেষ ধরনের বিচার সংস্থা গঠন করে ৩৮ জন বিপ্লবীকে ফাঁসি দেয়, ৫৮ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ডে দন্ডিত করে এবং আরও ৫৮ জনকে দেয় দীর্ঘমেয়াদী দ্বীপান্তর দন্ড। সারা

দেশ দানবীয় অত্যাচারের কবলে পড়ে অসহায় কণ্ঠে হাহাকার করতে থাকে এবং এই ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দেই 'ভারতরক্ষা আইন' নাম দিয়ে, বিনা বিচারে যে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক করবার ব্যবস্থাসহ আইন প্রণয়ন করে শত শত যুবকের জীবন বিপর্যস্ত করে দেয়!!

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক আলোচনাক্রমে উভয় সংস্থার সভ্যদের নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতার মধ্যে ভারতবর্ষের স্বায়ত্বশাসন (Self-Government within British Empire) বিষয়ক পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি যুক্ত কমিটি (Joint Committee) গঠিত হয়। এই কমিটি এক সর্বসম্মত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক যুক্ত সভায় ঐ পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে লক্ষ্ণৌ শহরে একই সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন বসে। কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত মডারেট নেতা, ফরিদপুরের উকীল অম্বিকাচরণ মজুমদার। ইতঃপূর্বে আর কোন জেলা আদালতের উকীল কংগ্রেস সভাপতি পদে বৃত হওয়ার মত উচ্চ সম্মান লাভ করেন নাই।

কংগ্রেস রাজনীতির ইতিহাসে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস দুই দিক দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিবেশনের প্রাক্-কালে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে এক সমঝোতা ঘটে যার ফলে দীর্ঘ নয় বৎসর কংগ্রেসের বাহিরে অবস্থানের পর চরমপন্থীগোষ্ঠী ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই চরমপন্থিগণ কংগ্রেস রাজনীতিতে প্রাধান্য অর্জন করেন, এবং ১৯২০ সালের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় মডারেটগণ চিরতরে কংগ্রেস পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কংগ্রেস ও লীগের যৌথ সম্মতির বনিয়াদে স্বায়ত্বশাসনের পরিকল্পনাপ্রণয়ন। এই পরিকল্পনাই 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে পরিচিত হয়েছে।

সুযোগ সুবিধা ও লক্ষ্ণৌ চুক্তির বিবরণ

লক্ষ্ণৌ চুক্তির দুই অংশ। একটি অংশ ইংরেজের কাছে যে সকল রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন করা হবে তৎসম্পর্কীয়। অপরাংশ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দাবিকৃত রাজনৈতিক অধিকারসমূহের সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা সম্পর্কিত।

চুক্তির মুখবন্ধে সুপারিশ করা হয় যে, 'মহামান্য ভারতসম্রাট যেন অবিলম্বে এই প্রকার ঘোষণা (proclamation) প্রচার করেন যে, ভারতবর্ষকে অনতিবিলম্বে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করাই ব্রিটিশ নীতির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়' (it is the aim and intention of British policy to confer self-Government on India at an early date)। কি প্রকার স্বায়ত্বশাসন ভারতবাসী আকাঙ্ক্ষা করে সে সম্পর্কে চুক্তির মুখবন্ধে বলা হয় ঃ

(i) "That in the reconstruction of the Empire, India shall be lifted towards *Self-Government* by granting the reforms contained in the scheme prepared by the All India Congress Committee, in concert with the Reform Committee appointed by the All India Muslim League. (ii) That in the reconstruction of the Empire India shall be lifted from the position of a dependency."

চুক্তির যে অংশ রাজনৈতিক অধিকারসমূহের সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা বিষয়ক সেই অংশের প্রধান শর্তগুলি, যথা ঃ

(১) ভবিষ্যতে যে সকল প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হবে সেই সব কাউন্সিলে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হবে—যথাসম্ভব ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দ্বারা।

(২) কাউন্সিলসমূহে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হবেন পৃথক নির্বাচনের পদ্ধতি অনুসারে (অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে মুসলিম প্রতিনিধির নির্বাচনে কেবলমাত্র মুসলমান ভোটারগণই ভোট দিতে পারবেন, সেই পদ্ধতি অনুসারে)।

(৩) প্রধান প্রধান প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক আইনসভায় নিম্নলিখিত হারে মুসলিম আসন নির্দিষ্ট থাকবে ঃ পাঞ্জাব—নির্বাচিত ভারতীয় সভ্যগণের অর্দ্ধাংশ; বাংলা—ঐ শতকরা ৪০ ভাগ; আগ্রা অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ—ঐ শতকরা ৩০ ভাগ; বোম্বাই—মোট নির্বাচিত ভারতীয় সভ্যগণের একতৃতীয়াংশ; বিহার ঐ শতকরা ২৫ ভাগ; মধ্যপ্রদেশ ঐ শতকরা ১৫ ভাগ; মাদ্রাজ ঐ শতকরা ১৫ ভাগ।

[উক্তরূপ বিভাগ বন্টনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে উক্তরূপ সংরক্ষিত মুসলিম আসনগুলি বাদ দিয়ে এবং ইউরোপীয়ান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে 'ওয়েটেজ' দান করে ও বিশেষ নির্বাচকমন্ডলীসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন সংখ্যা বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে সেইটুকুই পাবেন হিন্দুসম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দুরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রাদেশিক কাউন্সিলে কার্যতঃ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত হবেন।]

(৪) কেন্দ্রীয় আইনসভা কিংবা কোন প্রাদেশিক আইনসভায় এমন কোন আইনের খসড়া (Bill) , অথবা তার কোন ধারা (Clause), বা প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না যার সম্পর্কে কোন এক সম্প্রদায়ের সভ্যগণের তিনচতুর্থাংশ সদস্য আপত্তি উথাপন করেন। [অর্থাৎ কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা যদি হয় ১০০ এবং তার মধ্যে মুসলিম সদস্য থাকেন ১৬ জন আর ইউরোপীয়ান ৮ জন তাহলে ১২ জন মুসলিম সদস্য কিংবা ৬ জন ইউরোপীয়ান সদস্য আপত্তি করলেই অপর ৮৮ জন বা ৯৪ জন সদস্যের মতামত communal veto power-এর ফলে অকেজো হয়ে যাবে]

(৫) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বালগঙ্গাধর তিলক সহ কংগ্রেসের চরমপন্থী গোষ্ঠীও পূর্বোক্তরূপ চুক্তি সমর্থন করেন।

প্রকৃতপক্ষে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আলিগড়ের এম্.এ.ও. কলেজের অধ্যক্ষ আর্চিবল্ডের প্ররোচনায় মুসলিম অভিজাতশ্রেণী বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে যে সকল দাবি উথাপন করেছিলেন তার মধ্যে প্রধান দুইটি দাবি ছিল ঃ (১) ভবিষ্যৎ আইনসভাসমূহে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর (Seperate electorate-এর) প্রবর্তন ও (২) মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য তাঁদের জনসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় আইনসভাসমূহে মুসলিম আসন সংরক্ষণ। দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসনেতৃবর্গ ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে এই

দুটি অযৌক্তিক দাবিই স্বীকার করে নিলেন। এর মধ্যে সংখ্যার প্রশ্নটি তত গুরুত্বপূর্ণ হত না যদি একই সাথে পৃথক নির্বাচন প্রথাকে স্বীকৃতি প্রদান না করা হত। কারণ, জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন যদি হিন্দু-মুসলমান ভোটাদাতাগণের মিলিত ভোটের উপরে নির্ভরশীল হয়, তা হলে কোন সম্প্রদায় কতগুলি আসন লাভ করলেন সে প্রশ্ন গুরুত্বহীন হয়ে যায়। যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত নির্বাচন প্রার্থীকে নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভের জন্য হিন্দু ভোটের উপরেও নির্ভর করতে হচ্ছে, এবং হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নির্বাচন প্রার্থীকেও অনুরূপভাবে মুসলিম ভোটের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে, সেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুর্বুদ্ধি প্রশ্রয় লাভ করতে পারে না এবং কোন নির্বাচিত প্রার্থীর পক্ষে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন সম্ভবপর হয় না। নির্বাচনী সংগ্রামেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রচার লাভজনক হয় না। নির্বাচিত প্রার্থী হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন তাঁকে সর্বদা মনে রাখতে হয় যে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনমন্ডলীর প্রতিনিধি। যৌথ নির্বাচন প্রথা জাতীয় ঐক্যবোধকে পুষ্ট করে; সুতরাং যৌথ নির্বাচন প্রথার অধীনে কোন সম্প্রদায় থেকে কতজন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন, সে প্রশ্ন গুরুত্বহীন হয়। কিন্তু পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তার ফল হয় বিপরীত। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনী সংগ্রামে অবাধে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রচার হয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উত্তেজনা সৃষ্টি একটি ফলপ্রদ নির্বাচনী কৌশল (vote catching tactics) হয়ে দাঁড়ায়। পৃথক নির্বাচন প্রথা এক-জাতীয়তাবোধকে বিপর্যস্ত করে, জাতিকে নানা খন্ডে বিভক্ত করে। কংগ্রেস নেতৃবর্গ লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষ রোপণে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। পরবর্তীকালের দেশবিভাগ তাঁদেরই পাপের ফল।

লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে পৃথক নির্বাচন প্রথার অনকূলে স্বীকৃতি প্রদান করে কংগ্রেসনেতৃবর্গ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ক্ষতবিক্ষত-করণের উপযোগী একখানি তীক্ষ্ণধার মারণাস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের হাতে তুলে দিলেন। অতঃপর যতবার জাতীয়তাবাদী মঞ্চ থেকে যৌথ নির্বাচন প্রবর্তনের দাবি উত্থাপিত হয়েছে ততবারই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বলা হয়েছে—'পৃথক নির্বাচন খুব খারাপ জিনিস তা কি আমরা জানি না? কিন্তু আমরা কি করব? তোমরাই ত লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে পৃথক নির্বাচন সমর্থন করেছ। এখন আমরা কি করতে পারি? তোমরা হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে বল তোমরা যৌথ নির্বাচন চাও, আমরা এক্ষুনি পৃথক নির্বাচন বাতিল করে যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করব। কিন্তু যতদিন তোমরা উভয় পক্ষ একমত হয়ে কথা বলতে পারছ না ততদিন কোন যুক্তিতে আমরা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপরে জোর করে যৌথ নির্বাচন চাপিয়ে দেবো? সুতরাং ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মর্লি ও মিন্টোর চক্রান্তে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিপক্ষ (Counterpoise) রূপে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্ল্যাটফর্ম খাড়া করা হয়েছিল, লক্ষ্ণৌচুক্তি সেই প্ল্যাটফর্মের শক্তি বৃদ্ধি করলো এবং জাতীয়তাবাদকে বিপন্ন করলো।

লক্ষ্ণৌ চুক্তির তৃতীয় অশুভ ফল এই হল যে, এই চুক্তির দ্বারা পরোক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হল—কংগ্রেস শুধু হিন্দুস্বার্থের প্রতিনিধি। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়, মুসলিম

স্বার্থের অভিভাবকত্ব করবার যোগ্যতা কংগ্রেসের নাই, মুসলিম স্বার্থের একমাত্র অভিভাবক মুসলিম লীগ। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে এই সব কথা জোরের সাথে প্রচার করা হয়েছে। তা ছাড়া, ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে। সে ক্ষেত্রে মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক সংস্থা মুসলিম লীগকে যদি মুসলিম স্বার্থের অভিভাবক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তা হলে হিন্দুদের ক্ষেত্রেও হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার উপরেই হিন্দু স্বার্থের অভিভাবকত্ব ন্যস্ত হওয়া সমুচিত। কংগ্রেস হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক সংস্থা ছিল না। তাহলে কোন অধিকারে কংগ্রেস নেতারা হিন্দু সমাজের অভিভাবক সেজে ওরকম একটা চুক্তি করে ফেললেন? কোন নীতিতে ঐ চুক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে বাধ্য করা হবে?

একটি প্রশ্ন অনেকের মনেই উদয় হতে পারে যে উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কংগ্রেসনেতৃবর্গ এরূপ নিদারুণ ভুল করলেন কি করে? যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে সর্বনাশকর সেইরূপ একটি চুক্তিতে কি করে তাঁরা বিনা আপত্তিতে স্বাক্ষর দান করলেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে হলে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের শ্রেণীচরিত্রকে বুঝতে হবে। আলোচ্য সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংস্থাই ছিল উচ্চবিত্ত ও ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়াতলে অবস্থান করে কিছুটা অনুনয়, প্রার্থনা ও কিছুটা সংযত চোখ রাঙানির মাধ্যমে ইংরেজের অনুগ্রহের দানরূপে এমন কিছু শাসন সংস্কার আদায় করা যা ঐ দুই শ্রেণীর নেতাদের জন্য সম্মান ও সমৃদ্ধি প্রদান করবে এবং তাঁদের বংশধরগণের জন্যও অনুরূপ সম্মান সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার আশ্বাস বহন করবে। লক্ষ্যের দিক দিয়ে কংগ্রেস নেতাদের ও লীগ নেতাদের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল না। বিরোধ ছিল শুধু অর্জিত সুযোগ সুবিধা সমূহের ভাগবাঁটোয়ারার প্রশ্নে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরেজগণকে জয়ী করবার জন্য তাঁরা যে অতিশয়িত উদ্যম প্রদর্শন করেছিলেন তার প্রতিদানে ইংরেজেরা এদের পুরস্কারস্বরূপ এক দফা শাসনসংস্কার মঞ্জুর করবেন এ প্রত্যাশা এদের অন্তরে সযত্নে লালিত হচ্ছিল। আর দুই পক্ষই আশা করেছিলেন যে, কংগ্রেস ও লীগ সম্মিলিত ভাবে একটা দাবি উত্থাপন করলে শাসনসংস্কারের পেটিকাটি খানিকটা স্ফীত হবে। লীগ নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি যুক্ত পরিকল্পনায় সম্মতি দানের বিনিময়ে উচ্চ মূল্য আদায়ের সুযোগ তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা সে সুযোগ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতারা জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা না করে তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে চোখ বুজে লীগের জাতীয়তাবিরোধী দাবিগুলি স্বীকার করে নিয়ে 'সম্মিলিত দাবিপত্র' স্বাক্ষর করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

চুক্তির চতুর্থ দফায় সাম্প্রদায়িক 'ভেটোর' যে ব্যবস্থা উভয় পক্ষ মেনে নিয়েছিলেন তা ছিল যেমন অযৌক্তিক তেমনি অবাস্তব। ঐ ধরনের 'ভেটো' ব্যবস্থার পৃষ্ঠব্রণযুক্ত হয়ে কোন বিধায়কের সংস্থার পক্ষে সুস্থভাবে হাঁটা সম্ভব হয় না। কিন্তু আশুলাভের অত্যুগ্র লালসার বশে উভয় পক্ষই সে কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই চতুর্থ দফায় যে 'ভেটো'-র সর্ত সংযুক্ত করা হয়েছিল সেটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির হাতে একটা 'তুরুপের তাস' ধরিয়ে দিল যা ব্যবহার করে এমন কি জাতিগঠনমূলক কোন প্রস্তাবেও সম্মতিদানের বিনিময়ে যে কোন

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উচ্চমূল্য আদায় করে নিতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের এই সাময়িক ঘনিষ্ঠতা ইংরেজ শাকবর্গের শিরঃপীড়া জন্মায়। ইংরেজেরা অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন করে ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয়তাবাদী তৎপরতাকে খর্ব করবার উদ্দেশ্যে একটি ইংরেজভক্ত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চ প্রস্তুত করে ভেদনীতির প্রয়োগ দ্বারা ভারতের উপরে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীকে দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ করে তুলতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যদি রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে ইংরেজদের পূর্বোক্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে যায়। সুতরাং কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার ব্যাপারে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটি করে ভাগ্যান্বেষী খয়ের খাঁ গোষ্ঠী ছিল। এই গোষ্ঠীর লোকেদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইংরেজের চরণাশ্রিত হয়ে রাজকীয় অনুগ্রহ অর্জন করে তারই মাধ্যমে সৌভাগ্য শিকার। মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর এই গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমানেরা রাজনৈতিক মাতব্বরি করবার মত একটি প্ল্যাটফর্ম পেয়ে খুশী হলেন এবং এঁরা লীগে যোগদান করলেন। কিন্তু ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বহির্বিশ্বের ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি একাত্মতাবোধের আবেগে লীগ মহলে ইংরেজ বিরোধিতার ছায়াপাত ঘটতে দেখে এদের মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দিল। সৈয়দ আমীর আলি-ত এই পরিস্থিতির সূচনাতেই লীগের সাথে সম্পর্ক ছেদ করেন। সর্বত্রই এই ধরনের মুসলমান নেতা ছিলেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে মুসলিম লীগের যে অধিবেশন হয় তার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা, পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ মজহর উল্ হক্। কিন্তু একান্ত রাজভক্ত মুসলমানেরা এই নির্বাচন নিয়ে হৈ চৈ সুরু করেন ও প্রচার করতে থাকেন যে মজহর উল্ হক্ কংগ্রেসপন্থী মুসলমান। তিনি 'খাঁটি মুসলমান' বলে বিবেচিত হতে পারেন না এবং তিনি মুসলিম লীগের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবার যোগ্য ব্যক্তি নহেন। এই গোলমালে বোম্বাইয়ের মুসলিম লীগ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ চুক্তির দ্বারা জাতীয়তাবাদীরা যদিও মুসলমানগণের প্রায় সবগুলি সাম্প্রদায়িক দাবি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তথাপি ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতারা এই চুক্তিকে একটি বিপদ বলে মনে করতে থাকেন। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে বিহারের শাহাবাদ জেলায় এক দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে যায়। সৈয়দ আমীর আলি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহোম্যাডান অ্যাসোসিয়েশনের' তরফ থেকে লক্ষ্ণৌ চুক্তির বিরোধিতা করে বড়লাটের কাছে এক প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিঃ মন্টেগু প্রথমে ছিলেন উপ-ভারতসচিব (Under-Secretary of State for India)। ভারতসচিব ছিলেন মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেন। বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত ব্যাপারে মিঃ চেম্বারলেনের কতকগুলি কার্য বিলাতের রাজনীতিকবৃন্দের একাংশকে বিক্ষুদ্ধ করে এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমন্সসভায় মেসোপোটেমিয়া ফ্রন্টে প্রেরিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে চেম্বারলেনের কার্যের নানা ভুলত্রুটির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিরূপ সমালোচনার ঝড় ওঠে, ও মন্টেগু স্বয়ং এই সমালোচনায় যোগদান করে চেম্বারলেনকে নিন্দাসূচক অনেক তীব্র

মন্টেগু চেম্সফোর্ড শাসন সংস্কার

উক্তি করেন যার ফলে চেম্বারলেন পদত্যাগ করেন এবং মন্টেগু ভারত সচিব পদে উন্নীত হন। এই সময়ে মন্টেগু ছিলেন বয়সে প্রায় যুবক। তখনও তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠা ছাড়ায় নি। ইতঃপূর্বে উপ-ভারতসচিব পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে তিনি ভারতে এসে নানা প্রদেশ ভ্রমণ করেন এবং ব্যবহারে ও কথাবার্তায় ভারতের রাজনীতিকগণের মধ্যে খানিকটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ভারতসচিব পদে মন্টেগুর নিয়োগে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী মহল এবং মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ সকলেই উৎসাহিত বোধ করেন ও তাঁদের অন্তরে অনতিবিলম্বে স্বায়ত্বশাসন লাভের পথে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটবে—এরূপ আশা বলবতী হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে আগষ্ট ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভারতনীতি সম্পর্কিত এক ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এই ঘোষণার মধ্যে ছিল ঃ

"The policy of His Mejesty's Government with which the Government of India are in complete accord, is that of increasing association of Indians in every branch of administration, and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible Government in India as an integral part of the British Empire. They have decided that substantial steps should be taken in this direction as soon as possible."[৫]

পূর্বোক্ত ঘোষণার মধ্যে মন্টেগুও খুব স্পষ্ট ভাষায় আরও জানালেন যে দায়িত্বযুক্ত শাসনসংস্কারের দিকে ভারতবাসীদের অগ্রগতি ঘটবে 'ধাপে ধাপে' (progress in this policy can only be achieved by successive stages). এবং একথাও স্পষ্ট ভাষায় বলা হল যে ভবিষ্যতে কোন সময়ে কতটুকু বর্দ্ধিত ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে ন্যস্ত করা হবে তা ব্রিটিশ সরকার ও ভারত সরকারের (অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ শাসকশ্রেণীর) নিজস্ব বিচার বিবেচনার অধীন থাকবে।

যে কোন পাঠক একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে মন্টেগুর ঘোষণার মধ্যে অদূরভবিষ্যতে ভারতবাসীর হাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা বা অধিকার হস্তান্তরের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এতাবৎকাল বলে এসেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত একটি স্বশাসিত অঙ্গরাজ্য হিসাবে ভারতবর্ষকে গড়ে তোলা তাঁদের চূড়ান্ত অভিপ্রায়, কিন্তু ভারতবাসিগণ রাজনৈতিক সাবালকত্ব প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী কতটা সাবালকত্ব অর্জন করেছে তা বিবেচনা করে একটু একটু করে তাদের হাতে কিছু কিছু ক্ষমতার লাড়ু পরিবেশন করা যাবে। মন্টেগুর ঘোষণার মধ্যেও এই একই কথা ভিন্ন ভাষায় বিবৃত হয়েছে। ঘোষণাটির বয়ান খুব চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় রচিত। *স্বায়ত্ব শাসনমূলক সংস্থাসমূহের ক্রমিক পুষ্টি* (gradual development of selfgoverning institutions); কি জন্য?—ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য করে সেখানে ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য (with a view to *progressive realisation of responsible Government* in India)। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে স্বশাসন বা Self-government-এর কথা বলা হয়

নাই—বলা হয়েছে responsible Government এবং তাও 'ধীরে ধীরে' (progressive realisation of responsible Government)। 'স্বশাসন' ও 'দায়িত্বশীল' শাসন এ দুটি শব্দের অর্থগত ব্যবধান সুপ্রচুর। 'দায়িত্বশীল শাসন'-এর কোন ধরা বাঁধা মানদন্ড রাষ্ট্রনীতি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ নাই। অর্থাৎ যে কোন রকম অর্থ করা যায়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে মন্টেগুর ঐ প্রকার অন্তঃসারশূন্য ঘোষণা সম্পর্কেও কংগ্রেসের তরফ থেকে কোন অসন্তোষ বা বিক্ষোভ প্রকাশ করা হল না। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে প্রকারান্তরে মন্টেগুর ঘোষণাকে অভিনন্দিত করা হল। প্রস্তাবের প্রথমাংশে বলা হল ঃ

"The Congress expresses its grateful satisfaction over the pronouncement made by His Majesty's Secretary of State of India on behalf of the Imperial Government that its object is the establishment of responsible Government in India."[৬]

অবশ্য সেই সাথে অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করা হল যে অবিলম্বে অন্তত কংগ্রেস-লীগ যুক্ত পরিকল্পনা অনুসারে শাসনসংস্কার মঞ্জুর করে এবং পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা কংগ্রেস সবিনয়ে জ্ঞাপন করছে।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ভারতসচিব মন্টেগু ও বড়লাট চেম্সফোর্ডের যুক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হল। ইতিহাসে এই রিপোর্ট 'মন্টেগু চেম্সফোর্ড শাসনসংস্কার পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। এই রিপোর্ট মুক্তিকামী ভারতবাসীদের চিত্তে জাগালো হতাশা ও বিক্ষোভ। এর মধ্যে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক ক্ষমতা ভারতবাসীদের হাতে ন্যস্ত করবার সুপারিশ ছিল না। ভিতরে ফাঁপা হলেও এর বাইরের দিকে বেশ কিছুটা চাকচিক্য ছিল যা ছিল মডারেট নেতাদের রসনাকে লালাসিক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট। ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া এই রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"It was a masterpiece of literature, and like other political documents produced by British statesmen, it contained a dispassionate statement of India's case for self-government. Only, the obstacles to reforms are described with equal lucidity and in the end the latter triumphs."[১]

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ভারতশাসন আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা India Council-এর সর্বমোট সদস্য সংখ্যা নির্দ্ধারিত ছিল ৬০ জন। মন্টেগু রিপোর্টে বিলাতের অনুকরণে একটি উচ্চ পরিষদ ও একটি নিম্নপরিষদ নিয়ে দুই কক্ষযুক্ত কেন্দ্রীয় বিধানমন্ডলী গঠনের সুপারিশ করা হল। উচ্চপরিষদের নাম Council of States এবং নিম্নপরিষদের নাম 'ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা' (Indian Legislative Assembly)। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সর্বমোট সদস্যসংখ্যা হবে ১৪৪ জন। তার মধ্যে ১০০ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৪৪ জন সরকার মনোনীত সদস্য থাকবে। এই ১০০ জনের মধ্যে পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর মাধ্যমে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান

ও ইউরোপীয় প্রভৃতি সম্প্রদায় তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন। এ ছাড়া কতগুলি আসন বিশেষ স্বার্থের জন্য সংরক্ষিত থাকবে (শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়, চাবাগানের মালিক শ্রেণী ইত্যাদির জন্য)। আসনসংখ্যার বন্টন এমনভাবে করা হল যে সমুদয় নির্বাচিত ভারতীয় সদস্য একত্রিত হলেও তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয় না। ব্যবস্থাপক সভার হাতে কার্যত কোনপ্রকার শাসনকর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হল না। শাসনের কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকবে স্বয়ং বড়লাট কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় সদস্য নিয়ে গঠিত একটি শাসনপরিষদ বা Executive Council-এর হাতে। শাসনপরিষদের সদস্যগণ ব্যবস্থাপক সভার কাছে কোন প্রকারে দায়ী থাকবেন না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি বর্দ্ধিতায়তন বিকর্ত সভা বা Debating Club-এর মত মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করা হল।

প্রাদেশিক স্তরে বড় বড় অর্থাৎ গভর্নরশাসিত প্রদেশগুলিতে একটি করে বর্দ্ধিতায়তন ব্যবস্থাপক সভা বা Legislative Council গঠনের সুপারিশ করা হল মন্টেগু রিপোর্টে। প্রশাসনিক বিষয়গুলি দুইভাগে বিভক্ত করে কতকগুলিকে 'সংরক্ষিত বিষয়' (Reserved subjects) এবং আর কতগুলিকে হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred subjects) রূপে চিহ্নিত করা হল। Reserved subjects-গুলির প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হল—গভর্নর কর্তৃক মনোনীত-কতিপয়-শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় সদস্য যুক্ত 'শাসন পরিষদ' বা Executive council-এর হাতে। Transfered subjects-গুলির ভার অর্পিত হল—ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে গভর্নর কর্তৃক মনোনীত দুই জন বা তিন জন 'মন্ত্রী' বা Minister-এর হাতে। সংরক্ষিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভার কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ আদৌ বাধ্যতামূলক হবে না। অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার মতামত যাই হোক না কেন ঐ বিষয়গুলির শাসনবাপারে গভর্নর ও তাঁর Executive Council হবেন সর্বেসর্বা। স্বরাষ্ট্র; (Home), অর্থ (Finance), ভূমি রাজস্ব (Land Revenue), বাণিজ্য ও শিল্প (Commerce and Industries), পূর্ত (Public Works), সেচ (Irrigation), আইন ও বিচারব্যবস্থা (Law and Judiciary) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সবই 'সংরক্ষিত বিষয়' সমূহের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, সমবায়, আবগারী প্রভৃতিকে হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ভাবে শাসনযন্ত্রের দুই অংশে দুই ধরনের পরিচালক নিযুক্ত করবার অভিনব পরিকল্পনাটিকে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ 'দ্বৈতশাসন' বা Diarchy নামে আখ্যাত করেন। একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে এই পরিকল্পনায় সর্বপ্রকার উন্নয়নমূলক কর্মের চাবিকাঠিটি সংরক্ষিত রাখা হয় গভর্নরের হাতে। অর্থ ছাড়া শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য বা স্থানীয় শাসন ইত্যাদির ব্যাপারে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। কিন্তু 'অর্থ' বিভাগ রইলো গভর্নরের নিজস্ব এক্তিয়ারে। সুতরাং হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের ভারপ্রাপ্ত দেশীয় মন্ত্রীদের নিজ নিজ বিভাগের প্রশাসনের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে গভর্নর ও তাঁর Executive Council-এর উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে,—এই ছিল মন্টেগু পরিকল্পনার সারমর্ম। তা ছাড়া আরও সুপারিশ করা হয় যে ভাবী শাসনতন্ত্রে এই মর্মে সুস্পষ্ট নিয়ম অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে ব্যবস্থাপক সভায় কোন Bill বা প্রস্তাব ভোটাধিক্যে নামঞ্জুর হলে গভর্নর তাঁর 'সার্টিফিকেশন ক্ষমতা' প্রয়োগ করে ঐ নামঞ্জুর Bill বা প্রস্তাবকে 'মঞ্জুর' বলে ঘোষণা করতে পারবেন এবং ব্যবস্থাপক সভা

কোন Bill বা প্রস্তাব ভোটাধিক্যে অনুমোদন করলে গভর্নর ভেটো (Veto)-ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে বাতিল করে দিতে পারবেন। সুতরাং মন্ত্রী এবং ব্যবস্থাপক সভা উভয়েই হবে কার্যতঃ 'ঠুঁটো-জগন্নাথ'। তৎকালীন ভারতবর্ষীয় রাজনীতি বিশেষজ্ঞেরা এক বাক্যে এই দ্বৈতশাসন পরিকল্পনার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন—'এ যেন একটা ট্রেনের দুই প্রান্তে দুটো বিপরীতমুখী ইঞ্জিন জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা। একটির চালক ব্রিটিশ-অটোক্র্যাসী, অপরটির চালক দেশীয় মন্ত্রিগণ। এক সাথে দুটো ইঞ্জিন চালু করে দিলে, একটা ট্রেনখানিকে উত্তরের দিকে টানবে—আর একটা টানবে দক্ষিণ দিকে। ফলে ট্রেনখানি উত্তর-দক্ষিণ কোন দিকেই অগ্রসর হতে পারবে না। গতিহীন হয়ে এক জয়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে।'

কিন্তু দেশীয় মন্ত্রীদের যে বেতন নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল সেটা ছিল একটা আকর্ষণীয় টোপ। এক একজন মন্ত্রীর বার্ষিক বেতন ধার্য হয়েছিল চৌষট্টি হাজার টাকা। (এখনকার মুদ্রামূল্য অনুসারে ওটা দাঁড়াবে প্রায় ছয়লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকায়!!)

রিফর্মস্ পরিকল্পনার উপরে মডারেট দলকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট কংগ্রেস মহলে সার্বিক অসন্তোষ সত্বেও নানাপ্রকার মতপার্থক্য আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তার জন্য ঐ প্রশ্ন বিবেচনার উদ্দেশ্যে বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। ২৯ শে আগষ্ট ১৯১৮ থেকে চারদিন ব্যাপী এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পাটনার খ্যাতনামা জাতীয়দাবাদী নেতা মিঃ হাসান ইমাম। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রথম সারির কংগ্রেসনেতা ভিঠলভাই প্যাটেল। ৩৮৪৫ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন। চারদিনব্যাপী এই অধিবেশনে শেষপর্যন্ত যে প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই দীর্ঘ প্রস্তাবে উক্ত রিফর্ম-পরিকল্পনাকে 'হতাশাব্যঞ্জক ও অসন্তোষজনক' (disappointing and unsatisfactory) বলে ঘোষণা করে তার ব্যাপক সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। ঐ সময়ে, একই স্থানে মামুদাবাদের রাজাসাহেবের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগেরও একটি বিশেষ অধিবেশন বসে এবং সেই অধিবেশনে মুসলিম লীগও কংগ্রেস-প্রস্তাবের অনুরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে দীন্‌শা ওয়াচা, সুরন্দ্রেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকা মজুমদার প্রভৃতি মডারেট নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। এর প্রায় চারমাস পরে দিল্লীতে পন্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের তেত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন খ্যতনামা জাতীয়তাবাদী নেতা হাকিম আজমল খাঁ। এই কংগ্রেসে সারা ভারত থেকে ৪৮৬৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

ইতোমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর সরকারিভাবে যুদ্ধসমাপ্তি (Armistice) ঘোষিত হয়।

যুদ্ধ-সমাপ্তির পূর্বেই আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটে যা পরবর্তীকালে জাতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ভারত সরকার ইংলন্ডের King's Bench-এর বিচারপতি স্যর সিড্‌নী রাউলাট্‌কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন, যার কার্য হবে—(১) বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রসমূহের

প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও (২) ঐ রূপ ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ ও দমনের জন্য কিরূপ আইন প্রণয়ন যুক্তিযুক্ত তদ্বিষয়ে পরামর্শ দান। এই কমিটিতে দুইজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন—(১) মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি দেওয়ানবাহাদুর কুমারস্বামী শাস্ত্রী ও (২) কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল প্রভাসচন্দ্র মিত্র (পরবর্তী কালে স্যার পি.সি. মিত্র নামে পরিচিত)। রাউলাট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে। তার আপত্তিকর ও প্রতিক্রিয়াশীল সুপারিশসমূহ ভারতীয় মানসকে প্রচন্ডভাবে আহত করে ও দেশময় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বোম্বাইয়ের স্পেসাল কংগ্রেসে এবং চারমাস পরে অনুষ্ঠিত ঐ রিপোর্টের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে—তার একটির সূত্র আন্তর্জাতিক, অপরটি ভারতের আপন ঘরের ঘটনা। বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংলন্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে। ভারতীয় মুসলমানেরা বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের জয় ঘটলে তুরস্কের পরিণতি কি ঘটবে তাই নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ইংরেজেরা তখন এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন যে যুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়ী হলে তুরস্কের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধমুলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে না। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর যে সকল শান্তিপ্রস্তাব প্রকাশিত হয় তার মধ্যে দেখা যায় তুর্কী-সাম্রাজ্যকে খন্ড খন্ড করে অমুসলমান শক্তিগুলির মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার এবং তুরস্কের সুলতান. যিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের 'খালিফা' (ধর্মীয় প্রধান) বলে স্বীকৃত তাঁর মর্য্যাদা হরণ করবার প্রস্তাব রয়েছে। তাছাড়া আরব অঞ্চলে কয়েকটি মুসলিম ধর্মস্থানকেও অমুসলমান শাসকের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব রয়েছে।

ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে এতে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়। এই উত্তেজনা থেকেই ভারতে 'খিলাফৎ আন্দোলন' নামে এক ব্যাপক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড ও পাঞ্জাবের অধিবাসীগণের উপরে পৈশাচিক অত্যাচার, এই দুই ঘটনা থেকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস নূতন পথে মোড় নেয়।

সূত্রনির্দেশ

১। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ১৬৫।
২। Dr. P. Sitaramayia, *History of Indian National Congress*, vol. I, p.123.
৩। Dr. Rajendra Prasad *India Divided* p.119.
৪। *Ibid*.
৫। Dr. P. Sitaramayia, *History of Indian National Congress*, vol I, p.134.
৬। *Ibid*., p.137.
৭। *Ibid*.,p.157.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুক্তিযুদ্ধ, গণ-সংগ্রামমুখী নবযুগের সূচনা

নানা দিক দিয়েই, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ ভারতবাসীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক উদাত্ত নবযুগ-সূচনার স্মারকচিহ্নরূপে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। এই বছরটি সাক্ষী হয়ে রয়েছে পুরাতন ক্লীব রাজনীতির সন্ত্রস্ত পশ্চাদাপসারণের। আর সেই সাথে নূতন আশার খড়্গ হাতে নিয়ে মুক্তিকামী ভারতবাসীর দৃপ্ত নবজাগৃতির। এই বছর থেকেই শূণ্যগর্ভ আস্ফালনের অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে ভিক্ষার্থী হস্তপ্রসারণের কাপুরুষোচিত রাজনীতি জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সুদূরে অপসৃত হল। বাক-সর্বস্ব মডারেট রাজনীতিকগণ এই বছরেই কংগ্রেসের আঙ্গিনা চিরতরে পরিত্যাগ করেন ও নিরাপদ দূরত্বে এসে তাঁরা ইন্ডিয়ান লিবার‍্যাল ফেডারেশন নামে নূতন সংস্থা গঠন করেন। ইংরেজের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের শপথবাক্য উচ্চারণ করতঃ বৎসরান্তে দলীয় সমাবেশে মিলিত হয়ে বাগ্‌জাল বিস্তার ও বিদেশী শাসকগণের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা ছাড়া ঐ মডারেট সভার আর কোন কাজ ছিল না। এই বছর থেকেই কংগ্রেসের রাজনীতি সংগ্রামী স্তরে উন্নীত হয়। অনুগ্রহ প্রার্থনার বদলে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিত দাবি— আর সেই দাবির পশ্চাতে কঠোর সংগ্রামের শপথ অতঃপর কংগ্রেস-রাজনীতির-মূলসূত্র রূপে পরিগণিত হয়। এই বছরেই জাতীয় রাজনীতি পূর্বতন সংকীর্ণতা পরিহার করে অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবাসীদের সাথে হাত ধরাধরি করে বিদেশী শাসন উচ্ছেদের সঙ্কল্প নিয়ে জাতীয় সংগ্রামে সামিল হয়। এই বছরেই সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ আসুরিক উম্মত্ততায় প্রমত্ত হয়ে পাঞ্জাববাসী সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয়গণের রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে বীভৎসতম পৈশাচিকতার অবতারণা করে ব্রিটিশ জাতির ললাটে দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ এঁকে দিয়ে তার আপন পরিচিতিকে পৃথিবীর সকল সভ্য মানুষের কাছে ঘৃণার্হ করে তোলে, আর সাম্রাজ্যবাদী হস্তের সেই হিংস্রতম আঘাত ভারতের সংগ্রামী আত্মাকে বিস্ময়কর দৃপ্ত জাগরণে উদ্বোধিত করে। মৃত্যু-সমুদ্র মন্থন করে ভারতবাসী লাভ করলো অমৃতময় নবজাগৃতি।

১৯১৯ সাল স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক যুগসন্ধিব সাক্ষী

এই বছরেই মন্টেগু চেম্সফোর্ড্ শাসন-সংস্কারের সুপারিশসমূহ '১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন' নামাঙ্কিত হয়ে ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে ভারতবাসিগণের এক নূতন দাসত্বের দলিল রূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্যার এস্. এ. টি. রাউলাটের নেতৃত্বে গঠিত কুখ্যাত রাউলাট কমিটির রিপোর্ট অপর একখানি দাসত্বের দলিল রূপে এই বছরেই জনচক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়। কমিটীর পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৯ এর ১৯শে জানুয়ারী।

রাউলাট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দুইটি আইনের খস্‌ড়া বা Bill অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে প্রস্তুত হয়ে গেল।

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব (অর্থাৎ বড়লাটের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের হোম-মেম্বার) স্যার উইলিয়ম ভিন্সেন্ট কেন্দ্রীয় আইনসভায় Bill দুটি পেশ (introduce) করেন—১৯১৯ এর ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। একটি Bill-এর নামছিল Criminal Law Amendment Bill (Bill no I of 1919) ; অপর Bill-টির নাম ছিল Criminal Law Emergency Powers (Bill no 2 of 1919) । প্রথম Bill-টি পরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় Bill-টিই ছিল মারাত্মক। এই Bill-টির উদ্দেশ্য ছিল—বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির ফলে ১৯১৫ সালের কুখ্যাত ভারতরক্ষা আইনের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাওয়ার দরুণ যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে তার মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত আইন বিধিবদ্ধকরণ। ভারতরক্ষা আইনে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার অজুহাতে যে সকল স্বল্পমেয়াদী অস্বাভাবিক ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল সেগুলিকে চিরস্থায়ী করবার ব্যবস্থা। বৈপ্লবিক কর্মের সাথে যোগাযোগ থাকার সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা, কারাগারের বাইরে থাকলেও তার গতিবিধি ও স্বাধীন জীবনযাত্রার উপরে নানা স্বৈরাচারী বিধিনিষেধ আরোপ করা, বৈপ্লবিক অপরাধসমূহের তদন্ত ও বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন ও বিশেষ বিচারবিধির প্রবর্তন (যার ফলে সাধারণ আইনে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের যে সকল সুবিধা বিহিত আছে—বৈপ্লবিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত ও সঙ্কুচিত হবে)। এরূপে আইন বিধিবদ্ধ হলে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে যে কোন ভারতবাসীর সর্বপ্রকার মৌলিক স্বাধীনতা হরণ করবার, এমন কি, তার রুজি রোজগারের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার ন্যস্ত হবে প্রশাসনিক কর্মচারীদের হাতে। বস্তুত, প্রস্তাবিত আইন পাশ হলে বিদেশী সরকারের হাতে এমন অস্বাভাবিক ক্ষমতা অর্পিত হবে যে ঐ আইনের খড়্গ যাবতীয় ভারতবাসীর মাথার উপরে ঝুলিয়ে রেখে সরকারি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ক্ষীণতম কণ্ঠকেও অনায়াসে রুদ্ধ করে দেওয়া যাবে। বিপ্লব দমনের ছদ্মনামে স্বাধীনতা কিংবা ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য ভারতবাসীগণের সর্বপ্রকার আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করবার অসদভিপ্রায়েই ঐ Bill-টি রচিত হয়েছিল।

রাউলাট বিল ও ভারতীয় মানসে তার প্রতিক্রিয়া

মহাত্মা গান্ধী তখনও পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে পিছনের সারির মানুষ বলেই গণ্য হতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতবাসীগণকে তত্রত্য ইউরোপীয় সমাজের জাতিবিদ্বেষপ্রসুত চূড়ান্ত অবমাননাকর বাধানিষেধের কন্টকবেষ্টনী থেকে মুক্ত করবার জন্য তাঁর দুঃসাহসিক সংগ্রাম এবং গুজরাটের কয়রা জেলা ও বিহারের চাম্পারণ জেলার অত্যাচারিত প্রজাসাধারণের জন্য সংগ্রাম তাঁকে টলষ্টয়পন্থী মানবদরদীরূপে পরিচিত করেছিল, কিন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্রে তখনও পর্যন্ত তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি ইংরেজের যুদ্ধ-জয়প্রচেষ্টায় সক্রিয় সহযোগিতা দান করেছেন—সৈন্য-সংগ্রহ এবং ওয়ারফান্ডে অর্থসংগ্রহের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন; দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে যোগদান থেকে কংগ্রেসমঞ্চে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসে মন্টেগু-চেম্সফোর্ড রিফর্মস্ প্রস্তাব আলোচনার সময়ে তাঁর সুর

ছিল খুব নরম। কিন্তু রাউলাট বিল নিয়ে যখন দেশব্যাপী বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠলো তখন অকস্মাৎ গান্ধীজী সেই বিক্ষোভের সম্মুখবর্তী সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী একটি ঘোষণা প্রচার করে সরকার এবং দেশবাসীকে জানিয়ে দেন যে পূর্বোক্ত Bill দুটি যদি আইনে পরিণত করা হয় তা হলে তিনি সত্যাগ্রহের দ্বারা সরকারি অপচেষ্টার প্রতিরোধ করবেন। তারপর ১৮ই মার্চ তিনি নিম্নলিখিত মত শপথবাক্য (pledge) প্রচার করে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন ঐরূপ শপথ গ্রহণের জন্য। শপথবাক্যের বয়ান ছিলঃ

"Being conscientiously of opinion that the Bill known as the Indian Criminal Law Amendment Bill no. 1 of 1919 and the Bill known as Criminal Law Emergency Powers Bill no 2 of 1919 are unjust, sabversive of the principles of liberty and justice and destructive of the elementary rights of an individual on which the safety of India as a whole and the State itself is based—we solemnly affirm that in the event of these Bills becoming law and until they are withdrawn, we shall refuse civilly to obey those laws and such other laws as the Committee, to be appointed hereafter, may think fit, and we further affirm that in the struggle, we will faithfully follow truth and refrain from violence of life, person and property".

গান্ধীজীর আহ্বান দেশে এক অভূতপূর্ব ও উদাত্ত জাগৃতির প্লাবন নিয়ে আসে। এই জাগৃতির এক বিশিষ্ট লক্ষণ হল—সংগ্রামের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের দ্বিধাহীন ও উৎসাহপূর্ণ একাত্মতা। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদী চেতনা যেন এক দুর্বার ভাবের বন্যায় ভেসে চলে গেল। সরকারি রিপোর্টে উক্ত হয়েছে ঃ

"One noticeable feature of the general excitement was the unprecedented fraternisation between the Hindus and the Muslims. ....In this time of public excitement,even the lower classes agreed, for once to forget their differences. Extraordinary scenes of fraternisation occurred. Hindus publicity accepted water from the hands of Muslims and vice-versa. Hindu Muslim unity was the watchword of processions; this was indicated both by cries and banners."

ইতোমধ্যে মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পূর্বোক্ত Bill তৎকালীন ইন্ডিয়া কৌন্সিলে পাশ হয়।

জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকান্ড ও সারা পাঞ্জাবে পৈশাচিকতার তান্ডব

মহাত্মা গান্ধী ৬ই এপ্রিল থেকে ঐ আইন বাতিলের দাবিতে সত্যাগ্রহ শুরু করবার সিদ্ধান্ত করেন—এবং ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতালের ডাক দেওয়া হয়—এই ডাকেও অভূতপূর্ব সাড়া মেলে। এই হরতাল উপলক্ষে পাঞ্জাবে উত্তেজনা চরমে ওঠে। পাঞ্জাবের দুজন প্রথম সারির নেতা ডঃ সত্য পাল ও ডঃ সফিউদ্দীন কিচ্‌লুকে অমৃতসরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে সাক্ষাৎকারের নামে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় ও কোন গুপ্তস্থানে

বন্দী করে রাখা হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা পাঞ্জাবে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের বুকের তলায় লুকানো বিক্ষোভ যখন অসন্তোষের উত্তাপে শুষ্কতৃণের রূপ ধারণ করে তখন একটি ক্ষুদ্র অগ্নিশিখার স্পর্শে সুদূরবিস্তারী আগুন জ্বলে উঠে। বিপ্লবলগ্নের এই বাস্তব পরিস্থিতি যাঁর চক্ষুতে যথার্থকালে ধরা পড়ে তিনি গণসংগ্রামের দক্ষ সেনাপতি। গান্ধীজীর এই দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি এই একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই জাতির সর্ব্বোচ্চ নেতার পদে উন্নীত হলেন। আগুন বিদ্যুৎবেগে সারা পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়লো—তারই পরিণতিতে ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক পার্কে যে সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিকতার চূড়ান্ত স্পর্দ্ধার স্বাক্ষর বহন করে যে দানবীয় তান্ডব অনুষ্ঠিত হল, তাকে আধুনিক বিশ্বের সভ্যতার ললাটে অঙ্কিত ঘৃণ্যতম কলঙ্কচিহ্ন বলে বর্ণনা করা যায়। পূর্বোক্ত দুইজন সম্মানিত নেতার আকস্মিক গ্রেপ্তার সম্বন্ধে ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ যে ঐ দুই নেতা ঃ

"Were sent for by the District Magistrate of Amritsar to his house and were spirited away to some unknown place."

বিক্ষুদ্ধ জনতা ঐ দুই নেতার সম্পর্কিত সঠিক সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জেলাশাসকের আবাসস্থলের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একটি লেভেল ক্রসিং-এর কাছে তারা উপস্থিত হলে সশস্ত্র মিলিটারী টহলদার বাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপরে গুলী করে। ফলে কয়েকজন ব্যক্তি নিহত হয় এবং আহত হয় অনেকে। পুলিশের চিরাচরিত অজুহাত ছিল যে জনতা থেকে তাদরে উপরে ইট ছোঁড়া হয়েছে। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁরা নিহত সঙ্গীদের মৃত দেহগুলি কাঁধে ও আহতদেরকে সঙ্গে নিয়ে উত্তেজিত অবস্থায় শহরের দিকে ফিরে যেতে থাকে। পথে তারা একটি ব্যাঙ্কের অফিসবাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয় ও ঐ ব্যাঙ্কের শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারকে হত্যা করে। সহরের সর্বত্র হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায় এবং এই সব হাঙ্গামায় পাঁচজন শ্বেতাঙ্গের প্রাণনাশ ঘটে। এই মারাত্মক উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী পাঞ্জাব যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে গান্ধীজীর উপরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। গান্ধীজী নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে স্পেশাল্ ট্রেনে বোম্বাই নিয়ে যাওয়া হয়।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে উত্তেজনার আগুন ঘৃতাহুতি লাভ করলো। আগুন দ্বিগুণ বেগে ছড়িয়ে পড়লো সহরে, গ্রামে গঞ্জে সবখানে।

সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিকতার অতিশয়তার প্রকোপে আত্মহারা না হলে শাসকপক্ষও এটা বুঝতে পারতেন যে পূর্বোক্ত প্রকার উত্তপ্ত পরিস্থিতির মুখে গান্ধীজীর গ্রেপ্তার অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য হয়েছিল। ইংরেজ শাসকগণের দম্ভ এবং ভারতীয় জনমন্ডলীর প্রতি তাদের বিজাতীয় ঘৃণা—এরই ফলে পাঞ্জাবের অবস্থা শাসকগণের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল—১৩ই এপ্রিলের নারকীয় ঘটনা তারই ফলশ্রুতি।

১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। দেশীয় মতে দিনটি ছিল পয়লা বৈশাখ। আবালবৃদ্ধবনিতা—সকলের উৎসবের দিন—নূতন বছরের আগমনী উৎসব। বৈশাখী-মেলা বসেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের পার্শ্বস্থ ময়দানে। বালক বৃদ্ধ নারী পুরুষ শিশু উৎসবের সাজে সজ্জিত হয়ে মেলায় এসেছে। অকস্মাৎ দেখা গেল জালিয়ানওয়ালাবাগে একটা যেন জনসভা হচ্ছে—

বক্তৃতা করছে হংসরাজ নামে একটি লোক। দেশব্যাপী উত্তেজনার সময়ে জনসভা দেখলেই উৎসুক নরনারী সেখানে ভীড় করে। মেলার লোকেরা গিয়ে সেখানে জড়ো হল বক্তৃতা শুনতে। সহরে তখনও সামরিক আইন জারী হয়নি। কারণ সরকারি কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে— সামরিক আইন জারীর আদেশ কার্যত ঘোষণা করা হয় ১৫ই এপ্রিল তারিখে। তবে ঐ ১৩ই তারিখে নাকি লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার মাইকেল ওডায়ার জেনারেল ডায়ার নামক সামরিক অফিসারকে ডেকে সহরে শান্তিরক্ষার ভার অর্পণ করেছিলেন। সভা সমাবেশের বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞার কথাও জনসাধারণ অবগত ছিল না—যদিও পরে, তদন্তের সময়ে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে ঐ দিন সকালে নাকি কোন কোন এলাকায় ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হয়েছিল।

প্রায় ২০০০০ অসন্দিগ্ধ নরনারী বালক বৃদ্ধ সভায় দাঁড়িয়ে ভাষণ শুনছে—অনেকের ক্রোড়ে উৎসবের সাজপরা শিশু সন্তান।

অকস্মাৎ চতুর্দিকে প্রাচীর ঘেরা জালিয়ানওয়ালাবাগের একমাত্র প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পথ অবরোধ করে বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা কলঙ্কিত নরঘাতক জেনারেল ডায়ার প্রাগৈতিহাসিক দানবের মত সেখানে হানা দিলেন। ডঃ সীতারামাইয়ার বর্ণনায় ঃ

"...when twenty thousand people, men, women and children gathered at the Bagh, General Dyer entered the place at the head of a force composed of 100 Indian troops and 50 British, while one Hansraj was lecturing to the audience, and gave orders forthwith to fire. His own version given later to the Hunter Commission was that he ordered the people to disperse and then fired, but he admitted that he fired within 2/3 minutes of the order. In any case, it was obvious that 20,000 people could not disperse within 2/3 minutes especially through that narrow outlet, and when 1600 rounds were fired—and the firing stopped only when the ammunition had run out."

সরকারি হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৪০০। বে-সরকারি তদন্তে জানা যায় সেদিনের নারকীয় তান্ডবে ১২০০ মানুষ নিহত হয়েছিল। সরকারি হিসাব মতেই আহতের সংখ্যা ছিল একহাজার থেকে দুই হাজারের মধ্যে। তার মধ্যে অনেকে হাত, পা, চোখ, নাক, চোয়াল প্রভৃতি হারিয়েছে। ডঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ

"The dead and the dying were left to suffer the whole night without water to drink and without medical attendance or aid of any character."

এই বীভৎসতার উল্লেখ করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২১ সালের *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত একটি কবিতায় লিখেছেন ঃ

বৃদ্ধ কত নিরপরাধ পড়লো মারা
বাচ্চা নিয়ে বুকে
গুলির ঘায়ে জোয়ান ছেলে সারাটা রাত
কাতরে ম'ল ধুঁকে।।

বিশ হাজারের নিবিড় ভীড়ে চালিয়ে গোলা
ফুরিয়ে টোটার পুঁজি
খুন্ জখমের খাঞ্জা খাঁ শেষ ঘরে ফিরে
গেলেন সোজাসুজি।।
চলে গেলেন ফৌজ নিয়ে খোস্ মেজাজে
বহাল তবিয়তে—
দেখলে নাকো ফিরেও বারেক মরছে কারা
ধুলার পরে পথে।।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে নিষিদ্ধ জনসমাবেশ ভেঙ্গে দিতে হলে, সে কাজ কি ভাবে করতে হবে তার নিয়মপ্রণালী আইনে লেখা আছে। শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশ নিষিদ্ধ হলেও তাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আইনানুমোদিত নয়। এমন কি জনতা যদি উচ্ছৃঙ্খলও হয় তবুও তৎক্ষণাৎ জনতার উপরে গুলিচালনা করা আইনবিরুদ্ধ। আগে জনতাকে সতর্ক করতে হবে, জনতা যা'তে সুশৃঙ্খলভাবে স্থানত্যাগ করতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। জনতা একবার সরে যেতে শুরু করলে তখন আর তার উপরে গুলি চালনা করা যায় না—ঐরূপ গুলীচালনা আইনবিরুদ্ধ।

জেনারেল ডায়ার যে নরঘাতনের নেশায় মেতে আইনের নির্দেশগুলি সবই অগ্রাহ্য করেছিলেন—এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট।

কিন্তু এতগুলি নিরাপরাধ পুরুষ, নারী ও শিশুর প্রাণনাশেও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের দানবীয় রক্তপিপাসা শান্ত হল না। মাসাধিককালব্যাপী দানবীয় তাণ্ডব চলতে লাগলো পাঞ্জাববাসীর বুকের উপর দিয়ে।

এই গ্রন্থে সেই কুৎসিত বীভৎসতার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু কিছু পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করছি।*

১৫ই এপ্রিল 'সামরিক আইন' (martial law) জারী করা হল। সামরিক আইন জারী হলে সামরিক প্রশাসকের যে কোন হুকুম আইনসিদ্ধ বলে গণ্য হয়। অতএব সামরিক আইনের ছত্রতলে সারা পাঞ্জাবে প্রাগৈতিহাসিক নিষ্ঠুরতার জোয়ার বইতে থাকলো। মিস শেরউড্ নাম্নী একজন মহিলা ডাক্তার যখন সাইকেলে চেপে এক গলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ক্ষিপ্ত জনতার হস্তে তিনি কিয়ৎপরিমাণে লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন (যদিও ঐ গলির অধিবাসীরাই জনতার হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করে)। সামরিক প্রশাসকের আদেশে ঐ গলিটিকে Crawling Lane বলে ঘোষণা করা হল। আদেশ প্রচারিত হল যে, ঐ গলির মধ্য দিয়ে যাতায়াত কালে সকল ভারতীয় ব্যক্তিকে বুকে হেঁটে গলি পার হতে হবে (Everyone passing through the lane was ordered to crawl with the belly to the ground)। রেলের তৃতীয়

* যাঁরা এই সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চান তাঁরা B. G. Horniman প্রণীত *Amritsar and our duty to India* নামক পুস্তক এবং *Congress Enquiry on Punjab Disturbances*-এর রিপোর্ট (দুই খণ্ড) পাঠ করতে পারেন।

শ্রেণীর টিকিট বিক্রী বন্ধ করে দেওয়া হল—যাতে সাধারণ মানুষ পাঞ্জাব ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে। বিশিষ্ট আইনব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বহুতর শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উপরে হুকুম জারী করা হয় প্রত্যহ ২/৩ বার করে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হাজিরা দেওয়ার। হাজিরা দিতে গিয়ে অনেককেই ঘন্টার পর ঘন্টা রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। কারণ, কর্তৃপক্ষের আদেশ ব্যতীত স্থানত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল। নাগরিকদের নিজস্ব মোটর গাড়ী, মোটর বাইক্‌ ও সাইকেল সামরিক কর্তৃপক্ষ সমস্ত নিয়ে যায়—সামরিক কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য। যাবতীয় যাত্রীবাহী যানবাহন সামরিক কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য রিকুইজিসন করা হয়। সুতরাং পাঞ্জাবের অধিবাসীদের জন্য চলাচলের একটিমাত্র পথ খোলা থাকে— সেটা হল পায়ে হাঁটা। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের উপরে আদেশ দেওয়া হয় বৈশাখের খররৌদ্রে প্রত্যহ চারবার করে ৫ মাইল দূরবর্তী সামরিক অফিসে হাজিরা দেওয়ার। বিদ্যালয় প্রভৃতি গৃহের ও সাধারণ নাগরিকদের গৃহের দেওয়ালে সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সকল পোষ্টার সেঁটে দিয়ে যেতো, সেগুলি পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হল গৃহস্বামীর উপরে এবং কোন পোষ্টার যদি গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে কেউ বিকৃত করে বা ছিঁড়ে ফেলে তা হলে গৃহস্বামীর ভাগ্যে চরম লাঞ্ছনা এমনকি প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত— অবধারিত ছিল। লাহোরের একটি কলেজের দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া ঐরূপ একখানি পোষ্টার কে বা কাহারা ছিঁড়ে ফেলে। তার জন্য কলেজের অধ্যক্ষসহ যাবতীয় অধ্যাপক ও কর্মচারীগণকে গ্রেপ্তার করে চোর ডাকাতের মত কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে সামরিক কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অফিসবাড়ীর খোলা ছাদের উপরে তিনদিন ধরে তাঁদের আটক করে রাখা হয়। সমস্ত পণ্যদ্রব্যের দাম সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং সে সকলের ক্রয়বিক্রয়ও থাকে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে শত শত লোক খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই সব অনাহারক্লিষ্ট মানুষদের জন্য কোন কোন জনসেবা প্রতিষ্ঠান 'লঙরখানা' স্থাপন করে। কিন্তু সরকারি আদেশে এগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পাঞ্জাবে তখন দুর্দান্ত গরম। বহু ছাত্র রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত

শ্বেতাঙ্গ সামরিক অফিসারদের পাশবিকতার কাহিনীগুলি পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন কালে পঠিত হলে যে কোন পাঠকের মনে ধারণা জন্মাবে যে বর্বর সামরিক অফিসারদের হাতে ঐ সময়ে ভারতবাসীর যে লাঞ্ছনা ঘটেছে তা মানবসভ্যতার ও মানবিক শালীনতার নির্দয়তম লাঞ্ছনা বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। গুজরানওয়ালার এক জায়গায় বহুলোক জড়ো হয়েছে দেখে এরোপ্লেন থেকে তাদের উপরে বোমা ফেলা হয় এবং মেসিনগানের মাধ্যমে ২৫৫ রাউন্ড গোলা ছোঁড়া হয়। সরকারি বিবরণে নির্লজ্জভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এর ফলে নাকি মাত্র ৯ জন লোক নিহত হয়েছিল। কর্নেল ও'ব্রায়েন নামক এক সামরিক অফিসার হান্টার কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন যে—জনতা দেখলেই আমরা গুলি করেছি। (the crowd was fired on wherever found)। লেফট্যেনান্ট্ ডড্‌কিন্‌স (Lieut. Dodkins) নামে আর এক অফিসার কমিশনের কাছে জানান যে 'একটা ক্ষেতের মধ্যে ২০ জন কৃষককে এক জায়গায় দেখতে পেয়ে আমরা তাদের উপর যান্ত্রিক কামান (machine gun) থেকে গুলী চালাই।' মেজর কার্বে (Maj. Carbey) নামক আর একজন সামরিক অফিসার কমিশনের সমক্ষে যা বলেন, তা কমিশনের রিপোর্টে নিম্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ আছে ঃ

"The crowd was running away, still he fired to disperse them. As the crowd dispersed, he fired the machine gun into village itself. He could not discriminate between the guilty and the innocent......By killing a few, he thought he would prevent people from collecting again."[১]

কর্ণেল ও'ব্রায়েন আদেশ প্রচার করেন যে শ্বেতাঙ্গ অফিসার দেখতে পেলেই, যে কোন ভারতবাসী—যদি ঐ সময়ে গাড়ী বা ঘোড়ায় আরোহী হয়—তবে তৎক্ষণাৎ তাকে নেমে দাঁড়াতে হবে। শ্বেতাঙ্গ অফিসার দেখতে পেলেই ভারতবাসী মাত্রেই সেই অফিসারকে সেলাম করবে—ছাতা মাথায় দিয়ে কোন ভারতবাসী শ্বেতাঙ্গ অফিসারের সামনে দিয়ে যেতে পারবে না। এই সব আদেশ অমান্য করণের অজুহাতে বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিকদেরকে গ্রেপ্তার করে হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়ে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে নেওয়া হয়েছে। নোংরা জায়গায় তাঁদেরকে আটক করে রাখা হয়েছে। এই শাস্তি এমন লোককেও ভোগ করতে হয়েছে—যিনি বৃদ্ধ এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের সময়ে যিনি সম্রাটের নামে একটি স্কুল স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। এক স্থানে হাঙ্গামার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে এক বৃদ্ধের দুই পুত্রকে সামরিক কর্মচারীরা গ্রেপ্তার করতে আসে। কিন্তু ছেলে দুটিকে পাওয়া যায় না। তখন কর্ণেল ও'ব্রায়েনের হুকুমে তার বৃদ্ধ পিতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃদ্ধের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং আদেশ প্রচার করা হয় যে, কেউ যদি শস্য ইত্যাদি দিয়ে ঐ বৃদ্ধের পরিবারকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয় তা হলে তাকে গুলি করে মারা হবে। কর্নেল ও'ব্রায়েনের এই সকল বর্বর আদেশ পালনে শৈথিল্যের অভিযোগে অসংখ্য মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ও'ব্রায়েন স্বয়ং বিচারকের আসন গ্রহণ করে ত্বরিত বিচার প্রহসনের মাধ্যমে তাদের সাজা দেন—যা তৎক্ষণাৎ কার্যকরী করা হয়—প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত থেকে শুরু করে দুই বৎসরের কারাদন্ড প্রভৃতি নানা শাস্তি দেওয়া হয় হতভাগ্য ধৃত ব্যক্তিদেরকে। এ ছাড়া ও'ব্রায়েনের এলাকায়, পূর্বোক্তরূপ অপরাধের অভিযোগে মিলিটারী কমিশনের বিচারে ২২ জনের হয় মৃত্যুদন্ড, ১০৮ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং আরও ১৯ জনের প্রতি ৭ বৎসর থেকে ১০ বৎসরের কারাদন্ড। অকস্মাৎ একদিন ও'ব্রায়েন খবর পেলেন যে তার পরদিনই সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হবে। ও'ব্রায়েন তখন তাড়াতাড়ি স্বয়ং বিচারাসনে বসে যতগুলি মোকর্দমা ঐ সময়ে বিচারাধীন ছিল তার সবগুলির তারিখ এগিয়ে নিয়ে এসে পাঁচমিনিটে এক একটি মামলার শুনানী শেষ করে বহুতর লোককে দন্ড দান করেন। বলা বাহুল্য এ সব মামলার শুনানীতে আইন কানুন সাক্ষ্য প্রমাণ কিংবা আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ইত্যাদি কোন কিছুর বালাই ছিল না।

আলোচ্য সময়ে কাসুর (Kasur) মহকুমার ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন ডাভ্টন (Capt. Doveton)। তাঁর এলাকায় সামরিক বিচারে প্রাণদন্ডে দন্ডিত আসামীদের বহুজনের সমক্ষে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসীমঞ্চ স্থাপন করা হয়। (অবশ্য ক্যাপ্টেন মহাশয়ের ঐ ধরনের নরবলি উৎসবের অভিলাষ পূর্ণ হয় না। কারণ উপরস্থ কর্মচারী জানতে পেরে ঐ ফাঁসীমঞ্চ অপসারণের আদেশ দেন)।

ক্যাপ্টেন ডাভ্টনের আর একটি পৈশাচিক উদ্ভাবনের বর্ণনা দিয়েছেন ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া ঃ

"Floggings took place in public and photographic records of these disgusting incidents are in existence, showing that the victims were stripped naked to the knees, and were tied to telegraph posts or triangles. Publicity was not casual or accidental, but designed. A sort of 'levee' of the bad characters of the town was held for the purpose by Captain Doveton's order and at least on one occasion prostitutes were brought to witness the floggings."[২]

কতকগুলি স্থানে স্কুলের ছাত্রদের উপরে আদেশ জারী করা হয় যে তাদের সবাইকে প্যারেড্ করে দীর্ঘ রৌদ্রতপ্ত পথ অতিক্রম করে প্রত্যহ তিনবার সামরিক ছাউনিতে গিয়ে ব্রিটিশ পতাকা (ইউনিয়ন জ্যাক্‌কে) সেলাম করতে হবে। এমন কি, ৫/৬ বৎসর বয়স্ক শিশু শ্রেণীর ছাত্রদেরকেও এই আদেশের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। ডঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ

"The order applied to the infant classes, and children of five or six years of age were included. It is actually alleged that *there were fatal cases of sunstroke* and it is admitted that children fainted from undue exposure to sun."[৮]

হান্টার কমিশনের জনৈক সদস্য যখন জেনারেল ডায়ারকে প্রশ্ন করেন যে, 'একথা কি সত্য যে ব্রিটিশ পতাকাকে সেলাম করানোর জন্য দুগ্ধপোষ্য বালকদেরকে প্রত্যহ গ্রীষ্মে খররৌদ্রের মধ্যে কুড়ি মাইল পথ হাঁটানো হয়েছে? তখন অসুরের অবতার ডায়ার সাহেব দম্ভভরে জবাব দেন—"কে বলে কুড়ি মাইল? তাদের আমি উনিশ মাইল হাঁটিয়েছি।"

সামরিক আদালতের বিচারে বহু লোকের প্রাণদন্ড এবং সংখ্যাহীন নিরাপরাধ মানুষের যাবজ্জীবন কারাদন্ড থেকে শুরু করে ৭/৮ বছরের কারাদন্ড হয়। দন্ডিতদের অনেকেরই স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাঞ্জাবের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা বৃদ্ধ লালা হরকিষণ লালকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি (মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা) বাজেয়াপ্ত করা হয়। ভারত বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক লাহোরের *ট্রিবিউন্* পত্রিকার সম্পাদক বাবু কালীনাথ রায়কেও যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। সেই সাথে দন্ডিত হন বিখ্যাত *জমিন্দার* পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা জাফর আলি।

অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কলকাতার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব (মিঃ আর্ডলী নর্টন) পাঞ্জাব গমনের উদ্যোগ করতে তাঁর পাঞ্জাব-প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সরকারি হুকুমনামা প্রচারিত হয়।

১৫ই এপ্রিল সামরিক আইন জারী করা হয়। সামরিক আইনের পৈশাচিক তান্ডব চলতে থাকে প্রায় তিন মাস পর্যন্ত।

ভারতের সর্বপ্রান্ত থেকে পাঞ্জাব সরকার ও সামরিক কর্তৃপক্ষের দানবীয় হিংস্রতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ধ্বনি উত্থিত হতে থাকে। ভারতের জনমতকে শান্ত করবার জন্য ও পৃথিবীর মানুষের কাছে ব্রিটিশ জাতির কলঙ্ককে কথঞ্চিৎ হালকা করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ

গভর্নমেন্ট লর্ড হান্টারের নেতৃত্বে 'পাঞ্জাব বিশৃঙ্খলার' (Punjub disorder-এর) সম্পর্কে এক তদন্ত কমিশন গঠন করেন—যার অধিবেশন হয় লন্ডনে। এই কমিশনে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীদের কোন প্রতিনিধিকে স্থান দেওয়া হয় না। পরিণামে কংগ্রেস হান্টার কমিশনের তদন্ত বয়কট্ করেন এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই তদন্ত কমিটির সভ্য ছিলেন গান্ধীজী, মতিলাল নেহেরু, সি. আর. দাশ, ফজলুল হক্, বর্ষীয়ান জননায়ক আব্বাস তায়েবজি ও মাদ্রাজের কে. সন্তানম্। এই কমিটির রিপোর্ট (দুই খন্ডে প্রকাশিত) ভারতের জাতীয় ইতিহাসের একটি মূল্যবান ও অবিস্মরণীয় দলিল।

পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী পৈশাচিক তান্ডব ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ দিঙনির্দেশক স্তম্ভ। পৈশাচিকতার ষ্টিমরোলারের তলায় পিষ্ট রক্তস্নাত পাঞ্জাব অপরিমিত শোণিত বিসর্জনের মধ্যদিয়ে উদ্বোধিত করলো ভারত-আত্মার দীপ্ত জাগৃতি। লালা লাজপত রায় এক সময়ে বলেছিলেন ঃ

"Every blow hurled on us is a nail in the coffin of the British empire."

আমাদের উপরে আমাদের শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি আঘাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শবাধার প্রস্তুতের জন্য এক একটি কীলক (পেরেক) রচনা করছে। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সযত্নে লালিত নেক্ড়ে বাহিনী ১৯১৯-এ তার রক্তলিপ্ত দন্ত ও নখরের নির্দয়তম আঘাত হেনে ভারতের সংগ্রামী আত্মাকে বিধ্বস্ত করে দিতে চেয়েছিল। সেই আঘাতই বিধাতার আশীর্বাদের রূপ গ্রহণে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অভিযানে নূতন পথের দ্বারোদ্ঘাটন করলো। আর তিনটি দশক পূর্ণ হওয়ার আগেই এই ভারতের মাটিতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শবাধারে শেষ পেরেক প্রোথিত হল।

পাঞ্জাবের রক্তস্নান জাতীয় মানসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। প্রথমত, ঐ ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনমানসে এই বিশ্বাস দৃঢ়সংবদ্ধ হল যে আবেদন নিবেদনের নরম পথে জাতীয় মুক্তি কোনদিনই অর্জিত হবে না। স্বার্থে ও সাম্রাজ্যবাদী অহমিকায় আঘাত লাগলে সুসভ্য ইংরেজ জাতি যে আদিম বর্বরতার নিকৃষ্টতম রূপ-প্রকাশ করতে পারে, নেক্ড়ের থাবার আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভারতীয় জনচিত্তে এই বাস্তব বোধ জাগ্রত হলো। ভারতবাসী বুঝতে পারলো যে শূণ্যগর্ভ রণহুঙ্কারকে সাম্রাজ্যবাদীরা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে; পুনঃ পুনঃ আঘাতের মধ্য দিয়ে শত্রুর সাথে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের পথেই জাতীয় মুক্তি অর্জিত হতে পারে। ভারতবাসী এটাও উপলব্ধি করলো যে তার সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত না হলে ভারতবাসী তার সম্মান ও সুস্থ জীবন ফিরে পাবে না। দ্বিতীয় ফল এই হল যে ভারতবাসী বুঝতে পারলো যে স্বার্থোন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদী যখন আঘাত হানে তখন সে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের চোখে উভয়েই তার ক্রীতদাস। অত্যাচারের ষ্টীম রোলার যখন চলে তখন তার তলায় হিন্দু ও মুসলমান তুল্যরূপেই পিষ্ট হয়। লর্ড কার্জন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির দুরভিসন্ধিবশে বলেছিলেন যে মুসলমানেরা তাঁর 'সুয়োরানী' আর হিন্দুরা 'দুয়োরানী'। কিন্তু পাঞ্জাবের ঘটনায় দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদীর পোষা নেক্ড়ের দল একই কালে সুয়োরানী-দুয়োরানী দুজনের বুকেই দাঁত

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপরে পাঞ্জাবের ঘটনার প্রভাব

বসালো—জাতবিচার করলো না। দস্যু এলে পাশবিক উল্লাসে পাশাপাশি দুজনের ঘরে আগুন লাগায়, একই সাথে দুজনের দেহে খড়্গাঘাত করে। সুতরাং দস্যুকে রুখতে হলে আক্রান্ত দুজনকেই একসাথে হাতিয়ার নিয়ে নামতে হবে। ভাগাভাগি করলে শুধুই বলক্ষয় হবে, ভাগাভাগিতে দস্যুরই লাভ, আক্রান্ত পক্ষের চরম লোকসান। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক ক্ষুদ্র স্বার্থের সকল দ্বন্দ্ব যেন উভয়ের শোণিতের মিলিত ধারায় ভেসে গেল, মুছে গেল। ১৯১৯ থেকে ১৯২৩/২৪ এই স্বল্পস্থায়ী কালপরিসরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতি যে স্তরে উন্নীত হয়েছিল পরাধীন ভারতের রাজনীতির আঙ্গিনায় ঐ সময়ের আগে বা পরে কোন সময়েই সে প্রকার গভীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিদৃষ্ট হয় নাই।

পাঞ্জাবের রক্তস্নানকে কেন্দ্র করে যে সময়ে সারা ভারতে ইংরেজবিরোধী উত্তেজনা দ্রুতগতিতে বিস্ফোরণের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, সেই সময়ে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিভাবকমন্ডলীর একটি অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত ভারতীয় মুসলিম মানসকে অধিকতর রূপে উত্তপ্ত করে তোলে। এই নূতন পরিস্থিতি ভারতবর্ষে যে নূতন উত্তেজনার প্লাবন নিয়ে আসে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা 'খিলাফৎ আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য খিলাফত আন্দোলন সম্পর্কে কিছু ভূমিকা এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

খিলাফৎ আন্দোলন ও ভারতীয় মুসলিম সমাজ

'খালিফা' শব্দ থেকে 'খিলাফত' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। 'খালিফা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'উত্তরাধিকারী'। ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক সর্বজনমাননীয় হজরত মহম্মদ আল্লাহ্ বা পরমেশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতা ও শাসক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পয়গম্বরের কোন উত্তরাধিকারী থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু হজরত মহম্মদ শুধু যে আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন একাধারে আল্লাহ্‌র পয়গম্বর, ধর্মীয় প্রধান, রাষ্ট্রনেতা, বিধিবিধানের অধিকর্তা, ধর্মাধিকরণের অধ্যক্ষ ও সর্বোচ্চ সমরনায়ক। অতএব তাঁর অপরাপর পদের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্ন আসে। তিনি স্বয়ং কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নে কয়েকটি বিবদমান দলের উদ্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত হজরত মহম্মদের জামাতা হজরত আবুবকব তাঁর পরিবারের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে 'খালিফা' পদে নির্বাচিত হন। হজরত আবুবকরের তিরোধানের পর হজরত ওমর 'খালিফা' পদে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর পরবর্তী খালিফা হজরত ওস্‌মান (৬৪৪ থেকে ৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁর তিরোধান ঘটলে হজরত মহম্মদের তৃতীয়া কন্যা ফতিমার স্বামী হজরত আলি 'খালিফা'র পদ লাভ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অটোম্যান তুর্কীগণ কর্তৃক কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপল্ বিজিত হওয়ার পরে অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রধান হিসাবে তুর্কীর সুলতানগণই সারা ইস্‌লামিক দুনিয়ায় 'খালিফা' হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কীর সুলতানগণই ইস্‌লামিক দুনিয়ার 'খালিফা'র গৌরব বহন করে এসেছেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর পর ৯৮ জন 'খালিফা' ইস্‌লামের নেতৃত্ব করে এসেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুরস্ক জার্মান পক্ষে যোগদান করায় ভারতীয় মুসলমানগণ এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে মুসলিমসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক সেনানী

ও অফিসার ছিলেন, তা ছাড়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সর্বসম্প্রদায়ের ভারতীয়গণকে ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্যদলে ভর্তি করবার অভিযান চালানো হয়; অনেক মুসলিম যুবক সৈন্যদলে যোগদান করেন। ভারতীয় মুসলমানগণের সামনে এই প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় সৈন্যবাহিনীতে যোগদানকারী ভারতীয় মুসলমানগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে তুরস্কের মুসলিমভাইদের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করতে হবে। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন—ভারতীয় মুসলমানদের সহায়তায় ইংরেজরা অর্থাৎ 'মিত্রপক্ষ' যদি জয়লাভ করে তবে সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী পরাজিত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধান্তে তুর্কীসাম্রাজ্যের কি দশা হবে? মুসলমানগণের পবিত্র তীর্থস্থান সমূহ যা তৎকালে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলিরই বা কি দশা হবে? অতএব ভারতীয় মুসলমানদের তরফ থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দাবি করা হয় যে—যুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়ী হলে তুর্কীর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করা হবে না, তুর্কীর সুলতানের কোন প্রকার মর্যাদা হানি করা হবে না কিংবা মুসলমানের পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে তুর্কীর সুলতানের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন যে যুদ্ধান্তে তুর্কীসাম্রাজ্যের কোন অঙ্গহানি ঘটানো হবে না।

"Nor are we fighting to deprive Turkey of the rich and renowned lands of Asia Minor and Thrace which are predominantly Turkish in race."

কিন্তু যুদ্ধশেষে যখন যুদ্ধবিরতির সর্তসমূহ রচিত হল তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মুসলিম-সমাজের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি ছেঁড়াকাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করলেন। পরাজিত তুরস্কের উপরে চরমতম শাস্তি প্রযুক্ত হল। মিত্রপক্ষীয় শক্তিসমূহের সিদ্ধান্ত অনুসারে তুর্কীসাম্রাজ্য ভেঙে চুরে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হল। মুসলমানদের দাবি ছিল 'জাজারাতুল্ আরব' অর্থাৎ মেসোপোটেমিয়া, আরব রাজ্য (পবিত্র মক্কা মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থান সহ) সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন যেন তুর্কীর খালিফার অধিকারভুক্ত থাকে। ইংরেজরা এ দাবি মেনেও নিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যকালে থ্রেস (Thrace) দান করা হল গ্রীসকে, পবিত্র মক্কা, মদিনা ইত্যাদি তীর্থস্থান সহ আরব দেশকে তুর্কীসাম্রাজ্য থেকে ছেঁটে নিয়ে, 'হেজাজ' নামক এক নূতন রাজ্য গঠন করে সেটা ইংরেজের তাঁবেদার এক নূতন 'পুতুল রাজার' অধিকারভুক্ত করা হল। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এশীয় অঞ্চলগুলি 'ম্যান্ডেটের' ছদ্মনামে ইংরেজ ও ফরাসী এই দুজনায় নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিলেন। খাস তুর্কীর শাসনব্যবস্থার তদারকীর জন্য বিজয়ীপক্ষ তাঁদের নিজস্ব লোকদের নিয়ে এক 'হাই কমিশন' গঠন করলেন এবং তুর্কীর সুলতানকে কার্যত একজন 'বন্দী সুলতানে' পরিণত করা হল। তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল।

ইংরেজদের এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যাপারকে ভারতীয় মুসলমানগণ 'নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা' ও ইচ্ছাকৃত রূপে ইস্‌লামের 'মর্যাদাহানি' বলে বর্ণনা করতে লাগলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় ফেটে পড়লেন ভারতের মুসলিম সমাজ। ইংরেজকৃত এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিকারের জন্য শীঘ্রই সারাভারতে নূতন এক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো। এই আন্দোলনই 'খিলাফৎ আন্দোলন' নামে পরিচিত।

খিলাফৎ আন্দোলন প্রথম থেকেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলন রূপে অগ্রসর হতে

থাকে। ইংরেজের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী হিন্দুরাও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধীজী সর্বান্তকরণে এই আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ান এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দও নির্দ্ধিধায় গান্ধীজীকে আন্দোলনের নেতার আসন প্রদান করেন। গান্ধীজী ১০ই মার্চ ১৯২০ এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রে গান্ধীজী বলেন যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মর্মস্থলে ইংরেজ সরকার যে আঘাত হেনেছেন তাঁর প্রতিকার অর্জন করবার সুষ্ঠুতম পন্থা হচ্ছে 'অহিংস অসহযোগ'। গান্ধীজী বলেন ঃ

"Noncooperation is therefore the only remedy open to us. It is the clearest remedy as it is the most effective, when it is absolutely free from violence. It becomes a duty when cooperation means degradation or humiliation, or an injury to one's cherished religious sentiment."[৪]

ভারতসরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'India 1920' নামক বার্ষিক বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"There was no doubt that Gandhi's advocacy of soulforce commanded itself to a populace who shared his religious belief, and believed in the doctrine of self-abnegation and admired his asceticism. He stood as a 'rock of salvation' before the injured national pride of many of his countrymen."[৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'অহিংস অসহযোগের' প্রস্তাব গান্ধীজী প্রথমে ঘোষণা করলেন খিলাফৎ আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে। ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কর্মসূচী রূপে অসহযোগ-পদ্ধতির প্রয়োগের কথা তখনও তিনি প্রকাশ্যতঃ ঘোষণা করেন নাই।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে তুরস্ক সম্পর্কিত শান্তিচুক্তির শর্তগুলি চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় এবং পূর্বোক্ত অবমাননাকর ব্যবস্থাগুলি পুরাপুরি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ভারতীয় মুসলমানদের দাবি আশা ভরসা সমস্তই ধূলিসাৎ হয়। এর দুই সপ্তাহ পরে ২৮ শে মে তারিখে হান্টার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। হান্টার কমিশনের ভারতীয় সভ্যগণ ইংরেজ সভ্যগণের সাথে একমত হতে পারেন না। তাঁরা পৃথক মাইনরিটি রিপোর্টে সামরিক প্রশাসকদের ও সরকারি কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতার নিন্দা করেন। কিন্তু ইংরেজ সভ্যগণ যাঁরা কমিশনে সংখ্যাধিক্য লাভ করেছিলেন তাঁরা তাঁদের স্বজাতীয়গণের পাশবিক বর্বরতার অভিযোগগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত নরম ও পক্ষপাতিত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। ভারতসচিব মিঃ মন্টেগু নরপিশাচ জেনারেল ডায়ারের সমস্ত পৈশাচিকতা প্রকারান্তরে সমর্থন করেন।

"Mr. Montagu, however remarked that General Dyer had acted to the best of his lights and with a sincerity of purpose, but that he committed an error of judgement."[৬]

সারা বিশ্বের ধিক্কারের সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সরকার অবশ্য নরপশু ডায়ারকে তাঁর চাকুরী থেকে 'অব্যাহতি' দিলেন। কিন্তু ইংরেজ মহিলাগণ চাঁদা তুলে ডায়ারের কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে বিশ হাজার পাউন্ডের টাকার তোড়া উপহার দিলেন—এবং প্রকাশ্য সভায় তাঁকে

একখানি তরবারি উপহার দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করা হল! আবার অপরাধী কর্নেল জন্‌সন্‌কেও চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, ভারতে ব্যবসারত এক ইংরেজ কোম্পানী তাঁকে মোটা বেতনের চাকুরীতে নিযুক্ত করেন।

হান্টার কমিশনের রিপোর্ট ও তার সাথে ব্রিটিশ সরকারের নির্লজ্জ মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ভারতের মানুষ তাকে গ্রহণ করলো জাতীয় আত্মমর্যাদার চূড়ান্ত অবমাননা ও সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের চরমতম নিদর্শনরূপে। ক্রোধে, ক্ষোভে হতাশায় ভারতের জাতীয় মানস বারুদের স্তূপে পরিণত হল। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে দ্রুত গতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাসমূহ আবর্তিত হতে লাগলো।

৩০ শে মে (অর্থাৎ হান্টার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো বারানসীতে। দক্ষ সেনাপতির মতই গান্ধীজী জাতীয় মানসের এই অগ্নিগর্ভ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন শুষ্ক তৃণপুঞ্জে অগ্নিসংযোগ করবার সময় এসেছে, শুধু একটি ক্ষুদ্র অগ্নিশিখার স্পর্শে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে। গণ-আন্দোলনের হাওয়া—সেই আগুনকে ছড়িয়ে দেবে দেশের সর্বস্তরে—সকল প্রান্তে। ইতঃপূর্বে তিনি খিলাফত আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে যে অহিংস অসহযোগের কার্যক্রম প্রকাশ করেছিলেন এবারে সেই কর্মসূচী তুলে ধরলেন জাতীয় কংগ্রেসের সামনে—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কর্মসূচী হিসাবে। জাতীয় মানস আশায় উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। দুই দিন পরে অর্থাৎ ২রা জুন—এলাহাবাদের হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের মিলিত সমাবেশে জাতীয় স্বাধীনতার দাবির ভিত্তিতে অসহযোগ কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদিত হল। ৯ই সেপ্টেম্বর—কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান—সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে) পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসলো। ১১ই সেপ্টেম্বর অহিংস অসহযোগের কর্মসূচী অনুমোদন করে ও ঐ কর্মসূচীকে অবিলম্বে কার্যকর করবার জন্য আহ্বান জানিয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত হয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে।

যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এতদিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্যকে প্রতিহত করছিল তা যেন কোন এক যাদু দন্ডের স্পর্শে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুর্বুদ্ধিকে দৃপ্তপদতলে পিষ্ট করে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জয়যাত্রা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের যে ব্যাপক ও ঐকান্তিক সংহতি দৃষ্ট হয়েছে ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অসহযোগ যুগের আগে বা পরে আর কোন সময়েই উভয় সম্প্রদায়ের তদ্রূপ নিবিড় সহযাত্রিত্ব পরিলক্ষিত হয় নাই। রাউলাট-বিল-বিরোধী আন্দোলনের সময়েই গান্ধীজী লক্ষ্য করেছিলেন যে ইংরেজের অবিচার ও পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির চিত্তে যে ক্ষোভ ও ক্রোধের আগুণ প্রজ্বলিত করেছিল সে আগুণে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বীজগুলি প্রায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই ভেদাভেদ ভুলিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে দাঁড় করায়। কে হিন্দু কে মুসলমান এ প্রশ্ন বিস্মৃতির আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে নেমেছিলেন

হিন্দু-মুসলমান একই আসর থেকে একে অপরের স্কন্ধ স্পর্শ করে আপন আপন প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। হিন্দুর ধর্মীয় উৎসবে মুসলমানেরা এবং মুসলমানের ধর্মীয় উৎসবে হিন্দুরা দলে দলে আমন্ত্রিত হয়েছেন। মুসলমানেরা দল বেঁধে এসে দিল্লীর কংগ্রেসনেতা (আর্যসমাজী) স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লীর জামা মসজিদে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রার্থনাসভায় যোগদানের জন্য টেনে নিয়ে গিয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরে একই মঞ্চ থেকে মৌলানা অবদুল মজিদ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যথাক্রমে পবিত্র কোরান্ ও বেদ থেকে মানবতাবাদী মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রার্থনা করেছেন। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান প্রার্থনায় যোগদান করেছে। যেন এক অপূর্ব যাদু দন্ডের স্পর্শে এক প্রবল ঝটিকা এসে মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সব বিষ, সকল কলুষ উড়িয়ে নিয়ে গেল।

শুধু যে উপরতলার বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবর্গ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন তাই নয়, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষক এবং কারিগর প্রভৃতি মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মেহনতী মানুষেরা বিপুল সংখ্যায় আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। ত্যাগ ও দুঃখবরণের ব্যাপারেও তাঁরা পিছিয়ে থাকেন নি। এই আন্দোলনে যে সহস্র সহস্র মুক্তিসংগ্রামী কারাবরণ করেছেন, লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন সম্পত্তি হারিয়েছেন ও আরও নানাভাবে দৈহিক ক্লেশ ও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেছেন তাঁদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা স্বল্প ছিল না। নাগপুর কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার পর হাজারে হাজারে সাধারণ মানুষ (হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর) কংগ্রেসের সভ্য হয়েছেন। 'স্বদেশী সভা' হচ্ছে জানতে পারলে দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান গামছায় চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে বিশ মাইল হেঁটে এসে সভায় যোগদান করেছেন। যাঁরা ইতঃপূর্বে শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা বলে গণ্য হতেন, নূতন অবস্থায় তাঁরা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের তুল্য রূপ শ্রদ্ধাভাজন জাতীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয় এবং তার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু এই আন্দোলন যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রচলিত ধারায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এলো, এ সত্য অনস্বীকার্য। অসহযোগ আন্দোলনই সর্বপ্রথম জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে এই বিশাল উপমহাদেশের সকল প্রান্তে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। এর আগে মুক্তিসংগ্রামের সাথে সাধারণ মানুষের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হত উকীল-সভা, বণিক-সভা প্রভৃতি মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে। অপরিহার্য পরিস্থিতির তাগিদেই 'বৈপ্লবিক স্বাধীনতাসংগ্রাম' (revolutionary freedom struggle)-এর কর্মিরা গুপ্ত কর্মধারা (secretive work process) অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মধারার সাথে সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাব সংযুক্ত করা যায় না। তাই ১৯২০ সাল পর্যন্ত সাধারণ মানুষেরা বহুলাংশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্বেও সংগ্রামের আঙ্গিনায় সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। দূর থেকে মাঝে মাঝে সংগ্রামের দু-চারটি চকমপ্রদ খবর তাদের কানে এসে পৌঁছাতো—তারা জান্তো 'বাবুরা' ইংরেজকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। এটা যে তাদেরও সংগ্রাম - এ বোধ তাদের মনে উদগত করবার মত কোন কর্মপন্থা

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতা ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আন্দোলনের অবদান

ছিল না। গান্ধীজী 'অহিংস অসহযোগের' কর্মধারার মধ্য দিয়ে এমন এক নূতন রণকৌশল জাতির সমক্ষে উপস্থিত করলেন, যার মাধ্যমে উচ্চতল প্রাসাদবাসী থেকে শুরু করে পর্ণকুটীরের দীনতম অধিবাসী—এমন কি বৃক্ষতলাশ্রয়ী ভিখারীও সমান মর্যাদায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে; এবং ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গ হিসাবে যতগুলি গণ-আন্দোলন (mass movement) ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তার সবগুলিতেই বিপুল সংখ্যায় সাধারণ মানুষ অর্থাৎ মেহনতকারী গণ শ্রেণী (toiling masses) যোগদান করেছেন এবং অপরিমিত ত্যাগ, সাহস ও দুঃখবরণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অভিযানের একটি ধারা ছিল নিছক 'নিয়মতান্ত্রিক' (Constitutional), অপর ধারাটি ছিল 'বৈপ্লবিক' (revolutionary)। এই দুটি কর্মধারা ছিল পরস্পরবিরোধী। একের সাথে অপরের সংযুক্তি সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু অহিংস অসহযোগের কর্মধারা জাতির সম্মুখে যে নূতন রণকৌশল উদঘাটিত করলো তার মধ্যে 'নিয়মতান্ত্রিক বিবেক' ও 'বিপ্লবী বিবেক'—উভয়কেই কতকাংশে সন্তুষ্ট করবার মত উপাদান ছিল। অহিংসা (non-violence বা দৈহিক বলপ্রয়োগ বর্জন) নিয়মতান্ত্রিক বিবেককে বহুলাংশে সন্তুষ্ট করেছিল (substantially satisfied the constitutional conscience)। এবং 'অসহযোগ' (অর্থাৎ non-cooperation বা সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সর্বপ্রকার সহযোগিতা পরিত্যাগ) বিপ্লবী বিবেককে বহুল পরিমাণে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল (could substantially satisfy the revolutionary consceince)। তার ফলে এই উভয় গোষ্ঠী থেকেই প্রচুর সংখ্যক লোক অসহযোগ আন্দোলনের একই মঞ্চে একত্র সমবেত হতে পেরেছিলেন। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে অসহযোগ একটি নঞর্থক কর্মসূচি ছিল না। অসহযোগ বলতে নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধ বুঝায় না। অসহযোগ কর্মপন্থা একটি প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ (active confrontation) মূলক কর্মপন্থা। আফিস, আদালত, আইনসভা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিগুলিকে অচল করে দেওয়া ও ন্যায়বিগর্হিত আইন ও আদেশসমূহ প্রকাশ্যভাবে অমান্য করে দন্ড বরণ করা। পিকেটিং-এর মাধ্যমে মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতির বিক্রয় বন্ধ করে সরকারের রাজস্বের ঘাটতি ঘটানো। বিদেশী বস্ত্র বয়কট করে ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থে আঘাত হানা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কর্মসূচি অসহযোগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কর্মসূচী ব্যপকভাবে প্রযুক্ত হলে পরিণামে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের অস্ত্রগুলিও ভোঁতা হয়ে যায়—প্রতিরোধকারীকে দন্ডদান করেও প্রতিরোধের শক্তিকে খর্ব করা যায় না—বরং তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকে।

গান্ধীজীর কাছে অহিংসা হয়ত ছিল তাঁর ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংসা বলতে তিনি দৈহিক বলপ্রয়োগবর্জিত সক্রিয় প্রতিরোধকেই লক্ষ্য করেছিলেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন ঃ

"Nonviolence in its dynamic conditions,means conscious suffering.It does not mean meek submission to the will of the evil doer,but it means the putting of ones whole soul against the will of the tyrant."[১]

রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংস সংগ্রাম যে নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধ নয় সে কথাও তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দেই স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

"I reject the word 'passive resistance' for its insufficiency and its being interpreted as a weapon of the weak."[৮]

অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

"For instance,the Government of the day has passed a law which is applicable to me. I do not like it .If by using violence I force the Government to repeal the law I am employing what may be termed as body force.But, if I do not obey the law and accept the penalty for its breach,I use soul force.It involves sacrifice of self."[৯]

অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তৃতি যেমন কাশ্মীর থেকে কুমারিকা এবং পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগকে গ্রাস করে ফেলে তেমনি সে বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের মত ত্বরিত গতিতে। সে উন্মাদনার বর্ণনা দিতে হলে শুধু বিষয়ান্তরের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করলেই তাকে সার্থকভাবে বোঝানো যায় ঃ

আয় আয় আয় ডাকিতেছি সবে
আসিতেছে সবে ছুটে
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার
ভেঙ্গে বাহিরায় সব পরিবার
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে॥

অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় মানস থেকে শাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে ভয় ও অনুচিত সম্ভ্রমবোধের বাষ্পপুঞ্জকে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত করে। রাজভক্তির যে শিকড়গুলো দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় মানসে জালবিস্তার করেছিল—অসহযোগ আন্দোলন তাকে সমূলে উৎপাটিত করে দিল (the last roots of loyalty were cut off from the nation's mind)। আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধে অভিষিক্ত এক নূতন ভারত সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২১ সালের *প্রবাসী* পত্রিকায় একটি কবিতায় লিখলেন ঃ

নন্‌কো-বাদের শঙ্খ হঠাৎ
উঠলো বেজে ভারত গগন ব্যেপে
তিরিশ কোটীর নমিত শির—-
সোজা হল দাঁতে অধর চেপে॥

দেশময় ত্যাগ ও দুঃখবরণের বন্যাস্রোত, প্রলয়ঝড়ের গতিবেগ আত্মস্থ করে সুবিশাল উপমহাদেশের সর্বপ্রান্তকে প্লাবিত করলো অতিশয় স্বল্পকালের মধ্যে। সত্যেন দত্তের ভাষায়—'ত্যাগের প্লাবন উপ্‌চে গেল ভেসে'। অসহযোগ কংগ্রেসের সাংগঠনিক স্তরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এলো। প্রথমত, কংগ্রেসকে শিক্ষিতমধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর রেলিং ঘেরা কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে তাকে আপামর সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতাসংগ্রামের সর্বক্ষণের সৈনিকরূপে এমন একদল একনিষ্ঠ স্বাধীনতাসেবী সৃষ্টি করলো যাঁরা জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে শহরে গ্রামে গঞ্জে কংগ্রেসের কেন্দ্র

স্থাপন করে যুদ্ধের বিরতিপর্বে নিরন্তর দীপশিখা জ্বালিয়ে বসে থেকেছেন আত্মসুখে উদাসীন ও তপস্যারত মুনিঋষির মত। এর ফলে পরবর্তী গণআন্দোলনগুলির সময়ে দেখা গিয়েছে যে আজ যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আন্দোলনের ডাক দেন, তাহলে আগামী কাল প্রভাতেই সারাভারত আন্দোলনে উদ্বেল হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের পরিপূর্ণ গুণগত রূপান্তর (total qualitative change) ঘটিয়ে দিল। মিহি সুরের নিয়মতান্ত্রিক আবেদন নিবেদনের যুগ বিস্মৃতির অস্তসাগরে বিলীন হয়ে গেল।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতা সম্পর্কে ২/৪ টি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে। মন্টেগু চেম্সফোর্ড রির্ফমস্ পরিকল্পনা অনুসারে আইনসভাসমূহ গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯২০-এর নভেম্বরে। যাঁরা নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন, কলকাতার স্পেশাল কংগ্রেসের নির্দেশ মান্য করে তাঁহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রার্থীরা সকলেই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। ফলে রায়বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, নবাব, নাইট প্রভৃতি ইংরেজর অনুগ্রহজীবীরা অনেক ক্ষেত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। জাতীয় মানসের উত্তেজনা ঐ সময়ে কোন্ স্তরে পৌঁছেছিল তা বুঝাবার জন্য বঙ্গ দেশের দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ত্রিপুরা জেলার অমুসলমান নির্বাচকমন্ডলী থেকে জনৈক রায় বাহাদুরের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে স্থানীয় জনসাধারণ রসিক নামক এক জুতা সেলাইকারীকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থীরূপে খাড়া করে দেয়। সেই প্রার্থী—অর্থাৎ যিনি রাস্তায় বসে জুতা সেলাই করতেন সেই রসিক চন্দ্র চর্মকার, তাঁর ইংরেজভক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। নোয়াখালী জেলার মুসলিম আসনে অনুরূপভাবে এক ইংরেজভক্ত প্রার্থীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন একজন গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান। বিপুল সংখ্যায় স্কুল কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সরকার পরিচালিত ও সরকার অনুমোদিত স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এঁদের জন্য দেশে অনেকগুলি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন', বিহারে 'বিহার বিদ্যাপীঠ', বারানসীতে 'কাশী বিদ্যাপীঠ', বোম্বাই প্রদেশে 'মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ' ও 'করাচী বিদ্যাপীঠ, গুজরাটে 'গুজরাট বিদ্যাপীঠ', লাহোরে 'পাঞ্জাব জাতীয় বিদ্যালয়', আলিগড়ে 'জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়'—ইত্যাদি বহু সংখ্যক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশে দুটি ন্যাশনাল কলেজ—(কলিকাতা জাতীয় মহাবিদ্যালয় ও ঢাকা জাতীয় মহাবিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুল পর্যায়ে সারা বাংলায় আড়াই শতরও অধিক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ-উপাধিপ্রাপ্ত বহুতর ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উপাধি বর্জন করেন। সারা ভারতে সংখ্যাহীন আইনজীবী আদালত বর্জন করেন। এদের মধ্যে বিভিন্ন হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীদের থেকে শুরু করে জেলা আদালত ও মহকুমা আদালতের খ্যাতনামা উকীলগণও ছিলেন।

আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, মাসিক পাঁচ, সাত, দশ, বিশ হাজার টাকার উপার্জনের পথ পরিত্যাগ করে যাঁরা সংগ্রামের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ালেন, শুধু বিত্তের মোহ পরিত্যাগের মধ্যেই তাঁদের ত্যাগ সীমাবদ্ধ থাকলো না। অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে যাঁরা ওকালতী, অধ্যাপনা, সরকারি চাকুরী প্রভৃতি পরিত্যাগ করে আন্দোলনে যোগদান করেন, তাঁদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি (living style) সম্পূর্ণ বদল হয়ে গেল। তাঁরা সাধারণ

দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মত জীবনযাপন করেছেন। অনেকে সর্বত্যাগী তপস্বীর জীবন বরণ করে নিয়েছেন।

১৯২১-এর ডিসেম্বরে ইংলন্ডের যুবরাজ ভারতে আসেন। কংগ্রেস নির্দেশ ঘোষণা করে—যুবরাজের অভ্যর্থনাসূচক সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান বয়কট করবার। আরও নির্দেশ থাকে যে যুবরাজ যে দিন যে শহরে পৌঁছোবেন সে দিন সেই সহরে হরতাল হবে। সরকার থেকে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের ও নিখিলভারত খিলাফৎ কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনসমূহকে বে-আইনী সংস্থা (Unlawful Association) বলে ঘোষণা করে। সর্বপ্রকার সভা সমিতি ও পিকেটিং নিষিদ্ধ করেও আদেশ প্রচারিত হয়। এই সব আদেশ অমান্য করে সহস্র সহস্র নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার বরণ করেন। মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাস, ভি.জে. প্যাটেল, লাজপত রায়, ডঃ সফিউদ্দিন কিচ্‌লু, ডঃ আন্‌সারী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে হাজারে হাজারে সাধারণ মানুষ কারাবরণ করে। ভারতবর্ষে সব জেলখানা পূর্ণ হয়ে যায়। শেষে, জেলে আর স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়—কংগ্রেসকর্মীদেরকে এক স্থান থেকে গ্রেপ্তার করে অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। জেলের ভয় বলে কিছু আর অবশিষ্ট রইল না। সত্যেন দত্তের ভাষায়—"তীর্থ হল বন্দিশালা—শিকল অলঙ্কার"।

যে সকল ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক লেখক অসহযোগ আন্দোলনের বিরূপ সমালোচনা করেছেন, কিংবা তাকে ছোট করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা প্রায়শ আন্দোলনের বাইরের লোক—অনেকেরই এই আন্দোলনের সাথে কোন প্রকার সংযোগ বা এমন কি স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খন্ড পুস্তকে এই ব্যাপক ও বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে অসহযোগ আন্দোলনের সবই 'ব্যর্থ হইয়াছিল'। তাঁর প্রদত্ত বিবরণীতে বিস্তর তথ্যগত ভুল আছে। (যেমন তিনি বলেছেন—১৭ই নভেম্বর যুবরাজের ভারত-আগমনের দিন বোম্বাইয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। তার "প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গান্ধীজী বারদৌলি নামক স্থানে আইন অমান্য স্থগিত রাখিলেন"। কিংবা আলিভ্রাতৃদ্বয় "অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে" ......দন্ডিত হয়েছিলেন। কিংবা—দেখিয়েছেন যে স্বরাজ্যদল ও কংগ্রেস দুটি পৃথক দল ছিল—এবং "বাংলাদেশের প্রায় সকল কংগ্রেস নেতা স্বরাজ্যদলে যোগ দিলেন"। এই সকল উক্তির কোনটিই সত্য নয়। ডঃ মজুমদারের মতে পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রামের কোন কর্মসূচী যদি দেশের শতকরা ১০০ জন পালন না করে তা হলেই সংগ্রাম ব্যর্থ হয়।

ভারতের মত সুবিশাল দেশে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' বলতে একসময়ের কোন একটি মাত্র আক্রমণকে বুঝায় না। এক আঘাতেই শত্রু ধরাশায়ী হবে— এই প্রত্যাশা নিয়ে কোন দেশে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম' (National Liberation Struggle) পরিচালিত হয় না। জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক সংগ্রাম (long and continued struggle) হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ থেকে। তার পর নানা ধারায় সে সংগ্রাম নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। বলপ্রয়োগবর্জিত ব্যাপক গণপ্রতিরোধের ধারাটি প্রবর্তিত হয় ১৯২০ সালে। তার পর ১৯২৭ এর 'সাইমন কমিশন' বয়কট আন্দোলন, ১৯৩০-৩১-এর

ও ১৯৩২-৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৪২-৪৫ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সে সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। পাশাপাশি সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মধারাও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। নানা নদীস্রোত যেমন সমুদ্রে এসে মেশে তেমনি নানা ধারায় প্রবাহিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মকান্ড জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের বিশাল সমুদ্রে এসে একাকার হয়ে যায়। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে যেমন বিরতির কাল (periods of respite), ও পরবর্তী আঘাতের জন্য প্রস্তুতির কাল (period of preparatory activities for the next thrust) থাকে, স্বাধীনতার যুদ্ধেও মাঝে মাঝে বিরতি (respite), মাঝে মাঝে রণকৌশলগত আপাতঃনিষ্ক্রিয়তা (stratagic passivity), রণকৌশলের অঙ্গ হিসাবে পিছু হটা (tactical backward march) এ সব থাকবে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম আঘাতে স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই বলে সে আন্দোলন 'ব্যর্থ' হয়েছিল—এ জাতীয় উক্তি জাতীয় সংগ্রামের চরিত্র ও কৌশল সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞতার গর্ভ থেকে প্রসূত ও অশ্রদ্ধেয়।

কোন এক কাঠুরিয়া যখন একটি বিশাল বটবৃক্ষ ছেদনের কাজ হাতে লয়, তখন সেই ছেদনকর্ম সে ২/৪ দিনে সম্পন্ন করতে পারে না। তার কুঠারের প্রতি আঘাতেই বটবৃক্ষের কতকাংশ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এই ভাবে বৃক্ষের কান্ডের বহুলাংশ যখন কাটা হয়ে গেছে তখনও বটবৃক্ষ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েই থাকে। কাঠুরিয়া নিজে এবং তার নিকটের লোকেরা বুঝতে পারে বৃক্ষের কত অংশ কর্তিত হয়েছে। দূরের লোকেরা মনে করে কই, কিছুই ত হয় নাই, বটগাছ ত আগের মতই খাড়া আছে। তারপর শেষ আঘাতে বৃক্ষ যখন ধরাশায়ী হয়, তখন দূরের লোকেরা ভুল করে মনে করে—ঐ শেষ আঘাতটিই বুঝি বৃক্ষের পতনের কারণ, আগের আঘাতগুলি সব ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? প্রকৃত কথা এই, বৃক্ষ ভূপতিত হয়েছে সবগুলি আঘাতের সামগ্রিক ফল স্বরূপে। প্রতিটি আঘাতই তাকে ভূপতনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে যাঁরা দূরে অবস্থান করেছেন, তাঁদের দৃষ্টি ও বোধ এই প্রকারই অপ্রকৃত। আন্দোলনের পর আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিশাল মহীরুহের মূলদেশে ক্রমাগত আঘাত হেনে তাকে ভূপতনেয় দিকে ক্রমাগতরূপে অগ্রসর করেছে। দূরের লোকেরা ভেবেছেন সবগুলি আন্দোলনই ব্যর্থ হয়েছে—এবং সাম্রাজ্যবাদের পতনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী আঘাত—অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজের আঘাতকেই বৃক্ষের মূলোচ্ছেদের একমাত্র কারণ বলে বিবেচনা করেছেন। এরূপ বিবেচনা বিভ্রান্তিকর ও অবান্তর।

অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা সত্য যে এই সংহতি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মুস্তাফা কামালপাশা ক্ষমতায় আসীন হওয়া মাত্র তিনি 'খিলাফৎ' নামক প্রাচীন সংস্থিতির (Institution-এর) বিলুপ্তি ঘোষণা করেন এবং শেষ 'খালিফা'কে তুরস্ক থেকে বহিষ্কৃত করেন। তখন আর মুসলমানদের কাছে 'খিলাফৎ'-এর কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকলো না। কিছুদিন পর থেকেই কংগ্রেসী মুসলমানেরা একে একে জাতীয়তাবাদী মঞ্চ পরিত্যাগ করে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করতে সুরু করেন। মুসলিম সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্ম পুনরায় কর্মতৎপর হয়ে ওঠে এবং উত্তরোত্তর তার বলবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

কেন এমন হল? স্বাধীনতার সংগ্রামের মুসলমানদের সহযোগিতা আকর্ষণ করতে গিয়ে আমরা কি কিছু কিছু ভুলত্রুটি করেছি?

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে খিলাফতের ইসুকে (issue) জাতীয় স্বাধীনতার দাবির সাথে যুক্ত করে গান্ধীজী ভুল করেছিলেন কিনা। ১৯২০ সালের স্পেশাল কংগ্রেসে গান্ধীজী জাতীয় দাবি সম্পর্কিত যে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার প্রথম অনুচ্ছেদটি রচিত হয়েছিল নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

"In view of the fact that on the Khilafat question, both the Indian and Imperial governments have signally failed in their duty to the Muslim of India and the Prime Minister has deliberately broken the pledged word given to them and that it is the duty of every non-muslim Indian in every legitimate manner to assist his Muslim brother in his attempt to remove the religious calamity that has over taken them."

অতঃপর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পাঞ্জাবের নৃশংসতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তার পর তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"The Congress is of opinion that there can be no contentment in India without redress of the two aforesaid wrongs and that the only effectual means to vindicate national honour and to prevent a repetition of similar wrongs in future is the establishment of swarajya."[১০]

অতঃপর প্রস্তাবের শেষাংশে স্বরাজ্যের দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভের সিদ্ধান্ত ও অসহযোগের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, খিলাফতের প্রশ্ন শুধু ভারতীয় মুসলমানগণের নিজস্ব প্রশ্ন নয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের ছিন্নভিন্নকরণ ও খালিফার মর্যাদাহানির প্রশ্ন মূলত তুরস্কের রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রশ্ন। তার সাথে জড়িয়ে থাকে সমগ্র ইস্‌লামিক জগতের অধিবাসীদের ধর্মীয় প্রশ্ন। ধর্মীয় প্রশ্নে, ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ মুস্‌লিম ভ্রাতৃবৃন্দের মনে আঘাত লাগলে, অমুসলমানেরা তাঁদের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন—এতে দোষের কিছু নাই, এটা করাই উচিত। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার দাবির সাথে তাকে যুক্ত করবার কারণ কী? যদি খিলাফতের প্রশ্নে ইংরেজরা সুষ্ঠু সমাধান করবার জন্য এগিয়ে আসতো, তা হলে কি আমরা 'স্বরাজ্য' দাবি করতাম না? এইভাবে জাতীয় স্বাধীনতার দাবির সাথে মুসলমানগণের ধর্মীয় প্রশ্নকে একাকার করে ফেলার দ্বারা আমরা কি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানকারী বিপুল সংখ্যক মুসলমানের মানসিকতাকে খণ্ডিত করণের সহায়তা করলাম না? তাঁরা যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন, সেটা প্রধানত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে? না, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উদ্দেশ্যে? তাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন? না, খিলাফতের মর্যাদা উদ্ধারের জন্য লড়াই করছেন? বলা বাহুল্য বহুতর কংগ্রেসী মুসলমানের মানস এ ব্যাপারে পরিষ্কার ছিল না। কেউ মনে করেছেন ধর্মের জন্য লড়াই করছেন, কেউ ভেবেছেন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন। ফলে খিলাফত যখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল, তখন স্বাধীনতার দাবির প্রতি তাঁদের আর কোন

আকর্ষণ থাকলো না। আধুনিক যুগে রাজনীতির সাথে আনুষ্ঠানিক ধর্মকে জড়িয়ে ফেললে তার ফল শুভ হয় না। এক্ষেত্রে হয় নাই।

অবশ্য, গান্ধীজী হয়ত মনে করেছিলেন খিলাফতের প্রশ্নে মুসলিম মানস ব্যাপকভাবে উত্তপ্ত হয়েছে। সুতরাং খিলাফতের ইস্যুটিকে জাতীয় দাবির অন্তর্ভুক্ত করলে জাতীয়মুক্তি সংগ্রামে অতি সহজেই মুসলমানগণের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা অর্জন করা যাবে। হয়ত তাঁর অনুমান বাস্তববুদ্ধিসম্মত ছিল। হয়ত তাঁর আশাও প্রচুর পরিমাণে সফলও হয়েছিল। কিন্তু আশু ফল উৎসাহজনক হলেও শেষ ফল ভাল হয় নাই।

কংগ্রেস কর্তৃক সরকারিভাবে অনুমোদিত না হলেও আন্দোলনের মধ্যে এমন কতকগুলি আচরণ পদ্ধতি অনুপ্রবিষ্ট হয় যা হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রদায়গত ভেদকে স্পষ্ট করে তোলে। আন্দোলন উপলক্ষে বহু সহস্র সভা সমাবেশ মিছিল ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভা মিছিল ইত্যাদিতে রণধ্বনি বা battle cry হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লা-হো-আকবর' উভয় ধ্বনিই উচ্চারিত হত—যদিও হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ঐ দুটি ধ্বনিই উচ্চারণ করতেন। কিন্তু একপ্রকার অলিখিত নিয়ম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে 'বন্দেমাতরম্' বললেই সাথে সাথে 'আল্লা-হো-আকবর'ও বলতে হবে। 'আল্লা-হো-আকবর' মুসলমানগণের ধর্মীয় ধ্বনি। 'বন্দেমাতরম্'-এর সাথে হিন্দুধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। আন্দোলনে কোনদিন হিন্দুদের কোন ধর্মীয় ধ্বনি উচ্চারিত হয়নি। হিন্দুরা যদি 'হর হর ব্যোম ব্যোম' বা ঐ জাতীয় কোন ধ্বনি দিতেন তা হলে পাশাপাশি 'আল্লা-হো-আকবর' উচ্চারিত হওয়ার প্রশ্ন আসতো। হিন্দুর কোন পূজার্চনায় বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। ওখানে 'মাতরম্' শব্দে যে দেশমাতৃকাকেই লক্ষ্য করা হয়েছে—বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মধ্যেই সে কথা বলা আছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে ধর্মীয় শ্লোগান অবশ্য বর্জনীয়। ঐ ভাবে দুটি রণধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে 'বন্দেমাতরম্' মুসলমানের ধ্বনি নয়। হিন্দুরা 'আল্লা-হো-আকবর' বলছে বলেই মুসলমানেরা তার বিনিময়ে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করছে। একসাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে নেমে প্রতি কার্যে ভাগাভাগিকেই প্রাধান্য দেওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। যদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্বনি উচ্চারণে মুসলমানদের আপত্তি হত, তা হলে বাংলা, হিন্দী, ফার্সী বা উর্দু ভাষায় একটি 'ধ্বনি' রচনা করে নেওয়া উচিত ছিল—যেমন নেতাজী 'জয়হিন্দ্' ধ্বনি রচনা করেছিলেন। আমরা সকলে ভারতবাসী—ভারতমাতার মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছি—এই চিন্তাই সর্বত্র প্রকট হওয়া উচিত। ভাগাভাগির ব্যাপারটা সামনে তুলে ধরলে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরে। সকল জনসভার শুরুতে 'গীতাপাঠ' ও 'কোরাণ পাঠের' একটা অর্থহীন রেওয়াজও ঐ যুগে প্রচলিত ছিল। 'গীতা' বা 'কোরাণ' যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের অসীম শ্রদ্ধাসম্পৃক্ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলেও—জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে ঐরূপ ধর্মগ্রন্থ পাঠের কোন প্রাসঙ্গীকতা থাকতে পারে না। এই প্রথাও সাম্প্রদায়িক ভেদকে সামনে তুলে ধরেছে। ধর্মকে সব সময়েই রাজনীতি থেকে দূরে রাখা উচিত।

অসহযোগের প্রবল প্লাবন সারা ভারত প্লাবিত করেছিল। প্রাকৃতিক নিয়মেই জোয়ারের পর ভাঁটা আসতে বাধ্য। ১৯২৩ থেকে ভাঁটার টান শুরু হয়। আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হয়ে

আসে। চার বছর বিরতির পরে ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনবিক্ষোভ আবার রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

সূত্র নির্দেশ

১। Dr. Pattavi Sitaramaiya, *History of Indian National Congress*, vol. 1, p.168.
২। *Op. cit.*, p. 169
৩। *Op. cit.*, p.170
৪। *Op. cit.*, p.191
৫। *Op. cit.*, p. 192
৬। *Op. cit.*, p. 193
৭। M. K. Gandhi. *Young India*, Dated 11.8.1920
৮। *Op. cit.*, dated 12.5.1920
৯। M. K. Gandhi, *Hind Swaraj or Homerule*, p. 45
১০। Dr. Pattavi Sitaramaiya, *History of Indian National Congress*, p.202

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জাতীয়-সংগ্রামে ভাঁটার টান— সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থান

পূর্বে আমরা বলেছি যে বৃহদায়তন একটি দেশের 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম' দীর্ঘস্থায়ী ও ধারাবাহিক পৌনঃপুনিক আক্রমণের রূপ নিয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে রণকৌশলগত বিরতি (strategic passivity), এমন কি রণকৌশলের অঙ্গীভূত পশ্চাদপসরণ, কোনো অনুসৃয়মান কৌশলের সাময়িক পরিবর্তন, এগুলি সবই এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামধারার অঙ্গ। তাছাড়া 'ব্যাপক জনপ্রতিরোধ' (widespread mass resistance) এমন একটি রণকৌশল যা যুদ্ধকে আপামর সাধারণের গৃহাঙ্গন পর্যন্ত রণাঙ্গনকে প্রসারিত করে। সাধারণ দুস্থ মানুষ তার অপরিহার্য পারিবারিক দায়িত্বগুলিকে অগ্রাহ্য করে জাতীয় সংগ্রামের সৈনিক হয়ে রণাঙ্গনে ছুটে আসে। সেই জন্য এ যুদ্ধের এক একটি পর্যায়কে নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘদিন ধরে টেনে রাখা যায় না। কারণ যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ সৈনিক হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয় তাদের পারিবারিক দায়িত্বের পিছুটান থাকে। সুতরাং এ ধরণের যুদ্ধের অগ্রগতি ঘটে নদীর ঢেউয়ের প্রকৃতি অনুসরণ করে। প্রত্যেকটি ঢেউ তর তর করে ঊর্দ্ধে ওঠে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছোনোর পরে তার অবরোহনের পালা শুরু হয় তখন ঢেউটি নিম্নগামী হয়ে একেবারে নীচুতে নেমে আসে—তারপর আবার উর্দ্ধারোহণ ও নিম্নারোহণ—এই পদ্ধতিতে নদীর ঢেউগুলি এগিয়ে চলে। ব্যাপক গণসংগ্রামের অগ্রগতিও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছোনো পর্যন্ত পৌনঃপুনিক আরোহ ও অবরোহ এ যুদ্ধের ক্রমায়ত গতির অঙ্গ।

১৯২১-এর আগস্ট থেকে ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 'অসহযোগ' পর্যায়ভুক্ত জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের উর্দ্ধারোহণ পর্বের চূড়ান্তকাল। অনেক সমালোচক বলেছেন যে ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা নামক একটি গ্রামে থানা ঘেরাও করে থানার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ২২জন পুলিশ কর্মচারীকে পুড়িয়ে মারবার ঘটনায় ভীত হয়ে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং গান্ধীজীর এই অনুচিত সিদ্ধান্তের জন্যই অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটে। ব্যাপারটি যা ঘটেছিল সংক্ষেপে তা বিবৃত করছি। অসহযোগ আন্দোলনে চূড়ান্ত কর্মসূচী ছিল 'গণ-আইন অমান্য' (Mass Civil Disobedience)। প্রথমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ও সভা-সমিতি ও পিকেটিং ইত্যাদির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা অমান্যের মধ্য দিয়ে 'জেল ভর্তি'র পর্ব সার্থক ভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কংগ্রেসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতা ও কর্মিগণ প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ হন। কিন্তু গভর্নমেন্ট গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলেন না। তখন সর্বপ্রকার

রাজকর প্রদান বন্ধ সহ ব্যাপকতর স্তরে আইন অমান্যের কর্মসূচী কার্যকর করবার জন্য আহমেদাবাদ কংগ্রেস (ডিসেম্বর ১৯২১) গান্ধীজীকে ঐরূপ আন্দোলন শুরু করবার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে 'কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক' (sole executive authority of the Congress) পদে নিযুক্ত করে। গান্ধীজী প্রথমত মাদ্রাজের গুন্টুর জেলার ১০০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি এলাকায় 'কর বন্ধ সহ আইন অমান্য' আন্দোলন শুরু করবার অনুকূলে অনুমতি প্রদান করেন। পরে তিনি স্বকীয় নেতৃত্বে গুজরাটের অন্তর্গত বারদৌলি তালুকে উক্ত প্রকার আন্দোলন শুরু করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৩১শে জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেসের তৎকালীন ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২২ তারিখে গান্ধীজী ভারতের বড়লাটের নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করেন এবং বলেন যে ঐ পত্র-প্রাপ্তির পর সাতদিনের মধ্যে বড়লাট যদি তাঁর দমনমূলক কর্মপন্থা পরিবর্তন করে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদান, সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতার পরিপন্থী সর্বপ্রকার দমনমূলক আদেশ প্রত্যাহার, এবং অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি দমনমূলক বিধিনিষেধ আরোপ না করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা না করেন, তবে তিনি এ সাতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বারদৌলি তালুকে অহিংস পন্থায় গণ-আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন।

কিন্তু এই সাতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ৫ই ফেব্রুয়ারী চৌরীচৌরা গ্রামের বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটে। গ্রামে একটি কংগ্রেসী মিছিল যাচ্ছিল, রাস্তা দিয়ে। রাস্তার পাশেই পুলিশ থানা—খড়ের ঘর। মিছিল থেকে কিছু লোক বেরিয়ে গিয়ে থানা ঘেরাও করে এবং থানার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে ২২ জন পুলিশ কর্মচারী পুড়ে মারা যায়।

এর পূর্বে ১৭ই নভেম্বর ১৯২১ তারিখে ইংলন্ডের যুবরাজ যেদিন ভারতে পৌঁছোল সেইদিন কংগ্রেস কর্তৃক ঘোষিত সর্বভারতীয় হরতালের পরিপ্রেক্ষিতে বোম্বাই শহরে জঘন্য সাম্প্রদায়িক হিংসার তান্ডব চলে কয়েকদিন ধরে এবং সেই তান্ডবে ৫৩ জন নিরাপরাধ মানুষ প্রাণ হারায় ও চারিশতের অধিক মানুষ আহত হয় ও বহুলোকের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। গান্ধীজী এই হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তখনই লিখেছিলেন 'Swaraj stuks in my nose'। ১৩ই জানুয়ারী ১৯২২, যুবরাজের মাদ্রাজে উপস্থিতির দিনে সেখানেও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় এবং হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। তার পর ২৩ দিনের মাথায় গুরুত্বপূর্ণ হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চৌরীচৌরায়। গান্ধীজী অনুভব করলেন তাঁর পরিকল্পিত গণসংগ্রামে যোগদানকারী জনসাধারণ বারে বারে নিয়মানুবর্তিতার (আন্দোলনের discipline-এর) বেড়া ভেঙ্গে আন্দোলনকে বিপথে চালিত করছে। কোন যুদ্ধে সৈনিকেরা যদি নিয়মানুবর্তিতার শর্তকে অগ্রাহ্য করে স্বেচ্ছাচারের পথে পুনঃপুনঃ পদক্ষেপ করে তবে সেই স্বেচ্ছাচারের ফল হয় সর্বনাশকর। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালেন এ অবস্থায় বারদৌলি তালুকে গণ-আইন অমান্য আরম্ভের কর্মসূচী আপাতত স্থগিত রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ওয়ার্কিং কমিটি ১২ই ফেব্রুয়ারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সর্বপ্রকার আইন অমান্য স্থগিত রাখবার। শুধু বর্দৌলি তালুকের পরিকল্পিত কর্মসূচীই যে স্থগিত রাখা হল তা নয়, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে সভাসমিতি বা মিছিল প্রভৃতি অনুষ্ঠানের যে সংগ্রামী কর্মসূচী তখন সারাদেশে প্রবহমান ছিল, তাও সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হল। শুধু বিদেশী বস্ত্র বিক্রয়ের

বিরুদ্ধে পিকেটিং চালু থাকবে—এই প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ওয়ার্কিং কমিটি। ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হল।

গান্ধীজীর প্রেরণায় গৃহীত এই সিদ্ধান্তের ফলে অনেক নেতা ও কর্মী তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পক্ষে ও বিপক্ষে উভয়দিকের মন্তব্যের সমর্থনে নানা প্রবল যুক্তি দেখানো হল। সে বিতর্ক এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। দুই পক্ষের যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট সারবত্তা ছিল। তবে একথা সত্য যে এই সিদ্ধান্তের পরেই অসহযোগ আন্দোলন ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। কোন কোন লেখক বলেছেন যে ঃ 'চৌরীচৌরার ঘটনার পরেই গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে নেন বা প্রত্যাহার করে নেন'—সে কথা ঠিক নয়। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে, বেলগাঁও কংগ্রেসে।

সুযোগ বুঝে ২৩শে মার্চ ইংরেজ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে। *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকায় তিনটি রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ১২৪(ক) ধারায় তাঁর বিচার হয় ও বিচারে তাঁর ছয় বৎসরের কারাদন্ড হয়। গান্ধীজী কারারুদ্ধ হওয়ার পরেই উচ্চস্তরের জাতীয় নেতৃবর্গ যাঁরা ১৯২১-এর অক্টোবর-নভেম্বরে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে একে একে মুক্তিলাভ করে বাইরে আসেন। গান্ধীজী কারাগারে, সুতরাং আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে নেতারা অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। জুন মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশন বসে। আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করা যায় কি না এই বিষয়ে তদন্ত করে অভিমত জ্ঞাপন করবার জন্য Civil Disobedience Enquiry Committee নামে এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এ. আই. সি. সি.-র ঐ অধিবেশনে কমিটির সভাপতি হলেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি হাকিম আজমল খাঁ। আর সদস্য ছিলেন ভিঠলভাই প্যাটেল, রাজগোপাল আচারী, মতিলাল নেহরু, ডাঃ আনসারী, শেঠ ছোটানি ও কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার। শেঠ ছোটানি অবশ্য কমিটির কোন সভায় যোগদান করেন নি। কিছুকাল পর কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা যায়, কমিটির সর্বসম্মত অভিমত এই যে ব্যাপক গণ-আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবার মত প্রস্তুতি দেশে নেই। তবে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আইন অমান্য যেমন সরকারি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে সভা, মিছিল ইত্যাদি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে কোন কোন প্রদেশে শুরু করা যায়। কিন্তু রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে কমিটির তিনজন সদস্য যথা, হাকিম আজমল খাঁ, ভি. জে. প্যাটেল ও মতিলাল নেহরু অভিমত প্রকাশ করেন যে অসহযোগের কর্মসূচীর মধ্য থেকে আইনসভা সমূহ বয়কটের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক ও দেশে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য সরকারি শাসনযন্ত্রকে বিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসীদেরকে আইনসভায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোক। অপর তিনজন সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন যে, পঞ্চবিধ বয়কট পূর্বের মতই বহাল থাকুক—আইনসভা বয়কট প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রচলিত কর্মসূচী

অসহযোগ আন্দোলনের ভাঁটারটান ও স্বরাজ্য দলের উদ্ভব

সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই। দুই পক্ষের প্রবল প্রচারে সারা ভারতের কংগ্রেস নেতা ও কংগ্রেস কর্মিগণ পরিবর্তনকামী (pro-changers) ও পরিবর্তনবিরোধী (no-changers) এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে বাইরে আসেন ও pro-changer পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২২-এর ডিসেম্বরে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গয়া কংগ্রেসে pro-changer-দের পক্ষ থেকে আইনসভা বয়কটের কর্মসূচী প্রত্যাহারের অনুকূলে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি না মঞ্জুর হয়। তার ফলে অধিবেশন শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপতির পদে ইস্তাফা দেন ও দেশবন্ধুকে সভাপতি ও মতিলাল নেহরুকে সম্পাদক করে 'কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ্য পার্টি' নামে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত একটি দল গঠনের বার্তা জানিয়ে উভয়ের স্বাক্ষরিত যুক্ত ইস্তাহার প্রচারিত হয়। এই দলের পক্ষে ঘোষণা করা হয় তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যেই থাকবেন। আইনসভায় প্রবেশের কর্মসূচী যাতে কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে সেই চেষ্টা করবেন। সুতরাং দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত কংগ্রেসে অবিরাম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে কংগ্রেসের সংগ্রামী কর্মসূচী অচল হয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বরে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত স্পেসাল কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, যে সকল কংগ্রেসকর্মী বিশ্বাস করেন যে আইনসভার মধ্যে সরকারবিরোধী সংগ্রাম চালানোর জন্য আইনসভায় প্রবেশ জাতির পক্ষে কল্যাণকর হবে, তাঁরা স্বরাজ্য দলের নাম দিয়ে আইনসভায় প্রবেশ করতে পারবেন। তদ্দরুণ তাঁরা শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হবেন না।

গান্ধীজী ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২৪-এর জানুয়ারী মাসে গুরুতর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হন এবং জেলের মধ্যেই কর্নেল ম্যাডক তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করেন। সারাদেশ তাঁর জীবন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকে। সরকার তাঁর অবশিষ্ট দণ্ডকাল মকুব করে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ তাঁকে মুক্তিদান করেন। গান্ধীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছুকাল বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে জুহু নামক স্থানে অবস্থান করেন। এদিকে তখন কংগ্রেস দুই গোষ্ঠীর পারস্পরিক কলহে প্রায় ছিন্ন ভিন্ন। মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু দাশ জুহুতে ছুটে গেলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর গান্ধীজী এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে গান্ধীজী বলেন যে তিনি নিজে স্বরাজ্যদলের নেতাদের যুক্তি সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। কিন্তু স্বরাজ্যদল যদি আইনসভাব ভিতরে শাসকসম্প্রদায়-বিরোধী সংগ্রামকে জোরদার করতে পারেন তবে সেটা দেশের পক্ষে মঙ্গলজকনই হবে। যাঁরা স্বরাজ্য দলের কর্মপন্থায় বিশ্বাস করেন না, তাঁদের উচিত গঠনমূলক কর্মপন্থায় আত্মনিয়োগ করা, কিন্তু তাঁদেব পক্ষে কোনক্রমেই স্বরাজ্যদলের বিরোধিতা কবা উচিত হবে না। গান্ধীজীর এই বিবৃতি পরোক্ষে স্বরাজ্যদলকে সহায়তা করে এবং কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব স্তিমিত হয়ে আসে।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই যে স্বরাজ্যদলের উদ্ভব ঘটেছিল এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। অসহযোগ আন্দোলনের গতিবেগ তখন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। আইনসভার মধ্যে পদে পদে সরকারি কাজে বাধাপ্রদান ও সরকারবিরোধী দৃপ্ত ভাষণ অসহযোগের ভাঁটার

যুগে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উত্তেজনাকে জীইয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্টরূপে সহায়ক হয়েছিল, এ সত্যও অনস্বীকার্য।

গান্ধীজীর পূর্বকথিত বিবৃতির পরে স্বরাজ্যদলের পক্ষ থেকে পণ্ডিত মতিলাল যে বিবৃতি প্রকাশ করেন। তার মধ্যে আইনসভার অভ্যন্তরে সংগ্রাম পরিচালনার কিছু কিছু কর্মসূচী প্রকাশ করা হয়। নেহরুজী বলেন : Within the Legislative Councils. we must continue :

আইনসভার অভ্যন্তরে সংগ্রাম

1. to throw out budgets unless and untill the system of government is attened in recognition of own rights or as a matter of settlement between the parliament and the people of this country.....

2. to throw out all proposals for legislative enactment by which the bureaucracy proposes to consolidate its power.....

3. to introduce all resolutions, measures and Bills which are necessary for the healthy growth of our national life and the consequent displacement of the bureaucracy.....

4. to follow a definite economic policy based on the same principles so as to prevent the drain of public wealth from India by checking all activities leading to exploitation.[১]

১৯২৪ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্যদল কেন্দ্রীয় আইনসভার ১০০টি নির্বাচনযোগ্য আসনের মধ্যে ৪৫টি আসন দখল করে অর্থাৎ ইউরোপীয়, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রিস্টান ইত্যাদির জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি বাদ দিলে যে নির্বাচনযোগ্য আসনগুলি থাকে তার গরিষ্ঠাংশ স্বরাজ্যদলের দখলে যায়। বাংলা ও মধ্যপ্রদেশেও অধিকাংশ নির্বাচনযোগ্য আসন স্বরাজ্যদল দখল করে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৩৯টি আসনের মধ্যে ২১টি দখল করে স্বরাজ্যদল—পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় অকংগ্রেসী জাতীয়তাবাদীদের সাথে একত্র হয়ে স্বরাজ্যদল পুনঃ পুনঃ সরকারপক্ষকে পরাজিত করতে থাকে। বঙ্গদেশে বৈপ্লবিক কার্য দমনের উদ্দেশ্যে লর্ড রীডিং ইতিমধ্যে কুখ্যাত 'বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী অর্ডিন্যান্স' (B. K. L. A. Ordinance) জারী করেছিলেন। মাদ্রাজের দোরিয়াস্বামী আয়েঙ্গার ঐ অর্ডিন্যান্স বাতিল করবার জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকারপক্ষের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐ প্রস্তাব ৫৮ বনাম ৪৫ ভোটে গৃহীত হয়। ভিঠলভাই প্যাটেল 'রাজবন্দী আইন'(State Prisoners Acts), 'রাজদ্রোহকর সভা-সমাবেশবিরোধী আইন'(Seditions Meetings Act) প্রভৃতি কতকগুলি দমনমূলক আইন বাতিলের প্রস্তাব করেন। সরকারপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এইভাবে একের পর এক প্রস্তাবে সরকাবপক্ষের পরাজয় ঘটতে থাকে মতিলাল নেহরু বড়লাটের পারিষদবর্গের (Executive Councillors-দের) ভ্রমণ ভাতা প্রদান বন্ধ করবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতেও সবকারপক্ষের পরাজয় ঘটে, ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ঐ সময়ে অবশ্য বড়লাট

ও প্রাদেশিক গভর্নরদের উপরে এই ক্ষমতা প্রদত্ত ছিল যে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইনসভায় কোন প্রস্তাব গৃহীত হলে বড়লাট বা গভর্নর 'ভেটো ক্ষমতা' (Veto power) প্রয়োগ করে ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দিতে পারতেন এবং আইনসভায় কোনো সরকারি প্রস্তাব না-মঞ্জুর হলে তাঁরা 'সার্টিফিকেশন ক্ষমতা' প্রয়োগ করে না-মঞ্জুর প্রস্তাবকে মঞ্জুর বলে ঘোষণা করতে পারতেন। স্বরাজ্যদল পুনঃ পুনঃ বড়লাট ও গভর্নরগণকে ঐরূপ অস্বাভাবিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য করে ভারতশাসন আইনের অসারতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পেরেছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯২৪ সালের B. C. L. A. Act (বিনাবিচারে বৈপ্লবিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণকে আটক রাখা সংক্রান্ত আইন) ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। গভর্নর লর্ড লিটন সার্টিফিকেশন ক্ষমতা প্রয়োগ করে পাশ না হওয়া আইনকে 'পাশ' বলে ঘোষণা করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত বাজেট পুনঃ পুনঃ অগ্রাহ্য হওয়ায় ও মধ্যে মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে মন্ত্রীদের অপসারণ ইত্যাদির ফলে পুনঃ পুনঃ শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দেয়। ফলে মাঝে মাঝেই সেখানে গভর্নরের নিজস্ব শাসন (মন্ত্রী বাদ দিয়ে) চালু করতে হয়। মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ অবস্থা ঘটে। সুতরাং ব্যাপক গণ আন্দোলনের সাময়িক বিরতির সময়ে আইনসভার অভ্যন্তরে সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের মানুষের মনে সংগ্রামী উত্তেজনাকে প্রবহমান রাখার ব্যাপারে স্বরাজ্যদলের অবদান অনস্বীকার্য। অবশ্য, শুধু ১৯২৪ সালের নির্বাচনেই স্বরাজ্যদলের নামে প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছিল। ঐ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে অসহযোগের কর্মসূচী প্রত্যাহৃত হওয়ায় আইনসভা বয়কট এমনিতেই উঠে গেল। পরবর্তী নির্বাচনসমূহে সোজাসুজি কংগ্রেসের নামেই নির্বাচনী সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৯২২ সালের শেষভাগে মুস্তাফা কামাল পাশা তুর্কীর সম্মান পুনরুদ্ধার করে তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ করেন ও তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'খিলাফৎ' নামক ধর্মীয় আন্দোলনের অবসান ঘোষণা করেন ও শেষ খালিফা, তুরস্কের শেষ সুলতানকে দেশ থেকে নির্বাসিত করেন। খিলাফতের বিলুপ্তি ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেও এক অশুভ পরিবর্তন নিয়ে এলো। অসহযোগ আন্দোলনে দেশের স্বাধীনতার ও খিলাফতের এ দুটি প্রশ্নকে একসাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই খিলাফতের বিলুপ্তি যখন তুর্কীর রাষ্ট্রপ্রধানের হাত দিয়েই ঘটে গেল, তখন ভারতীয় মুসলমানদের কাছে খিলাফতের আর কোন প্রাসঙ্গিকতা রইলো না। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও ইংরেজ শাসকবর্গের অনুগ্রহজীবী তথাকথিত লীডারগণ, যাঁরা আন্দোলনের সময়ে ঘরে দুয়ার এঁটে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকেছেন, তাঁরা আবার প্রকাশ্য রাজনীতির আসরে এসে ভীড় জমাতে শুরু করালেন। 'কংগ্রেসী' মুসলিম জননায়কদের গোষ্ঠীতেও ভাঙন ধরলো। 'খিলাফতের' প্রশ্ন যখন এমনিতেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল, তখন অনেক মুসলিম জননায়ক যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি অনুরক্তিও বিলুপ্ত হল। কংগ্রেসী মুসলমানেরা একে একে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মঞ্চে

আন্দোলনের গতিবেগ স্তিমিত হওয়ার ফলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী অশুভ শক্তি পুনরায় জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে এসে দাপাদাপি শুরু করে

গিয়ে যোগদান করলেন। পৃথক নির্বাচন প্রথা (the system of seperate electorate) প্রবর্তন করে চতুর ইংরেজরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটা স্থায়ী পৃথক মঞ্চ দেশের বুকের উপরে প্রোথিত করে রেখেছিল। অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার স্ব-সম্প্রদায়ের লোকদের ভোট আকর্ষণ করবার একটা কার্যকরী নির্বাচনী কৌশল হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজভক্ত সম্প্রদায় 'পাবলিক লাইফ্' থেকে প্রায় খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন। সুযোগ বুঝে তাঁরাও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চের বিপরীতে হিন্দুদের একটি সাম্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন—যদিও এঁরা কোনদিনই নির্বাচনে হিন্দু ভোট শিকারের অভিযানে সাফল্য অর্জন করতে পারেন নাই।

আইনসভার অভ্যন্তরে কংগ্রেসী রাজনীতিকগণের হাতে বারে বারে পর্যুদস্ত হয়ে ইংরেজ শাসকবর্গও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গকে পিছন থেকে মদত দিতে সুরু করলেন। Mr. Broomsfield লিখেছেন ঃ

"The British Government had given sufficient inducements to obtain Muslim support; however, this would not be of any political advantage unless the community had sufficient unity and political organisation to ensure the election to the Legislative Council of representatives who would vote consistently with the Government. ....In the later half of 1925 the Government decided to take a hand in this work of organisation."[২]

লর্ড লীটন দেখলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উত্তপ্ত করে তোলাই বিদেশী রাজশক্তির সম্মান ও সিংহাসন বাঁচানোর একমাত্র পথ। ইতোমধ্যে জাতীয়তাবাদী মহল থেকে চিরাচরিত প্রথায় মুসলিম সম্প্রদায়ের অতিশয়িত সাম্প্রদায়িক দাবিগুলির কতকাংশ স্বীকার করে নিয়ে তার ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে হিন্দু-মুসলমানের একটা সমঝোতা গড়ে তোলার প্রয়াস চলেছিল। বঙ্গদেশে ১৯২৪-এর নির্বাচনের পূর্বেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু-মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক চুক্তি-নামা প্রস্তুত করেন। ১৯২৪-এর জুন মাসে সিরাজগঞ্জে মৌলানা আক্রাম খাঁ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সমক্ষে দেশবন্ধু ঐ চুক্তি-নামা অনুমোদনের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। প্রতিনিধিবর্গের একাংশের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশবন্ধুর অপরিসীম ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, রাজনৈতিক প্রভাব ও জনপ্রিয়তার ফলে সম্মেলনে ঐ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় অর্থাৎ বঙ্গীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঐ চুক্তি-নামায় অনুমোদন জানানো হয়। ঐ স্থানেই হিন্দু মহাসভা তাঁদের প্রাদেশিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। সেখানে চুক্তি-নামার নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৫-এর আমলের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নেতৃত্বে ঐ একই সময়ে, একই শহরে পৃথক মণ্ডপে একটি মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনেও 'চুক্তি-নামার শর্তগুলি মুসলিম স্বার্থরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়'—এই মন্তব্য সহকারে চুক্তি-নামাকে নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানগণ উভয়পক্ষই পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকে চুক্তি-নামা অগ্রাহ্য করেন। এই চুক্তি-নামাটি রাজনৈতিক সাহিত্যে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত।

হিন্দু-মুসলমান সমঝোতার প্রয়াস ও 'বেঙ্গল প্যাক্ট'

বেঙ্গল প্যাক্টের প্রধান শর্তগুলি নিম্নরূপ ছিল ঃ

(ক) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে মুসলমানগণ পৃথক নির্বাচন প্রথার (অর্থাৎ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটাবগণের ভোটের মাধ্যমে) মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে মুসলিম প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

(খ) স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে (অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতিতে) সর্বত্র সেই সেই এলাকার গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য মোট আসনের ৬০ শতাংশ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েব জন্য ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

(গ) বঙ্গদেশের সমস্ত সরকারি চাকুরীর শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমানগণের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যতদিন পর্যন্ত মুসলমান সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা পূর্বোক্ত আনুপাতিক হারে না পৌঁছোয়, ততদিন পর্যন্ত নূতন চাকুরিয়া নিয়োগের সময়ে শতকরা ৮০ ভাগ নিয়োগ হবে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের মধ্য থেকে।

(ঘ) আইনসভায় কোন প্রস্তাব বা আইনের খসড়ায় (Bill-এ) যদি এমন কিছু থাকে যা কোনো এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধিবিধানের সাথে জড়িত, তবে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সভ্যগণের মধ্য থেকে শতকরা ৭৫ ভাগ সভ্যের সমর্থন ব্যতীত সেই প্রস্তাব বা Bill পাশ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না।

(ঙ) হিন্দুরা কোন সময়েই কোন মসজিদের সামনে কোনো প্রকার বাজনা বাজাতে পারবেন না এবং গো-বধের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। দেখা যাচ্ছে যে কয়েকটি শর্ত হিন্দুদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে ভোটাধিক্যে ঐ চুক্তি-নামা অনুমোদিত হয়। কিন্তু হিন্দু সম্মেলন ও মুসলিম সম্মেলন উভয়েই চুক্তি-নামার বিরধিতা করেন। হিন্দুরা বিরোধিতা করেন শর্তগুলি হিন্দুদের পক্ষে সর্বনাশক বলে। মুসলমানেরা প্যাক্ট অগ্রাহ্য করেন—শর্তগুলি মুসলিম স্বার্থরক্ষার পক্ষে 'যথেষ্ট নয়' বলে।

যাই হোক, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমঝোতার প্রয়াস দেখেই লর্ড লীটন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ইতঃপূর্বে বগুড়ার নবাব সাহেব নবাব আলি চৌধুরীকে সামনে এনে তিনি তাঁর সাম্প্রদায়িক ভেদ নীতির কৌশলকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। এখন তিনি বগুড়ার নবাবসাহেব নবাব আলি চৌধুরী অপেক্ষা দক্ষ অপর কোন মুসলিম নেতাকে সামনে এনে বঙ্গদেশে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্ল্যাটফর্মকে উত্তপ্ত করে তুলবার জন্য চেষ্টা শুরু করলেন এবং অচিরেই পেয়ে গেলেন উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাবান জননায়ক স্যার আবদুর রহিমকে। ব্রুমস্‌ফিল্ড লিখেছেন ঃ

সাম্প্রদায়িক বিরোধের দ্বারা রাজনৈতিক আসর উত্তপ্ত রাখার ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা

"From 1924 to 1926 the Government of Bengal used its powers to ensure that there was no such compromise in its province. Sir Abdur Rahim, a communalist to the core, called the pace and he was aided and abetted by shortsighted British officials. It was a shortsighted and impossible policy that led Bengal into grave trouble in 1926."[২]

স্যার আবদুর রহিম উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন সরকারি চাকুরীতে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। স্মরণ রাখা উচিত যে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের প্রতি ইংরেজদের অবিচারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মুসলিম মানস সাময়িকভাবে ইংরেজবিরোধী হয়ে ওঠে এবং তারপর থেকে প্রতিবৎসর একই স্থানে এবং একই সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটার টান শুরু হওয়ার পর ১৯২৪ সাল থেকে মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন পৃথকভাবে পৃথক স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়ার রীতি পুনঃ প্রবর্তিত হয়। স্যার আবদুর রহিম আলিগড়ের মুসলিম লীগ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে প্রকাশ্যে ইংরাজের সাথে মিত্রতা স্থাপন ও হিন্দুবিরোধিতার আহ্বান জানান। মিঃ ব্রুম্‌স্‌ফিল্ড স্যার আবদুর রহিমের ভাষণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ

"Speaking as president of A.I.M.L session at Aligarh he (Sir A. Rahim) told his community that time had come for an organised fight for Muslim rights. The political existence of the party was endangered by Hindu ambitions, he said, and the muslims must resist their achivement with every weapon available. The Hindus were a menace to the British and the Muslims alike. If the British would willingly concedes the Muslims just demands they would have the Muslims as their ally in the coming battle."[৪]

স্যার আবদুর রহিমের ভাষণের মধ্যে বিশ শতকের শুরু থেকে ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মৌলিক চরিত্রটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত। স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনীতির মঞ্চে বেশীর ভাগ সময়ে নেতৃত্ব করেছেন ইংরেজভক্ত ও ইংরেজের অনুগ্রহজীবী উচ্চবিত্ত মুসলমানগণ এবং ধর্মীয় গোড়ামির ধারক ও বাহক পুরোহিত শ্রেণী অর্থাৎ উলেমাগণ। তাঁদের চিরাচরিত নীতি ছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে অকুণ্ঠ সহায়তার মাধ্যমে ইংরেজদের অনুগ্রহ অর্জন ও সেই অনুগ্রহভাণ্ডের মধ্যে যা কিছু পাওয়া যায় তাই নিয়ে হিন্দুদের সাথে নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাওয়া। তাঁরা তাঁদের স্বদেশবাসী হিন্দু ভাইদের সাথে নিরন্তর লড়াই ও বিদেশী রাজশক্তির নিরন্তর আনুগত্য—এই দুই ভ্রান্ত নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

পূর্বোক্ত ভাষণদানের স্বল্পকাল পরেই ১৯২৬-এর জানুয়ারী মাসে একটি উপনির্বাচনের মাধ্যমে স্যার আবদুর রহিম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন।

সারা দেশে এবং বিশেষ করে বঙ্গদেশে, পরিষদীয় রাজনীতিতে এই সময়ে এক অশুভ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। স্বরাজ্যদলের হাতে পুনঃ পুনঃ পর্যুদস্ত হয়ে সরকারপক্ষ হিন্দুমুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষকে সক্রিয় সংঘর্ষে পরিণত করবার দিকে মনসংযোগ করেন। এই উপায়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদী প্রভাবের বাইরে নিয়ে গিয়ে ইংরেজভক্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের সাথে একজোট করবার প্রয়াসই এই সময়ে সরকারপক্ষের

প্রধানতম রণকৌশল হয়ে দাঁড়ায়। স্বরাজ্যদলের রাজনৈতিক কৌশল ছিল সম্ভবপর ক্ষেত্রে আইনসভাগুলিকে অচল করে দেওয়া (to work the councils from within) এবং অন্যত্র আইনসভার অভ্যন্তরে সরকারবিরোধিতাকে যতদূর সম্ভব তীব্র করে তোলা। তৎকালীন ঠুঁটো জগন্নাথ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে অথবা বাজেটের মন্ত্রীবেতন সংক্রান্ত দাবি ভোটাধিক্যে নাকচ করে দিয়ে মন্টেগু চেম্সফোর্ড শাসন সংস্কারের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। ১৯২১-২৩ বাংলায় দুজন হিন্দু মন্ত্রী (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি) ও একজন মুসলমান মন্ত্রী (নবাব নবাব আলি চৌধুরী) নিযুক্ত হন। ১৯২৪-এর নূতন আইনসভা গঠিত হলে মন্ত্রী নিযুক্ত হন ২ জন মুসলমান (ফজলুল হক্ ও আবদুল করিম গজ্নভী)। স্বরাজ্যদলের প্রভাবে মন্ত্রীদের বেতনের বাজেটবরাদ্দ ব্যবস্থাপক সভায় না-মঞ্জুর হয়। মন্ত্রিরা বিনা বেতনেই কাজ করতে থাকে। অতঃপর আসে অনাস্থা প্রস্তাব। অতএব মন্ত্রীরা আসনচ্যুত হন। স্বরাজ্য দলের রণকৌশল ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রয়াস। লিটন পিছন থেকে কলকাঠি ঘুরিয়ে স্বরাজ্যদলের এই কার্য্যকে হিন্দু-প্রভাবিত কংগ্রেসের মুসলিম বিরোধী অভিযানরূপে চিত্রিত করে সাম্প্রদায়িকতাবাদী উত্তেজনায় প্ররোচিত করেন। এদের প্রচারের মুল বক্তব্য ছিল আগের মন্ত্রীমণ্ডলী ছিল হিন্দুমন্ত্রীমণ্ডলী (Hindu Ministry), তখন হিন্দুরা মন্ত্রিদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি—এবারে মুসলিম মন্ত্রিমণ্ডলী (Muslim Ministry) গঠিত হওয়ায় হিন্দুরা তাকে বরখাস্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এইভাবে একটি রাজনৈতিক সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বরূপে প্রচার করে বাংলা দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন ছড়ানো হয়। গ্রামে গ্রামে মোল্লা, মৌলভী ও উলেমাদের বক্তৃতা, অত্যন্ত উত্তেজনাকর ভাষায় লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার ছাপিয়ে সর্বত্র বিলি করা ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে তীব্র করে তোলা হয়। এই সব ইস্তাহারে কুৎসিত ভাষায় জাতীয়তাবাদিদের নিন্দা করা হত। মুসলমানের অস্তিত্ব বিপন্ন বলে জিগীর তোলা এবং সম্মানিত পীর বা উলেমাদের নামাঙ্কিত এমন সব 'ফতোয়া' ছড়ানো হত যে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন যে কোন মুসলমানের পক্ষে 'হারাম্' ঃ যে সকল মুসলমান কংগ্রেসকে সমর্থন করবে তাদের সামাজিক বয়কটের, এমন কি তাদের 'জানাজা' (মৃত্যুর পরে সৎকার ইত্যাদি) পর্যন্ত বন্ধ করবার নির্দেশ থাকতো। অত্যন্ত সম্মানিত ধর্মীয় নেতা শাহ্ সুফী পীর মৌলানা আবুবকর সিদ্দিকীর নামাঙ্কিত করে এরূপ বহু সহস্র ইস্তাহার সর্বত্র ছড়ানো হয়। পীর সাহেব অবশ্য ঐরূপ ইস্তাহারের সাথে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। ঐ সময়ে পীর সাহেব ছিলেন জমিয়ত-উল্-উলেমা-ই-হিন্দের বঙ্গীয় শাখার সভাপতি। এই শাখার তৎকালীন সম্পাদক মৌলানা আক্সার-উদ্দিন আহম্মদ সংবাদপত্রে পত্র লিখে জানান যে পীর সাহেব ঐরূপ কোন ইস্তাহারে স্বাক্ষরদান করেন নাই। স্মরণ রাখা উচিত জমিয়ত-উল-উলমা-ই হিন্দ এবং মুসলিম লীগের বঙ্গীয় শাখা তখনও পর্যন্ত ছিল জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের দখলে। এই দুই সংস্থা সরকারি প্ররোচনার দ্বারা সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুষ্ট প্রচারণা সমর্থন করেন নাই। এইসব দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণার পিছনে যে লর্ড লিটনের হাত ছিল, বিদেশী লেখক ব্রুমস্ফিল্ডের চোখেও তা ধরা পড়েছে। তিনি লিখেছেন ঃ

"Backed by Lytton, the pro-Government Muslims chose to give a communal colour to Swaraj Party's nationalist politics. ....They made a great play of the fact that the Hindu-dominated Swaraj party was attempting to strike down a Muslim ministry. In reality this is a communal attack. They told their corelegionists that all muslims must unite to oppose the Hindus."[৫]

স্বরাজ্যদলের মুসলমান সভ্যদের মধ্যে কেউ কেউ এই সময়ে দলত্যাগ করেন।

১৯২৪ সাল থেকে প্রায় প্রতি বৎসর ভারতের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক হিংসার তান্ডবলীলা ঘটতে থাকে

যতদিন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবণতা ছিল ততদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় দেখা যায় নি। ১৯২১-এ দক্ষিণ ভারতের মালবার জেলায় মোপ্‌লা বিদ্রোহ প্রথমে ইংরেজবিরোধী বিদ্রোহরূপে শুরু হয়েছিল। কিন্তু কিছু দুষ্টুলোকের প্ররোচনায় শেষের দিকে ঐ বিদ্রোহ বিপথগামী হয়ে সাম্প্রদায়িক হিংসার তান্ডবে পর্যবসিত হয়। মালবার দক্ষিণ ভারতের একটি সমুদ্রোপকূলবর্তী জেলা। জলপথে বাণিজ্য করবার জন্য অতীতে আরব দেশবাসী যে সকল বণিক ভারতে আসতো তাদেরই কতকাংশ মালবারে স্থানীয় মেয়েদের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে এদেশে ঘর বাঁধতো। 'মোপ্‌লাগণ' সেই সব আরব বণিকদের বংশধর। এরা সাধারণতঃ একটু উগ্র ও হিংস্র প্রকৃতির লোক ছিল। ইংরেজবিরোধী বিদ্রোহ দমনে সরকারি তরফে যথেষ্ট হিংস্রতা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ইংরেজ কর্মচারীদের সাথে সাথে হিন্দু কর্মচারীদেরও নিয়োগ করা হয়-তারই ফলে মোপ্‌লা বিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক হিংসার পথে মোড় নেয়। এই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ ঘটে নি। কিন্তু ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাম্প্রদায়িক হিংসার অশুভ শক্তি ভারতের নানা অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯২৪ সালে নাগপুর, জব্বলপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, শাহজাহানপুর (সংযুক্ত প্রদেশ), গুল্‌বার্গা (হায়দারাবাদ) ও কোহাট (পশ্চিম-পাঞ্জাব —এই সব স্থানে সাম্প্রদায়িক হানাহানির আগুণ জ্বলে ওঠে। এর মধ্যে গুল্‌বার্গা ও কোহাটের হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ বীভৎসতায় আর সবগুলিকে ছাড়িয়ে যায়। গুলবার্গা দাঙ্গার পরে গান্ধী বেদনার্ত হয়ে তাঁর *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকায় 'Gulbarga gone mad' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কোহাটের দাঙ্গা এত ভয়ঙ্কর রূপ গ্রহণ করে যে স্পেশাল ট্রেনে করে ৪০০০ হিন্দু-অধিবাসীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কোহাট-দাঙ্গার বীভৎসতা গান্ধীজীকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। তিনি অনুভব করেন যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এটা তাঁর নিজের অপরাধ। তিনি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তর জন্য ২১ দিন অনশন করেন। কোহাট-দাঙ্গা ঘটে ১৯২৪-এর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। তার অব্যবহিত পরেই গান্ধীজী অনশন শুরু করেন।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্বাক্ষর বহন করছে। এই সময়ে কংগ্রেসের সংগ্রামী ভূমিকা ক্রমাগতরূপে হীনবল হয়ে আসছিল। ১৯২৪ থেকেই আইনসভার অভ্যন্তরে সরকার বিরোধী বক্তৃতা ও বাধাদানের কৌশলগুলিই (oppositional parliamentary activities) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কংগ্রেসী রাজনীতির

একমাত্র আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। চতুর ইংরেজ রাজনীতিকগণ এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে বিদ্রোহাত্মক কর্মপন্থা থেকে সরিয়ে এনে পরিষদীয় রাজনীতির নিয়মতান্ত্রিক ঘেরাটোপের মধ্যে জাতীয়তাবাদিদের সাথে একটা সমঝোতার দিকে অগ্রসর হতে প্রয়াসী হন।

ভারত সচিব লর্ড বার্কেন হেড্ বিলাতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বরাজ্য দলকে ভারতবর্ষে সবচেয়ে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল বলে প্রশংসা করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকার পক্ষীয় সদস্য স্যার বেসিলব্ল্যাকেট এক বক্তৃতায় স্বরাজ্য দল ও মতিলাল নেহরুকে প্রশংসা করেন ও তাঁরা যে সরকারের সাথে সহযোগিতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন এইরূপ ইঙ্গিত তাঁর বক্তৃতায় প্রকাশ পায়।[৬] ব্রিটিশ পক্ষের এই মনোভাবের এই নতুন গতিভঙ্গী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকেও প্রভাবিত করে। ১৯২৫-এর মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ফরিদপুর অধিবেশনের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে ভাষণ প্রদান করেন তা উপস্থিত প্রতিনিধি বর্গকে বিস্মিত করে। ডাঃ সীতারামাইয়ার ভাষায় ঃ

"At the same time, he was full of hope that he could effect a settlement with the British Government. ....His offer of cooperation on certain conditions was made at Faridpur under this psychology. While Gandhi believed that there was no change of heart. Das belived that there was. 'I see signs of real change everywhere'—said Das to a representative of the *Statesman*. I see signs of reconcilliation everywhere. The world is tried of conflicts, and I think. I see real desire for construction and consolidation."[৭]

ব্রুম্স্ফিল্ড লিখেছেন ঃ ১৯২৫-এর মার্চ মাসে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন ভবনে লর্ড লিটনের সাথে এক গোপন সাক্ষাতকার হয় এবং খুব সম্ভবতঃ বড়লাট লর্ড রীডিং-এর নির্দেশে লিটন দেশবন্ধুকে জানান্ যে তিনি যদি প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদের সাথে সম্পর্ক না রাখার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন, তা হলে বিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে ভারতবাসিদের অনুকূলে সুযোগ সুবিধা দান করতে পারেন। দেশবন্ধু ২৯শে মার্চ তারিখে তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদের' তীব্র নিন্দা করে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। ৩১শে মার্চ তারিখে ভারতসচিব লর্ড বার্কেন হেড্ বিলাতের হাউস অব্ কমন্স্-এ দেশবন্ধুর ঐ বিবৃতির প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বক্তৃতা করেন এবং ঘোষণা করেন যে ঐ বক্তৃতার ফলে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ উন্মোচিত হয়েছে (it has opened the way for consideration of future constitutional advance in India)।[৮]

তার পরেই ২রা মে দেশবন্ধুর ফরিদপুর বক্তৃতা। এই বক্তৃতার পূর্বে ৪ঠা এপ্রিল দেশবন্ধু এক বিবৃতিতে গভর্নমেন্টের কাছে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ব্যাপারে ব্রিটিশ মনোভাব ব্যক্ত করবার অনুরোধ জানান। কিন্তু ব্রিটিশ পক্ষ আর কোন উচ্চবাচ্য করেন না। ফরিদপুরের প্রাদেশিক সম্মেলনের পরেই দেশবন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ডাক্তারদেব উপদেশে দার্জিলিং যান। সেখানে ১৬ই জুন তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু জাতির পক্ষে একটি বৃহৎ দুর্ঘটনা। ঐ সময়ে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁর স্থান পূরণ করবার মত আর কেউ ছিলেন না।

১৯২৫/২৬ সাল আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এক তামসিকতাগ্রস্ত, ক্লান্তি ও অবসন্নতার ভারে ক্ষয়িতবল খণ্ডকালরূপে চিহ্নিত হতে পারে। স্বাধীনতামুখী জাতীয় উদ্যম এই সময়ে প্রায় অসাড়। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের বেগ স্তিমিত। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বেড়াজালে তখন বিপ্লবীদের মধ্যে রুই কাৎলা থেকে শুরু করে চুনোপুঁটি পর্যন্ত সকলেই ইংরেজের বন্দীশালায় শৃঙ্খলাবদ্ধ। তা ছাড়া কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার আঘাতে উত্তর ভারতের বৈপ্লবিক সংগঠনও প্রায় পর্যুদস্ত। এই দুই বৎসরের একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক ঘটনাও ঘটেছে জেলের মধ্যে। ঘটনাটি হল ১৯২৬-এর ২৮শে মে তারিখে আলিপুর জেলের মধ্যে গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জির হত্যা। অপরদিকে কংগ্রেসী কর্মকান্ডে তখন জাতীয় উদ্যমকে সক্রিয় করবার মত কোন পরিকল্পনা নেই। গান্ধীজী নিজেও যেন একেবারে দিশেহারা। তিনি পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, এবং হতশায় জর্জরিত হয়ে স্বরাজ্য দলের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করেছেন। ডাঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ

"Gandhi yielded more and more, and ultimately so much more that he effaced himself and made a complete surrender. Gandhi wrote in August (1925)—'I must no longer stand in the way of the Congress being developed and guided by the educated Indians, rather than by one like myself who was thrown in his lot entirely with the masses and who has fundamental differences with the mind of educated India as a body. I still want to act upon them, but not leading the Congress. The best way I can help them in that activity is by removing myself out of the way, and by concentrating myself solely upon constructive work with the help of the Congress and in its name, and that too, only so far as the educated Indians will permit me to do so."[১]

কিন্তু যে শিক্ষিত বর্গের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন, তাঁদের নিজেদের ঘরও তখন টলমল করছে। মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্যদলের অন্যতম নেতা মিঃ তাম্বে যিনি স্বরাজ্যদলের ভোটে জয়ী হয়ে মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হন, মধ্যপ্রদেশের গভর্নর তাঁকে শাসন পরিষদের সদস্যপদ (the post of a member of the Governor's Executive Council) গ্রহণে আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে Executive Councillor নিযুক্ত হন। ঐরূপে সরকারি পদ গ্রহণ তখন কংগ্রেসীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। স্বরাজ্যদলের সভাপতি মতিলাল নেহরু তাম্বে কর্তৃক শৃঙ্খলাভঙ্গের নিন্দা করে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন, ও তাম্বেকে দল থেকে বহিষ্কৃত করেন। তাম্বে ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীভুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীভুক্ত সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা খ্যাতনামা আইনবিদ এম. আর. জয়াকর ও এন. সি কেলকার মতিলাল নেহরুর কার্যকে নিন্দা করে বিবৃতি প্রকাশ করেন।

এই নিয়ে দুই পক্ষে বাগযুদ্ধ চলতে থাকে। পরিণামে মহারাষ্ট্রীয়ভুক্ত কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা কেলকার, জয়াকর, এম. এস. আনে, ডাঃ মুন্ধে, রাঘবেন্দ্র রাও প্রভৃতি কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাঁরা ইংরেজের সাথে 'আদান-প্রদানমূলক সহযোগিতায়' (Responsive cooperation-এ) বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর তাঁদের প্রভাবে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস ও স্বরাজ্যপার্টিতে ভাঙন ধরে এবং অনেক খ্যাতনামা নেতা ও কর্মী ইংরাজের সাথে সহযোগিতার পথ গ্রহণ করেন। তাঁরা সকলেই কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন। এঁদের 'আদান-প্রদান মূলক সহযোগিতা' এঁদেরকে এতদূর নিয়ে যায় যে এঁদের মধ্যে অন্যতম, রাঘবেন্দ্র রাও পরে প্রায় চার মাস কাল মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের অস্থায়ী গভর্নরের পদ অলঙ্কৃত করেন।

ডাঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ "The stone that began to glide down the hill of noncooperation nearly reached the bottom at Sabarmati early in 1926."[১০] (সবরমতীতে ১৯২৬-এর ২৫শে এপ্রিল তারিখে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে স্বরাজ্যদল ও মহারাষ্ট্রের Responsive cooperation বাদী গোষ্ঠীর এক আপোষ চুক্তি হয় যাতে বলা হয় যে কতকগুলি শর্ত যদি স্বীকার করে নেন, তবে স্বরাজ্যদল মণ্টেগু চেম্স ফোর্ড শাসন কাঠামোর অধীনে.ঠুঁঠো জগন্নাথ মন্ত্রীর পদও গ্রহণ করতে পারেন।)

জাতীয় স্বাধীনতামুখী সংগ্রামী কর্মধারা হৃতবেগ হলেই জাতীয় রাজনীতিতে অশুভ শক্তি সমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অতএব ১৯২৫-২৬ সালে মুসলমান রাজনীতিকগণ ব্যাপকহারে সাম্প্রদায়িকতাবাদের আসরে ভীড় জমাতে থাকেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ে মিঃ জিন্না—যিনি একদা দুর্দমনীয় চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তিনি সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির নায়ক হয়ে সামনে এসে দাঁড়ান। পাল্টা জবাব হিসাবে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদও মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে।

মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাব সাম্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চে যোগদান ঃ দেশে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি ঃ নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক হিংসাব তাণ্ডব

মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান উচ্চশিক্ষিত। আইন ও রাজনীতিতে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন। উচ্চবিত্ত সমাজে অতিশয় সম্মানিত একজন দক্ষ রাজনীতিক। তাঁর বাগ্মিতার খ্যাতিও ছিল সুদূরব্যাপী। পেশায় তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার। নেতৃত্বের গুণাবলী তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ১৯২০ সালের পূর্ববর্তী কংগ্রেসে তিনি প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী নেতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টে শ্রেষ্ঠ আইন ব্যবসায়ীদেব মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯২০ সালের পূর্বে অনেকেই আশা করতেন তিনি একদিন সর্বোচ্চ জাতীয় নেতার পদে আসীন হবেন। কিন্তু ১৯২০ সাল থেকেই কংগ্রেসের চরিত্রে, আদর্শে এবং সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো। ঐ সময়ে আইন ব্যবসায় এবং উচ্চবিত্ত সমাজের উপযোগী আভিজাত্যপূর্ণ জীবন ধারা বজায় রেখে কারও পক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। মিঃ জিন্না চার বৎসরকাল রাজনীতির মঞ্চ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে স্বেচ্ছাকৃত রাজনৈতিক নির্বাসন ভোগ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটা পড়বার পর তিনি রাজনৈতিক পুনর্বাসনের দিকে মনোনিবেশ করলেন। মিঃ জিন্না কোন

সংগঠনে পিছনের সারিতে অবস্থান করবার মত লোক ছিলেন না। সুতরাং গান্ধীজীর প্রভাবে প্রচন্ডরূপে প্রভাবিত কংগ্রেসে ঐ সময়ে তাঁর আর ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই নিজের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য তিনি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চকেই বেছে নিলেন। মিঃ জিন্নার সাম্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চে যোগদান জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতাদের দ্বারা পরিচালিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অপ্রত্যাশিত ও বিরাট জয়। ১৯২৪ এর নির্বাচনে মিঃ জিন্না নির্দল সদস্য হিসাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যপদ অধিকার করেন। (কারণ মুসলিম লীগ তখনও জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের দখলে।)

মুসলিম-সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অপচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু মহাসভার উদ্ভব ঘটে। অবশ্য হিন্দু মহাসভা মাঝারি ও মেহনতী হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ইংরেজের সমর্থক হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ১৯২০ সালের পরে যাঁরা বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক নির্বাসনে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁদের অনেকে ১৯২৫/২৬ থেকে সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে 'পাবলিক লাইফ' এ পুনঃপ্রবেশের পথ খুঁজে পেলেন। ঐ সময়ে কংগ্রেসপন্থীদের কোন সা প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না (পরবর্তীকালে ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তিত হয়)। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসপন্থী হিন্দুদের মধ্য থেকে যাঁরা হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পন্ডিত মদনমোহন মালব্য অবশ্য কিছু কাল হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তিনি সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন না। পন্ডিত মালব্য রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গী কখনও পরিত্যাগ করেন নি।

মুস্লিম সাম্প্রদায়িকতা-বাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দু মহাসভার অভ্যুত্থান

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর কুফল বীভৎসরূপে প্রকাশ পায় এক মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে। দিল্লীর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একজন প্রাচীন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। ১৯১৮ সালের দিল্লী কংগ্রেসের সময়ে তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ১৯১৯-এ পাঞ্জাবের পৈশাচিক তান্ডবের প্রতিবাদেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তিনি অসহযোগ আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী ছিলেন 'আর্যসমাজ' ভুক্ত সন্ন্যাসী। যে সকল হিন্দু এককালে ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে পুনরায় পিতৃপিতামহের সমাজে ফিরে আসতে পারেন—এটা ছিল আর্যসমাজের নীতি। এই নীতির বনিয়াদে তাঁরা 'শুদ্ধি-আন্দোলন' নামে এক আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। এতে মুসলমানগণ অত্যন্ত রুষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে এতে তাঁদের রোষের কোন কারণ ছিল না। মুসলমানেরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের ধর্মান্তরিত করবার স্বাধীনতা চিরদিনই দাবি করে এসেছেন এবং বরাবর তাঁরা সে অধিকার ভোগ করেছেন। মুসলমানেরা বহুতর হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছেন। ইংরেজ রাজত্বে খ্রিস্টানেরাও বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছেন। কেউ স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করতে চাইলে ভিন্ন ধর্মের লোকেরা তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ধর্মান্তরিত করতে পারেন। এই অধিকার হিন্দুরা অস্বীকার করেন নাই। গণতন্ত্রে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' (freedom

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা। মৌলানা মহম্মদ আলির পার্শ্ব পরিবর্তন

of religion) কথার অর্থই হচ্ছে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণের ও ধর্মান্তর গ্রহণের স্বাধীনতা। সুতরাং কোন হিন্দু যদি একবার ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হন তা হলে তিনি বা তাঁর কোন বংশধর আর কখনও ইচ্ছা করলেও আর কখনও হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে পারবে না—এই অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজপতিরাই চালু করেছিলেন। আর্যসমাজ হিন্দুদের মধ্য থেকে এই অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দিতে যত্নবান হয়েছিলেন। এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের রুষ্ট হওয়ার কোন কারণ ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আর্যসমাজভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন বলে শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের রোষ তাঁর উপরে পতিত হয়। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে শ্রদ্ধানন্দজী গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। ডাক্তারদের নিষেধে তাঁর ঘরে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে আব্দুল রাজি নামে এক যুবক একান্ত প্রয়োজনে স্বামীজীর সাথে দেখা করতে চায় বলে তাঁর কাছে এক রোকা পাঠায়। স্বামীজী তাঁকে তাঁর ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেন। যুবকটি তাঁর ঘরে প্রবেশ করে সেই বৃদ্ধ, নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় শায়িত সন্ন্যাসীকে গুলী করে হত্যা করে। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবর্গও শোক প্রকাশ করেন। এ ঘটনার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে দায়ী করা অযৌক্তিক। এটিকে একজন বিপথগামী যুবকের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই মনে করা উচিত।

মুসলমানেরা শুদ্ধি আন্দোলনের পাল্টা জবাব হিসাবে এবং লীগ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন

মৌলানা মহম্মদ আলি এই ঘটনার দিন দিল্লীতে ছিলেন না। দুদিন পরে দিল্লী ফিরে এসে, তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করে ধৃত ব্যক্তির জামিনের জন্য কেউ উদ্যোগী হয় নাই বলে মনোব্যথা প্রকাশ করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে মৌলানা মহম্মদ আলি সাম্প্রদায়িক হিংসার যাবতীয় দায়িত্ব হিন্দুদের উপরে আরোপ করে দিল্লী থেকে এক বিবৃতি প্রচার করেন। এতেই বোঝা যায় ১৯২৩ সালের কোকোনদ কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ আলি সাহেবের রাজনৈতিক তরণীর পালের হাওয়া বিপরীত দিকে বইতে শুরু করেছে। কিছুদিন পরে তিনি কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে মুসলিম সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে কলকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেস মনোনীত ডেপুটি মেয়র সরওয়ার্দি সাহেবও কংগ্রেস ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িকতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সরওয়ার্দি পরিবারের অপর বিজ্ঞ ব্যক্তি ডাঃ আব্দুল্লা সরওয়ার্দি (স্বরাজ্যদলভুক্ত কাউন্সিল সদস্য) স্বরাজ্যদল থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি দলের অনুমতি না নিয়ে বাংলার লাটবাহাদুরের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এজন্য গান্ধীজী তাঁর নিন্দা করেন। এতে তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে ডাঃ সরওয়ার্দি দলত্যাগ করেন।

১৯২৫ সালে দিল্লী, কলকাতা, এলাহাবাদ ও হায়দারাবাদ রাজ্যের ইখনাবাদ নামক স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে। ১৯২৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হিংসার তান্ডব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতঃপূর্বে এই বেদনাদায়ক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই হিংসার তান্ডব দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রথমে দীনু মিঞার মসজিদের সামনে দিয়ে আর্যসমাজীগণ

কর্তৃক বাদ্যভান্ডসহকারে মিছিল নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা শুরু হয়। প্রায় ৮/১০ দিন ধরে হিংসার তান্ডব চলে। তারপরে কয়েকদিনের বিরতির পর রাজরাজেশ্বরী পূজার প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয়। এবারেও ৮/১০ দিন চলে। দুইবারের দাঙ্গায় মোট ১১০ জন নিহত এবং ৯৭৮ জন ব্যক্তি আহত হয়। ১১০টি গৃহ দগ্ধ হয়। সীতারামাইয়া এই ঘটনাকে ১৯২৬-এর ভয়ঙ্করতম ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। এই দাঙ্গার সময়ে উভয়পক্ষ থেকেই ছোট ছোট ভুইফোড় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ও এই সব তথাকথিত সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুণে ইন্ধন যোগায়।

গান্ধীজী এই সময়ে দারুণ হতাশা ও মনোব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন। তাঁর চোখের সামনে তাঁরই ভক্তগণ মন্টেগু চেম্সফোর্ড শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। তাঁর চোখের সামনে তার প্রিয় মুসলিম সহকর্মীরা সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িকতার ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর' প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তিনি নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র, কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। ১৯২৬ এর পয়লা মে কলকাতার মির্জাপুর পার্ক (বর্তমানের শ্রদ্ধানন্দ পার্ক)-এ এক বক্তৃতায় তিনি তাঁর মনোব্যথা ব্যক্ত করেন, তিনি বলেন ঃ

"I have admitted my incompetence. I have admitted that I have been found wanting as a physician prescribing care for the malady. I do not find with Hindu or Muslim ready to accept my cure. I simply....content myself by saying that some day, we Hindus and Muslims will have to come together if we want the deliverence of our country. And if it is our lot that before we can come together we must shed each others blood, then I say, the sooner we do so, the better for us. We propose to break one another's head, let us do way, let us not shed crocodile tears let us do ask for sympathy from any quarter."[১১]

এ সুর চূড়ান্ত হতাশার। এর মধ্যে আছে অপ্রতিরোধ্য পরাজয়ের স্বীকৃতি।

সূত্র নির্দেশ

১। P. Sitaramayia, *History of Indian National Congress*, Vol. I, p. 272-73.

২। T. H Broomsfield, *Elite Conflict in a Plural Society—Twentieth Century Bengal*, Oxford University Press, Bombay, p. 27.

৩। *Op. cit.*, p. 274

৪। *Op. cit.*

৫। *Op. cit*

৬। P. Sitaramayia, *History of Indian National Congress*, Vol. I, p. 282.

৭। *Op. cit.*, p. 287.

৮। T. H. Broomsfield, *Elite Conflict in a Plural Society—Twentieth Century*

Bengal. Oxford University Press. Bombay.

৯। P. Sitaramayia, *History of Indian National Congress*, Vol. I. p. 285.

১০। *Op. cit.*

১১। *Op. cit.*, p. 298.

নবম পরিচ্ছেদ

প্রচুর হানাহানি—স্থায়ী সমাধানের ব্যর্থ প্রয়াস—সাইমন কমিশন

১৯২৭ সাল পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলে বিবেচিত হতে পারে। এই বছরে সাম্প্রদায়িকতাবাদিদের তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন প্রদেশে মোট ২৬টি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে। সংযুক্ত প্রদেশে ১০টি, বোম্বাইয়ে ছয়টি এবং পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও দিল্লী—এই পাঁচটি এলাকার প্রত্যেক এলাকায়

সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

দুটি করে সংঘর্ষ ঘটে —হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী হানাহানি ঘটে লাহোরে। ঘটনার উৎস ছিল 'রঙ্গিলা রসুল' শিরোনামায় একখানি পুস্তকের লেখক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী মোকর্দমায়, লাহোর হাইকোর্ট কর্তৃক আসামীগণের মুক্তিদানের আদেশ। পুস্তকখানিতে পয়গম্বর হজরত মোহম্মদের জীবন নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছিল যা মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক অত্যন্ত আপত্তিজনক বলে বিবেচিত হতে পারে। নিম্ন আদালতে আসামীগণের সাজা হয়। কিন্তু হাইকোর্টে বিচারপতি দলীপ সিং অভিমত প্রকাশ করেন যে লেখক পয়গম্বরের জীবনের ঘটনাগুলি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টির প্ররোচনা দান লেখকের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল না। হাইকোর্টের এই আদেশ মুসলিম সমাজে প্রচন্ড উত্তেজনার সঞ্চার করে তারই পরিণতিতে ৩রা মে থেকে ৭ই মে এই পাঁচ দিনের দাঙ্গায় ২৭ জন ব্যক্তি নিহত হয় এবং ২৭২ জন নানাভাবে জখম হয়। যে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোন মহাপুরুষের চরিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক কোন রচনা প্রকাশ থেকে ভিন্নধর্মীয় লেখক ও প্রকাশকদের বিরত থাকা উচিত। এখানে আইনের প্রশ্নের চেয়েও সামাজিক শান্তির প্রশ্নকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। লাহোর হাইকোর্ট প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করে অভিমত প্রকাশ করেন যে ঐ পুস্তকে লিখিত কোন উক্তি ভারতীয় দন্ডবিধির ১৫৩ক ধারার আওতায় আসে না। ঐ রায়প্রকাশের পর দাঙ্গা হয়। তখন প্রচলিত আইন সংশোধন করে ১৯২৭, ২৪শে আগস্টে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি নূতন সংশোধনী আইন (Insut to Religion Bill) পাশ করিয়ে নিয়ে পেনাল কোডের ঐ ধারাটি সংশোধন করা হয় এবং কোন সম্প্রদায়ের দ্বারা আচরিত ধর্মের বা তার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অবমাননাকর উক্তি দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়।

১১ই জুলাই পাঞ্জাবের মুলতানে মোহরম মিছিলকে কেন্দ্র করে এক শোচনীয় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে। ৬ জন ব্যক্তি নিহত হয় এবং ১১ জন আহত হয়। ২রা আগস্ট বিহারের বেতিয়া শহরে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে ৮ ব্যক্তি নিহত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর নাগপুরে

কয়েকজন উৎসাহী মুসলমান ১৯২৪ সালে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত জনৈক মুসলিম যুবকের মৃত্যুর স্মরণদিবস পালনের জন্য এক মিছিল বাহির করেন। এই মিছিলকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক হানাহানি বেধে ওঠে। দাঙ্গায় ২২ জন প্রাণ হারান এবং ১০০ জন আহত হন। ১০ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই প্রদেশের সোলাপুরে এবং ১১ই সেপ্টেম্বর এই প্রদেশের আহম্মদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সোলাপুরে ৫ ব্যক্তি নিহত হয়।

এর আগে এই বছরের ২রা মার্চ বরিশাল জেলার পাটুয়াখালি থানার অন্তর্গত পোনাবালিয়ায় একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। হিন্দুরা প্রতি বৎসর যে রাস্তা দিয়ে দোলযাত্রার মিছিল নিয়ে যেতেন, মুসলমানেরা অকস্মাৎ সেই রাস্তার ধারে একটি মসজিদ স্থাপন করেন এবং হিন্দুদের ধর্মীয় মিছিল ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে না বলে জিদ্ করেন। হিন্দুরা আইনের শরণাপন্ন হন। আদালত চিরাচরিত প্রথার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং মিছিলে বাধাদান নিষিদ্ধ করে আদেশ প্রচার করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্ল্যান্ডির নেতৃত্বে এক পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায় শান্তিরক্ষার জন্য। সেখানে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মুসলমানেরা হিন্দুদের মিছিলে বাধা দিলে গোলমাল বাধে। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে, ম্যাজিস্ট্রেট উ২৬ৃঙ্খল জনতাকে বশে আনতে না পেরে গুলী চালনার আদেশ দেন। পুলিশের গুলীতে দশ জন মুসলমান প্রাণ হারান। রাইফেলের গুলিতে এমন একজন গ্রামবাসী নিরপরাধ মুসলমান গৃহস্থ নিহত হন, যিনি নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খা২ি৬লেন—কোন প্রকার অবৈধ জনতার সাথে যাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। ২৯শে আগস্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় সংযুক্ত প্রদেশের বেরিলীতে। বহুতর হতাহত হয়।

২৯শে আগস্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় উদ্বোধনী ভাষণে বড়লাট লর্ড আরউইন্ উল্লেখ করেন যে—"বিগত ১৮ মাসে নানাস্থানের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ২৫০ জন, এবং আহত হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার মানুষ।" সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে উভয় সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা স্থায়ী মীমাংসার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সিমলায় এক ইউনিটি কনফারেন্সে সমবেত হন। কয়েকদিন ধরে আলোচনা চলে। কিন্তু কতকগুলি মামুলী ফর্মুলার পুনরালোচনা ছাড়া সম্মেলনের কাজ আর বেশীদূর অগ্রসর হয় না। কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবে পুরানো কথাগুলোই নূতন করে বলা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ভিন্ন ধর্মীরা মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্যভান্ডসহকারে মিছিল নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু মুসলমানদের নামাজের জন্য যে সকল সময় নির্দিষ্ট আছে সেই সকল সময়ে বাজনা ও হট্টগোল বন্ধ করতে হবে এবং মুসলমানদের বিরক্তি উৎপাদিত হতে পারে এমন কোন আচরণ করবে না। অপরদিকে একথাও বলা হয় যে মুসলমানগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে গো-কোরবানি ও খাদ্যের জন্য গো-জবাই করতে পারবেন কিন্তু হিন্দু মন্দিরের নিকটবর্তী কোন স্থানে কিংবা প্রকাশ্যস্থানে বা হিন্দুদের চোখের সামনে গো-বধ করা চলবে না।

এগুলি অবশ্য পুরাতন ফর্মুলা। এই সব ফর্মুলা দিয়ে কখনও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা প্রতিরোধ করা যায় নাই। এই সকল ফর্মুলা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে কারও আপত্তি থাকা উচিত নয়। হিন্দু-মুসলমান যত দাঙ্গা হয়েছে, তা যে সর্বত্রই ধর্মীয় কারণে হয়েছে এমন

নয়। অনেকস্থলে গোবধ, বা মসজিদের সামনে বাজনা এইরূপ কিছু উত্তেজক অছিলা থেকে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছে কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তার মূলসূত্র ছিল অন্যত্র নিহিত। ধর্মীয় বোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে কোন ব্যক্তি প্রতিশোধাত্মক নরঘাতনে লিপ্ত হবে এটা অবিশ্বাস্য। যারা দাঙ্গায়লিপ্ত হয়, তারা প্রায়শঃ কোন ধর্মের ধার ধারে না, ধর্মীয় জীবনযাপনে তারা অভ্যস্তও নয়। ধর্মের মুখোস পরে যে হিংসাত্মক উন্মত্ততা সময়ে সময়ে বহুজনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে সেখানে অন্ধ স্বাজাত্যাভিমান অনেক সময়ে মানুষকে বিপথে চালিত করে। কিন্তু ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানির পেছনে চিরকালই শক্তি যুগিয়েছে কিছু কুচক্রী ভাগ্যান্বেষী লোকের ব্যক্তি স্বার্থের বা রাজনৈতিক স্বার্থের তাগিদে। তারা উন্মাদনা প্রবণ নির্বোধ সাধারণ মানুষকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে আপন উদ্দেশ্য সাধন করেছে পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে। আর তৃতীয়পক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসকজাতি তাদের আপন স্বার্থে বিকৃত ভেদবুদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। গো-বধ, বা মসজিদের সামনে বাজনা যাই হোক না কেন সেগুলি সচরাচর এমন ব্যাপার যে একটু সহনশীলতা, একটু ধৈর্য, বিপক্ষদলের শুভবুদ্ধির কাছে একটুখানি যুক্তিপূর্ণ আবেদন এর দ্বারাই বহুক্ষেত্রে দুঃখজনক ঘটনার প্রতিরোধ সম্ভব হয়। অথচ মানুষের মধ্যে সেই প্রবণতা সৃষ্টির জন্য সক্রিয় প্রয়াস গ্রহণ না করে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত, মার্জিতরুচি নেতৃবর্গ উপরতলায় 'ইউনিটি কনফারেন্স' ইত্যাদির মাধ্যমে বারে বারে যে চেষ্টা করেছেন—তা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হয়েছে—তৎসত্ত্বেও তাঁরা নূতন কার্যকরী পন্থার উদ্ভাবনে প্রয়াসী হন্ নাই। উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের এই ব্যর্থতা যেমন শোচনীয়, তেমনই বিস্ময়কর। ওদিকে ইংরেজরা পৃথক নির্বাচন (seperate electorate) রূপী বিষের ভাঁড় থেকে বিষ ছিটিয়ে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিল করেছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য যাতে ভারতে পুষ্ট হতে না পারে তার জন্য যবনিকার আড়ালে অবিশ্রাম চক্রান্ত করে চলেছে ইংরেজরা। যৌথ নির্বাচন প্রথা প্রচলিত থাকলে সাম্প্রদায়িক ভেদ বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে যেতো। কারণ সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হত। 'আমি হিন্দু হিতৈষী' বা 'আমি মুসলমান হিতৈষী' এই জিগিরের উপরে নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনা থাকতো না।

জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নানা সময়ে নানাভাবে প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯২৭ এর সমসাময়িক কালেও কংগ্রেস এ বিষয়ে নূতন নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসের

সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সৌভ্রাত্র প্রচেষ্টায় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যম

৪৩তম বার্ষিক অধিবেশন হয় গৌহাটীতে, ১৯২৬-এর ডিসেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে। এই অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি নিরসনের সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবনে মনোযোগী হওয়ার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়। সমসাময়িক কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার সাথে এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু ও মুসলমান সভ্যগণের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকেন। এই আলোচনার সূত্র ধরে ২০ মার্চ ১৯২৭ তারিখে ৩০ জন বিশিষ্ট মুসলিম জননায়ক দিল্লীর

ওয়েস্টার্ন হোটেলে মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে এক বৈঠকে মিলিত হন। ওই বৈঠকে মিঃ জিন্না ছাড়া আর যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন—মাহ্‌মুদাবাদের রাজাবাহাদুর, স্যার মহম্মদ সফী, স্যার আব্দুল কায়ুম, মৌলানা মহম্মদ আলি, রাজা গজ্‌নকর আলি খাঁ, মিঃ মহম্মদ ইয়াকুব, মৌলানা শফী, ও দিল্লীর জুম্মা মসজিদের ইমাম সাহেব প্রভৃতি। এই বৈঠকে, উপযুক্ত আলোচনান্তে মুসলিম নেতৃবর্গ কয়েকটি শর্তাধীনে ভারতের ভাবী সংবিধানে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা (the system of joint electrorate) প্রবর্তনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেন। শর্তগুলি ছিল ঃ

(১) বোম্বাই প্রদেশের মুসলিমভূয়িষ্ঠ সিন্ধু অঞ্চলকে বোম্বাই প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করতে হবে। (২) উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানকে অন্যান্য প্রদেশগুলির তুল্য মর্যাদা দান করে সেখানে গভর্নরশাসিত প্রদেশগুলির অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে ঃ এই দুটি শর্ত প্রতিপালিত হলে তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণসহ যৌথনির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেবেন, এবং হিন্দুভূয়িষ্ঠ প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু মুসলিমগণের যে প্রকার সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিন্দুরা স্বীকার করে নেবেন। মুসলমানেরাও মুসলিমভূয়িষ্ঠ প্রদেশসমূহ (অর্থাৎ বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব এবং প্রস্তাবিত সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানে) সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের জন্য তুল্যরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনে সম্মত হবেন। নেতৃবর্গ আরও বলেন যে পাঞ্জাব ও বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের জনসংখ্যার অনুপাতে সেখানকার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসারে ভোট গৃহীত হবে। মুসলিম নেতৃবর্গ আরও বলেন যে এই প্রস্তাব মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাসমূহের দ্বারা অনুমোদিত হলে তবেই কার্যকর হবে। তবে নেতৃবর্গ এই আশা প্রকাশ করেন যে হিন্দুদের সংগঠনসমূহ যদি এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান তবে মুসলমান সংগঠনসমূহও অবশ্যই প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করবে। বৈঠকে, চাকুরী প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়গুলি আলোচিত হয়। কিন্তু স্থির হয় যে উক্ত মৌলিক প্রস্তাব উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত হলে তখন অন্যান্য বিষয়গুলি মীমাংসা করে নেওয়া যাবে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ কর্তৃক উক্তমত প্রস্তাব প্রকাশ করণের সাথে সাথেই ২১শে মার্চ, দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক অধিবেশনে সমবেত হয়ে পূর্বোক্ত প্রস্তাবে কার্যত সম্মতিজ্ঞাপন করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হয় যে সিন্ধু অঞ্চলকে নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস অনেক পূর্বেই নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানকে গভর্নরশাসিত প্রদেশের মর্যাদা দান করে তথায় তদনুরূপ শাসনসংস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাবকে কংগ্রেস যুক্তিসঙ্গত (reasonable) প্রস্তাব বলে মনে করেন। নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি ১৫ই মে তারিখে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে।

২৩শে মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু সভাগণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের

সভাপতিত্বে মিলিত হয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণসহ যৌথনির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারসমূহ সম্পর্কে রক্ষাকবচ (safeguards) বিধিবদ্ধ করবার অনুকূলেও তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু সিন্ধু অঞ্চলকে বোম্বাই প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক প্রদেশ গঠন ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানকে গভর্নরশাসিত প্রদেশের মর্যাদা দান সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যাক্ত না করে তাঁরা বলেন যে ভাষাত্তিক বা অন্য কোন বনিয়াদে প্রদেশ সমূহের পুনর্গঠনের ব্যাপারে তাঁরা আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু ঐ ২৩ মার্চ তারিখেই পাঞ্জাব হিন্দু মহাসভা এক প্রস্তাব গ্রহণ করে ঘোষণা করে যে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক প্রশ্নসমূহ নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা চালানোর কোন এক্তিয়ার কংগ্রেসের নাই। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে হিন্দু মহাসভা ও তার শাখাসমূহে সব সময়েই ইংরেজভক্ত হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। তার ফলে মুসলিম লীগের মত হিন্দু মহাসভাও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টায় পুনঃ পুনঃ বাধা সৃষ্টি করেছে।

২৫শে মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় শিখ লীগের সেক্রেটারী সর্দার মঙ্গল সিং কংগ্রেস সভাপতির কাছে লিখিত এক পত্রে মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব মোটামুটিভাবে অনুমোদন করেন, তবে সেই সাথে বলেন যে ঐ প্রস্তাবে শিখদের সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। পাঞ্জাবে হিন্দু ও মুসলমান ছাড়াও তৃতীয় সম্প্রদায় (শিখ) আছে। সুতরাং যৌথ নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের জন্যও জনসংখ্যানুপাতে আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। তবে সেই সাথে সর্দার মঙ্গল সিং আশ্বাস দান করেন যে 'শিখেরা কখনও জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করবে না'।

এদিকে ২৯ মার্চ তারিখে মিঃ জিন্না এসোসিয়েটের প্রেসের মাধ্যমে এক বিবৃতি প্রচার করে ২০শে মার্চ তারিখের মুসলিম নেতৃসম্মেলনের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা (clarification) প্রকাশ করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে মুসলমান নেতৃবৃন্দ যৌথ নির্বাচন মেনে নেওয়ার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, বোম্বাই প্রদেশ ভাগ করে নূতন মুসলিমভূয়িষ্ঠ সিন্ধু প্রদেশ গঠন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে অন্যান্য প্রদেশের তুল্য মর্যাদায় উন্নীতকরণ তার 'পূর্বশর্ত' (condition precedent)। হিন্দুদেরকে আগে এই পূর্বশর্ত মেনে নিতে হবে। এর অল্পদিন পরে মিঃ জিন্না এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেন দিল্লী মুসলিম নেতৃসম্মেলনের প্রস্তাব সমূহ অবিভাজ্য। হিন্দুদেরকে ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে, অন্যথা তাঁরা ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। প্রস্তাবের কোন সংশোধন চলবে না।

মিঃ জিন্নার নূতন সুর

স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে যে ২০শে মার্চ তারিখের মুসলিম নেতৃসম্মেলনের প্রস্তাব মিঃ জিন্না নিজে খোলামনে গ্রহণ করতে পারেন নি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খোলামনে আলাপ-আলোচনার দ্বারা জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়ার মনোভাব মিঃ জিন্নার ছিল না। বরং তিনি নিজে ঐ প্রস্তাবের বাধ্যবাধকতা থেকে কোন মতে মুক্ত হওয়ার উপায় অন্বেষণ করছিলেন। ২০শে থেকে ২৮শে মার্চ এই কয়দিনে কিন্তু হিন্দুসম্প্রদায়ের তরফ থেকে ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ পায়

নাই। কংগ্রেস ২১শে মার্চ তারিখেই মিঃ জিন্নার তথাকথিত 'পূর্বশর্ত' সম্পর্কে সমর্থনসূচক প্রস্তাবই গ্রহণ করেছে। হিন্দু মহাসভা সরকারিভাবে কোন মতামত প্রকাশ না করলেও হিন্দু মহাসভার নেতা পন্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার হিন্দুসভ্যদের সভাতেও মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রস্তাবের কোন সুস্পষ্ট বিরোধিতা করা হয় নাই। শিখ সম্প্রদায়ও ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে অনুকূল মনোভাবই প্রকাশ করেছে। মিঃ জিন্না ভালোভাবেই জানতেন যে রাজনীতি সচেতন হিন্দুদের বহুলাংশ ছিলেন কংগ্রেসপন্থী। সুতরাং মুসলিম নেতৃবৃন্দের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও এ. আই. সি. সি'র প্রায় পূর্ণ সমর্থন মিঃ জিন্নাকে উৎসাহিত না করে আতঙ্কিত করেছিল। অল্পদিন পরেই ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে বিরোধিতা প্রকাশ পেতে লাগল মুসলমানদের তরফ থেকে। ৮ মে তারিখে পাটনায় আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়া হলে বিহার প্রদেশের মুসলিম নেতৃবর্গ দিল্লী প্রস্তাব বিবেচনার জন্য এক সম্মেলনে মিলিত হন। ঐ সভায় প্রখ্যাত জননায়ক স্যার আলি ইমাম, মৌলানা সফী দাউদী এবং সৈয়দ আজিজ দিল্লী প্রস্তাবের সমর্থনে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন।

কোন কোন মুসলমান মহল থেকে দিল্লী প্রস্তাবের বিরোধিতা

"They argued that seperate electorate was harmful for the Muslims; it does not and can not safeguard Muslim interests. The Hindus being numerically stronger, the Muslims can not gain anything through seperate electorate. Under seperate electorate, militant Hindus are being elected to legislatures who would not concede anything for the Muslims etc."

কিন্তু ঐ সভায় উপস্থিত ইংরেজ-অনুগৃহীত ও ইংরেজভক্ত হোমরাচোমরা মুসলিম নেতৃবৃন্দ দিল্লী প্রস্তাবের বিরোধিতায় সোচ্চার হন। এঁদের মুখপাত্র ছিলেন খাঁ বাহাদুর নবাব মহম্মদ ইসমাইল, স্যার ফখরউদ্দিন, খাঁ বাহাদুর নবাব সরফরাজ হোসেন খাঁ, মিঃ আতাহার হোসেন প্রভৃতি। সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত স্যার আলি ইমাম প্রভৃতি প্রগতিপন্থী নেতৃবৃন্দের অভিমত অগ্রাহ্য করে দিল্লী প্রস্তাবের নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিহারের মুসলিম নেতৃবৃন্দের পূর্বোক্ত সম্মেলনের পূর্বেই ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল ঐ পাটনা শহরেই ডাঃ মুঞ্জের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার অধিবেশন হয়। ঐ সম্মেলনে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে ব্যবস্থাপক সভায় কোন এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সুনিশ্চিত করবার জন্য কোন প্রদেশ বিভক্ত করবার নীতি হিন্দু মহাসভা পছন্দ করে না, কিন্তু অন্যান্যপ্রকার গুণগতবিচারে বর্তমান প্রদেশ সমূহের পুনর্গঠনের প্রস্তাব আলোচনা করা যেতে পারে। হিন্দু মহাসভা সুপারিশ করে ঃ (১) সমস্ত আইনসভা যৌথনির্বাচন প্রথার মাধ্যমে গঠিত হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐকামতের ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকা উচিত; (২) সমস্ত প্রদেশে একই প্রকার ভোটাধিকার ব্যবস্থা চালু থাকা উচিত ; (৩) সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও আধা ধর্মীয় অধিকার সমূহের ব্যাপারে শাসনতন্ত্রগত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকা উচিত। দিল্লী প্রস্তাব সম্পর্কে হিন্দু মহাসভা নিম্নলিখিত মত-অভিমত প্রকাশ করে ঃ

"In view of the facts that the Muslim community as such has not endorsed the proposals......and on the contrary, in several places expressed its disagreement.... and that Mr. Jinna has said that the proposals can only be accepted or rejected in to to, without any modification, the Mahasava feels that it will not serve any useful purpose to express any definite opinion at this stage on the proposals as a whole."

১লা মে পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় লাহোরে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্যার মহম্মদ সফী। একের পর এক বক্তা দিল্লী-প্রস্তাব সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার মনোভাবের নিন্দা করতে থাকেন। সভাপতি স্যার মহম্মদ শফী পাটনায় হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবের উল্লেখ করে বলেন ঃ "হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের মাতৃভূমি ভারতের স্বরাজ অর্জন যে অসম্ভব, এ কথা যতদিন হিন্দুরা উপলব্ধি করতে না পারছে, এবং যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসমূহ সম্পর্কে গ্যারান্টিসমূহ সুনিশ্চিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পৃথক নির্বাচন প্রথা বজায় রাখার জন্য মুসলমানগণ সর্বপ্রকারে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। স্যার মহম্মদ আরও বলেন ঃ "বর্তমান অবস্থায় যৌথ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে সেটা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পুনঃ পুনঃ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে।" এই সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যেও স্যর মহম্মদ শফীর পূর্বোক্ত মতামতই প্রতিধ্বনিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ঃ "In the existing political condition in the country, communal eletorates provided the only means of making the central and provincial legislatures freely representative of Indian people, and so long as an equally effective guarantee of Muslim interests was not forthcoming. The Muslim community could not but continue to insist on retention of communal electorates as essential part of Indian constitution."

স্যার মহম্মদ শফীর বক্তৃতা এবং পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব স্পষ্টত দিল্লী প্রস্তাবের বিরোধিতা জ্ঞাপক। অর্থাৎ, দিল্লী প্রস্তাব যে ৩০ জন মুসলিম নেতার সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে রচিত হয়, স্যার মহম্মদ শফী সেই ত্রিশ-নেতার অন্যতম ছিলেন। ২০শে মার্চ থেকে ১লা মে এই ৪১ দিনের মধ্যে যবনিকার অন্তরালে কি ঘটেছে তা জানবার কোন উপায় নাই। কিন্তু অন্তরালে কিছু যে ঘটেছে—তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রস্তাব প্রণয়ণের সময়েই নেতৃবৃন্দ তার মধ্যে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন যে ঐ প্রস্তাব মুসলিম সংস্থা সমূহের দ্বারা অনুমোদিত হলে তবেই কার্যকরী হবে (these are subject to ratification by Mahammadan Organisations concerned)। অতএব প্রস্তাব রচনার সময়েই তা থেকে সরে আসবার দরজা খোলা রাখা হয়েছিল। বস্তুত ২৯শে মার্চ মিঃ জিন্না এসোসিয়েটের প্রেসের মাধ্যমে যে বিবৃতি প্রচার করেন তার মধ্যেই ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ জিন্নার নিজের অস্বস্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলে কি আমাদের একথা মনে করা অনুচিত হবে যে প্রস্তাবের রচয়িতাদের এমন উদ্দেশ্য ছিল না যে ঐ প্রস্তাব হিন্দুসম্প্রদায়ের দ্বারা

অনুমোদিত হোক? তৎকালীন সর্বাপেক্ষা শক্তিমান জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন করে। পাটনায় হিন্দু মহাসভা কার্যত ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নাই। হিন্দু মহাসভা শুধু বলেছে যে ঃ 'যেহেতু ত্রিশ নেতার প্রস্তাব এখনও মুসলিম সংস্থা সমূহের দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই, সেই-হেতু এখন (at this stage) ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ ফলদায়ক হবে না।' ব্যাপার দেখে মনে হয় মিঃ জিন্না ও তাঁর অনুরাগী নেতৃবর্গ যেন একটা এগ্রিমেন্টের মুসাবিদা কংগ্রেসের ও হিন্দুদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন ঃ "এই আমাদের চূড়ান্ত মুসাবিদা। তোমরা ইচ্ছা করলে এটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পার কিন্তু কমা-সেমিকোলোন বদলানো চলবে না। পুরোপুরি গ্রহণ না করলে এটা পুরোপুরিই বাতিল হয়ে যাবে।' কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পুরোপুরি অনুমোদন জ্ঞাপন করলো। কিন্তু মুসলমান নেতৃবৃন্দ এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না—হিন্দু মহাসভার অনুমোদন চাই। এমনিতে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের স্লোগান ছিল 'কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না।" কিন্তু যখন সাম্প্রদায়িক সমঝোতার প্রশ্নে মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত কোন দাবিতে কংগ্রেস সম্মতি জ্ঞাপন করে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা তক্ষুণি বলেন, 'কংগ্রেস ত হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি নয়, হিন্দু সমাজের তরফ থেকে কথা বলবার কি অধিকার আছে কংগ্রেসের?' অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু নেতাদেরকেই হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি বলে মনে করেন। তা হলে ব্যাপার দাঁড়ালো এই যে কংগ্রেস হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি নয়। একদিক দিয়ে এ কথাটা সত্য। কংগ্রেস ছিল জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবি তার থাকতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক অশান্তির প্রশ্নটিও জাতীয় প্রশ্ন সুতরাং সে প্রশ্নের মীমাংসার ব্যাপারে কংগ্রেসের শুধু যে 'অধিকার' ছিল তাই নয়, দায়িত্বও ছিল। অতীতে সাম্প্রদায়িক সমঝোতা সুনিশ্চিত করবার জন্য যে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' হয়েছিল সেখানেও চুক্তিকারী পক্ষ ছিলেন শুধু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ।

সুতরাং যৌথনির্বাচন প্রথা মেনে নেওয়ার জন্য ত্রিশ নেতার প্রস্তাবে যে শর্তগুলি দেওয়া হয়েছিল, কংগ্রেস যখন সে শর্তগুলি নির্দ্বিধায় মেনে নিল তখন রাজভক্ত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা ফাঁপরে পড়লেন। যাঁরা ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন, নিজ সম্প্রদায়ের উচ্চ মহল থেকে তাঁদের উপরে চাপ পড়তে লাগলো। কারণ যাঁরা মুসলিম স্বার্থের জিগির তুলে এতদিন ইংরেজের কাছে মুসলিম সমাজের 'প্রকৃত প্রতিনিধি'র মর্যাদা লাভ করে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন, তাঁরা জানতেন যে যৌথ নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তাঁদের নেতৃত্বের আসন ও সুযোগ সুবিধা ও রাজসম্মান ভোগের উৎস চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর রাজনীতিক্ষেত্রে 'হিন্দুসমাজের নেতা বা মুসলিম সমাজের নেতা'—এই পরিচয়ের প্রাধান্য লাভ সম্ভব হবে না। তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তি ভারতের রাজনৈতিক আসরে অপরাজেয় হয়ে উঠবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমস্ত জৌলুষ অপসৃত হবে। সুতরাং যে কোন উপায়ে দিল্লী প্রস্তাবকে বাতিল করতে না পারলে ইংরেজের অনুগ্রহজীবী বড় বড় উপাধিধারী সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের দিন ফুরিয়ে যাবে। তাই

মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ছদ্ম প্রাচীরের আড়ালে তাঁরা আত্মরক্ষার পথ খুঁজে পেলেন। পিছন থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকজাতি কলকাঠি নেড়েছিলেন কি না, তা জানবার উপায় নেই। তবে লর্ড মর্লির নির্দেশে ও লর্ড মিন্টোর ব্যবস্থাপনায় কংগ্রেসের প্রতিরোধক শক্তি (counterpoise) হিসাবে যেমন মুসলিম লীগ জন্ম গ্রহণ করেছিল, তেমনি এক্ষেত্রেও দিল্লী প্রস্তাব নস্যাৎ করবার ষড়যন্ত্রের পিছনে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দুষিত হস্ত কাজ করে থাকতে পারে এ অনুমান অযৌক্তিক হবে না।

১লা মে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ কর্তৃক দিল্লী প্রস্তাবের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৫ই মে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় দিল্লী প্রস্তাবের প্রতি পুনরায় সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ঐ সভার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন ঃ

"After years of trouble and strife, it was possible to see a ray of light. For the first time after many years the leading Musalmans have shown a real desire to lay the foundation of national life on solid lines. Proposals now famous in the history as the 'Delhi proposals' represented the earnest and anxious desire of Musalman friends to cooperate with the Hindus. Whatever theoretical objections there might be, the proposals offered a basis for what may be regarded as a safe compromise for the present being ultimately to perfect nationalism."

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ইংরেজদের আশ্রিত ও ইংরেজের অনুগ্রহজীবী সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের সুকৌশলী চক্রান্ত এক উত্তম ও অতিশয় কল্যাণকর প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিল। মুসলিম নেতৃবর্গের প্রস্তাবের সমাধি রচিত হল তাঁদের স্বসম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইংরেজসেবী মহারথীর বিরোধিতার মাধ্যমে।

আমাদের মনে হয়, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস দিল্লীপ্রস্তাবের অনুকূলে জাতীয় সমর্থন গড়ে তুলবার জন্য যতটুকু করা যায় বা যতটুকু করা সম্ভব ছিল তা করেন নি। ঐ প্রস্তাব অনুসারে যৌথনির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করাতে পারলে, ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যুগান্তর ঘটতো।

১৯২৭ সালের মে মাসের শেষের দিকে প্রায় চার বছর কারাবাসের পর সুভাষচন্দ্র বসু মুক্তিলাভ করেন। তিনি কারারুদ্ধ থাকা অবস্থাতেই ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক মহাপ্রয়াণ ঘটে। বঙ্গদেশে তথা ভারতে তাঁর মত একজন ত্যাগী, নিষ্ঠাবান ও তীক্ষ্ণধী সংগ্রামী নেতার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। সুভাষচন্দ্রের মুক্তিতে বাংলার কংগ্রেস রাজনীতি সম্পর্কে জনমানসে নূতন আশার সঞ্চার হয়।

সুভাষচন্দ্রের মুক্তিলাভ

এই বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা নির্দ্ধারণের জন্য বিশিষ্ট ব্রিটিশ রাজনীতিক স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক একটি কমিশন গঠন। ইতিহাসে এই কমিশন সাইমন কমিশন নামে পরিচিতি লাভ

করেছে। কমিশন নিয়োগ সম্পর্কে সরকারি ঘোষণা প্রচারিত হয় ৮ই নভেম্বর। ঘোষণাটি প্রচার করবার পূর্বে বড়লাট লর্ড আরউইন পত্রদ্বারা বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করেন। গান্ধীজী ঐ সময়ে ছিলেন মাঙ্গালোরে, দিল্লী থেকে হাজার মাইল দূরে। সেখানে তিনি বড়লাটের চিঠি পান। বড়লাট ৫ই থেকে ৭ই নভেম্বরের মধ্যে যে কোন দিন তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য গান্ধীজীকে আহ্বান্ করেছেন। ঐরূপ চিঠি অন্যান্য জাতীয় নেতাদের কাছেও পৌঁছেছিল। গান্ধীজী উপস্থিত হতে লর্ড আরউইন লন্ডনস্থ ভারত সচিবের নামাঙ্কিত একখানা ঘোষণাপত্র তাঁর হাতে দিলেন। পাঠ করে গান্ধীজী জিজ্ঞাস করলেন—'শুধু এই জন্য'। বড়লাট সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বললেন 'ইয়েস্'। অন্য নেতাদের সাথেও ঐরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবেই সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হল।

ঐ ঘোষণাপত্রে লেখা ছিল ব্রিটিশ গভনমেন্ট স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করেছেন। যার কার্য হবে ঃ 'ভারতে যে শাসন পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা কেমনভাবে চলছে সেটা পরীক্ষা করে দেখা, ভারতে শিক্ষার উন্নতি কতটা হয়েছে, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলি কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে, এবং দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা কি পরিমাণে সেখানে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে, প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে কি পরিমাণে অদলবদল করা যেতে পারে এবং সে বিষয়ে কি কি নিয়ন্ত্রণ আরোপ প্রয়োজন ঃ এই সকল বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করা।' ইংরেজী ভাষায় কমিশনের উপরে নির্দেশনামা ছিল নিম্নরূপ ঃ

সাইমন কমিশন

"enquiring into the working of the systems of government, the growth of education and the development of representative institutions in British India and matters connected therewith and reporting whether and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government or to extend, modify or restrict the degree of responsible government then existing therein, including the question whether the establishment of second chambers of the local legislatures is or is not desirable." ৮ই নভেম্বর কমিশন গঠনের আইনমাফিক ঘোষণা প্রচারিত হল। কমিশনের সভ্যদের নামের তালিকায় একজনও ভারতীয় সদস্যের নাম ছিল না। সকল সদস্যই ইংলন্ডবাসী।

এই ঘোষণা ভারতবর্ষের একান্ত রাজভক্ত গোষ্ঠী ছাড়া আর প্রায় সকল মানুষকেই বিক্ষুব্ধ করে তুললো। মডারেট মতবাদী দলগুলি ভারতীয় সদস্যবর্জিত কমিশন গঠনকে ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজদের উপেক্ষা ও অবমাননার নিদর্শন বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন তখন আসন্ন। ডিসেম্বরে মাদ্রাজে ডাঃ এম. এ. আন্সারীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। প্রথমত, সাইমন কমিশনের সাথে সর্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জনের জন্য কংগ্রেস দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানালেন, অর্থাৎ সাইমন কমিশন 'বয়কটে'র ডাক দিলেন কংগ্রেস। কংগ্রেসের বিরোধিতা শুধু ভারতীয় সদস্য গৃহীত না হওয়ার ইস্যুতে নিবদ্ধ ছিল না। কমিশন গঠন সংক্রান্ত গোটা ব্যাপারটাকেই কংগ্রেস 'ধাপ্পাবাজি' বলে ঘোষণা কবলেন। 'ভারতবাসী স্বায়ত্ব শাসনের

অধিকার লাভের ব্যাপারে কতটা যোগ্যতা অর্জন করেছে তা নির্ণয় করবার কোন এক্তিয়ার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নাই। একমাত্র ভারতবাসীরাই তাদের ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক কাঠামোর স্বরূপ নির্ণয়ের অধিকারী'— এই হল কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী। কংগ্রেস ঘোষণা করলেন যে ঐরূপ কমিশন গঠনের দ্বারা ভারতবাসীর স্বতন্ত্রতার দাবির প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের 'অবজ্ঞা' প্রকাশিত হয়েছে। অতএব "The Congress resolves that the only sef-respecting course for India to adopt is to boycott the commission at every stage and in every form." ঐ প্রস্তাবেরই অপর অংশে কিভাবে এই 'বয়কট' প্রস্তাব কার্যকরী করা হবে, সেই সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হল ঃ

মাদ্রাজ কংগ্রেস, ১৯২৭ ও কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত

(ক) সাইমন কমিশনের সভ্যগণ যেদিন ভারতে পৌঁছোবেন সেদিন সমগ্র ভারতে হরতাল পালিত হবে, এবং যেদিন যে শহরে গমন করবেন সে দিন সেই শহরে হরতাল পালন ছাড়াও কমিশনবিরোধী জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। (খ) জনমত গঠনের জন্য সাধারণভাবে দেশের সর্বত্র ঐ ধরনের জনসভা ও জনসমাবেশের মাধ্যমে ও অন্য উপায়ে কমিশনবিরোধী প্রচারকার্য চালাতে হবে। (গ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের বে-সরকারি সদস্যগণ (non-official members) কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে বা কমিশনের কাজে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করবেন। কমিশনের সদস্যগণের কোন সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁরা যোগদান করবেন না। (ঘ) এই সকল কর্মসূচীতে সহযোগিতা করবার জন্য কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভা সমূহের সমুদয় বেসরকারি সদস্যগণের প্রতি এবং ভারতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতি, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ও অন্যান্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভাসমূহের বেসরকারি সদস্যদের প্রতি আরও আহ্বান জানানো হল যে তাঁরা যেন ঃ

(ক) কমিশনের কাজে সাহায্য করবার জন্য কোন সিলেক্ট কমিটি গঠনের ব্যাপারে ভোটদান না করেন এবং ঐরূপ কোন কমিটি গঠিত হলে তার সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকার করেন। (খ) কমিশনের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন খরচা মঞ্জুরের দাবি ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হলে মঞ্জুরীর বিপক্ষে ভোট দান করেন। (গ) কেবলমাত্র আসন বজায় রাখা, পূর্বোক্তরূপ সরকারি প্রস্তাবসমূহ না-মঞ্জুর করা, বা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর প্রস্তাবসমূহের বিরোধিতা করার জন্যই বেসরকারি সদস্যগণ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যোগদান করবেন, অন্যান্য অধিবেশন বর্জন করবেন। অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পাঁচ বৎসর পরে আবার শুরু হল আর এক সক্রিয় ও সংগ্রামী ব্রিটিশবিরোধী গণ-আন্দোলন। ভারতীয় জনতার সংগ্রামী উদ্যম পুনরায় তুঙ্গে উত্থিত হল।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের অপর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 'পূর্ণ স্বাধীনতাকে' কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র (constitution) যখন আমূল পরিবর্তিত হয় তখন কংগ্রেসের পুরাতন উদ্দেশ্যবিধি বা objective clause কে বদলিয়ে নূতন উদ্দেশ্যবিধি রচিত হয়। নূতন বিধি বা clauseটি ছিল এইরূপ ঃ

পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব

"The object of the congress is the attainment of Swaraj by peaceful and legitimate means."

তারপর থেকে এই 'স্বরাজ' শব্দটির অর্থ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। ঐ শব্দের অর্থ কি 'পূর্ণ স্বাধীনতা'? কিংবা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন (Dominion status)? এ তর্ক এতদিন অমীমাংসিত ছিল। গান্ধীজী একবার বলেছিলেন ঐ শব্দের অর্থ "Self Government within the empire if possible and outside the empire if necessary"। এই ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে বহু উত্তাপের সঞ্চার হয়। 'পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য' এইরূপ সুস্পষ্ট ঘোষণার জন্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দাবি ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে ঐ দাবির অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্যবিধিকে সেইভাবে পরিবর্তিত করা হয়।

সর্বদলীয় সম্মেলন : All Parties Conference

এই কংগ্রেসে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া রূপরেখা প্রণয়নের জন্য দেশেব অপরাপর রাজনৈতিক দল সমূহের প্রতিনিধি বর্গকে নিয়ে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন (All Parties Conference) গঠন করবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপরে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আন্‌সারী দেশের অপরাপর রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলাপ আলোচনা করে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলনের বৈঠক আহ্বান করেন। কিছু প্রাথমিক আলোচনার পরে ঐ বৈঠক শেষ হয় এবং পরবর্তি মার্চ মাসে দিল্লীতেই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। একান্ত রাজভক্তগোষ্ঠী ছাড়া ভারতের লিবারেল ফেডারেশন প্রমুখ ভারতের প্রায় সমস্ত মডারেটপন্থী রাজনৈতিক দল সম্মেলনে যোগদান করেন। স্যার আলি ইমাম, মাহমুদাবাদের রাজা প্রমুখ মডারেট মুস্‌লিম নেতৃবর্গও সম্মেলনে যোগদান করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনেই মোটামুটি ভাবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে 'পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনবিধি (full responsible government) কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কাঠামো রচিত হবে। কন্‌ফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি করে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিই All Parties Conference Committee বা Nehru Committee নামে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছে। বিখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু এই কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন।

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে সমগ্র দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। সাইমন কমিশনের সভ্যগণ ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ লন্ডন থেকে এসে বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করেন। তাঁর পূর্বদিন অর্থাৎ ২রা ফেব্রুয়ারী বড়লাট লর্ড আরউইন এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন যে 'ভারতবাসীরা সহযোগিতা করুক বা না করুক, সাইমন কমিশন তাদের তদন্ত করবেই, এবং রিপোর্টও দাখিল করবে', বড়লাটের এই চ্যালেঞ্জ কমিশনের বিরুদ্ধে জাতীয় মানসকে অধিকতররূপে উত্তপ্তকরণের সহায়ক হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারী সারা ভারতে সর্বাত্মক

হরতাল পালিত হয়। সর্বত্রই হরতাল হয় শান্তিপূর্ণ এবং সর্বাত্মক। কিন্তু মাদ্রাজে হাইকোর্টের সম্মুখে পুলিশ গুলি চালায়, তার ফলে এক ব্যক্তি নিহত হয় ও কিছু লোক আহত হয়।

সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন

জওহরলাল নেহরু লিখেছেন : "The moderate groups cooperated with the congress in this boycott and it was remarkably successful. Wherever the commission went, it was greeted by hostile crowds and the cry of 'Simon go back', and thus the numbers of Indian masses became acquainted not only with Sir John Simon's name, but with two words of English language, the only two they knew. These words must have become a hated obsession for the commission. The story is related that once when they were staying at the Western Hostel in New Delhi, the refrain seemed to have come to them at night out of the darkness. They were greatly irritated at being pursued in this way even at night." বহু শহরেই কমিশনের সভ্যগণকে প্রকাশ্যে রাজপথ দিয়ে, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সর্বত্র সহস্র সহস্র কণ্ঠের সমবেত ধ্বনি—'গো ব্যাক সাইমন' আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করেছে প্রধান প্রধান রাজপথগুলি অবরুদ্ধ করেছে। বিক্ষোভের ভয়ে কমিশনের সভ্যদেরকে কলকাতায় নামানো হয় নাই। ট্রেন বারাকপুরে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় বারাকপুরের লাটভবনে। তারপর, গভীর রাত্রে মোটরে করে গোপনে কলকাতায় এনে কলকাতার লাটপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন কলকাতায় যে সুবিশাল বিক্ষোভমিছিল হয়েছিল, তার সম্মুখভাগ যখন ময়দানে পৌঁছেছে পশ্চাদভাগ তখনও শ্যামবাজারের মোড়ে—শ্যামবাজার থেকে ময়দান এই সমস্ত এলাকা কালো নিশানধারী জনতায় ঠাসা, তিল ধারনের স্থান ছিল না। শুধু কি রাস্তা? রাস্তার পাশের সমস্ত বাড়ীর ছাদে, ব্যালকনিতেও পথিপার্শ্বস্থ গাছগুলির শাখার উপরে, ট্রামপোষ্ট ও লাইটপোষ্ট বেয়ে উপরে উঠে এক হাতে পোষ্ট আঁকড়ে ধরে অন্যহাতে কালো নিশান নেড়ে নেড়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে অগণিত বঙ্গবাসী। লক্ষ লক্ষ লোক মুহুর্মুহু আওয়াজ তুলছে—'গো ব্যাক সাইমন'। নানাদেশীয়, নানা পরিচ্ছদধারী মানুষের সমুদ্রবৎ বিশাল মিশ্র জনতা, স্যুট পরা (সাহেব) থেকে লুঙ্গিপরা দোকানদার, নগ্নগাত্র খাটো মলিন বস্ত্রধারী দরিদ্র মেহনৎকারী শ্রেণী—সর্বশ্রেণীর সর্বসম্প্রদায়ের এক অভিনব মহাসম্মেলন। সকলে কালো নিশান নাড়াচ্ছে একসাথে স্লোগ্যান দিচ্ছে—'গো ব্যাক সাইমন'। মিছিলের মধ্য থেকে সামনে বা পিছনে তাকালে দূরের অসংখ্য কালো মাথা ও দোলায়মান কালো নিশানগুলি সমুদ্রের তরঙ্গের মত মনে হয় আর সমবেত কণ্ঠের 'গো ব্যাক সাইমন' আওয়াজ ঝঞ্ঝাতাড়িত সমুদ্রের গর্জন বলে ভ্রম হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ সময়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

লক্ষ্ণৌতেও গোপনে কমিশনের সদস্যগণকে সরকারিভবনে তোলা হয়। রাজা-জমিদার-তালুকদার নবাব-নাইটগণ কমিশনের সভ্যদের আপ্যায়ণের জন্য কাইসারবাগ নামক স্থানীয় একটি পার্কে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। পার্কের চতুঃপার্শ্ব সঙ্গীনচড়ানো রাইফেলধারী

পুলিশ দিয়ে ঘেরা, রাস্তায় রাস্তায় রাইফেলধারী পুলিশ টহল দি২৬। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? ভোজ কেবল শুরু হয়েছে এমন সময় দেখা গেল সভ্যদের ঠিক মাথার উপরে আকাশে উড়ছে ৮/১০ খানা ঢাউস্ ঘুড়ি ও কতকগুলি বেলুন। প্রত্যেকটিতে বড় বড় করে লেখা 'গো ব্যাক সাইমন'। জওহরলাল যে 'pursued day and night' কথাটা তাঁর আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন, সে কথাটা যে কতটা আক্ষরিকভাবে সত্য, এই ঘটনা দিয়েই সেটা বোঝা যাবে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মিশরে জগলুল পাশার নেতৃত্বে বিলাত থেকে প্রেরিত 'মিলার মিশন'কে মিশরবাসীরা যেরূপ সার্থকভাবে বয়কট করেছিল, ভারতবর্ষে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের প্রচন্ডতা অনেকাংশেই তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘায়িত ধারায় সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের গুরুত্ব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোবল ও কর্মশক্তি যে কোন্ স্তরে পৌঁছেছে—এই আন্দোলনের নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে ইংরেজরাও সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অন্তত শিক্ষিতসমাজ সেকথা জানতে পেরেছিলেন। সাইমন কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, মন্টেগু চেম্সফোর্ড রিফর্মসের মত একটা গজভুক্ত কমিশন ভারতবাসীদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই ভারতবাসীরা তাই নিয়ে লোফালুফি শুরু করে দেবে—সে দিন আর নাই। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্যের বনিয়াদ অনেকখানি শক্ত করেছিল এবং সাময়িকভাবে স্তিমিত সংগ্রামী প্রবণতাকে বিস্ময়কররূপে পুনরুদ্দীপ্ত করেছিল। ১৯২২-এর 'চৌরীচৌরা হল্টের' পর থেকে সাধারণ স্বাধীনতা -কর্মীরা পুনরায় একটি ব্যাপক জন-আন্দোলনের প্রত্যাশায় দিন গুনছিলেন। এই আন্দোলন তাঁদের আশার প্রদীপকে উজ্জ্বল শিখায় সমৃদ্ধ করলো। তাঁরাও বুঝলেন গান্ধীজীও বুঝলেন, আর একটি ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনসংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত হয়েছে। এই আন্দোলনের অগ্নিশিখা থেকেই গান্ধীজী ১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলনের সমরসঙ্কেত গ্রহণ করেছিলেন। এই আন্দোলনের সময়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদী অপশক্তি সমূহ প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

দশম পরিচ্ছেদ

আইন-অমান্য আন্দোলন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

আমরা পূর্বেই বলেছি যে পরাধীনদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী, ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষের রূপপ্রাপ্ত হয়। এগুলি ক্ষণিকের সংগ্রাম নয়। এ সকল সংগ্রামের গতিভঙ্গী হয় বাত্যাতাড়িত নদীর ঢেউয়ের মত। প্রবলবেগে উর্দ্ধে উঠে গিয়ে, একটা সীমায় পৌছানোর পরে তার নিম্নগতি শুরু হয়—আবার পরক্ষণেই উর্দ্ধগতি শুরু হয়। এই ভাবে পৌনঃপুনিক আঘাতের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সংগ্রাম এগিয়ে চলে। এই ধারায় কখনও তার গতিবেগ উদ্দাম প্রচন্ডতা প্রাপ্ত হয়, কখনও বা গতিবেগে শিথিলতা আসে, কখনও গতিবেগ হয় স্তিমিত। সাময়িক বিশ্রাম, উপযুক্ততর প্রস্তুতির জন্য সাময়িক ভাবে সৈন্যদলের শিবিরে প্রত্যাবর্তন, সাময়িক বিরতি। প্রয়োজনবোধে সুকৌশলী পশ্চাদপসরণ, এমন কি সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া—এ সবই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রণকৌশলের অঙ্গীভূত। সুতরাং জাতীয় সংগ্রাম প্রথম বর্ষায় নদীসমূহের জলস্ফীতির মত ক্রমাগত উর্দ্ধমুখী হবে। তার মধ্যে ছেদ আসবে না, সাময়িক বিরতি থাকবে না, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কৌশলগত পশ্চাদপসরণ (tactical retreat) থাকবে না, এ ধারণা অবৈজ্ঞানিক। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের শতাব্দীব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে তার পূর্বোক্ত চরিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। নরমপন্থীদের মৃদু প্রতিপদের ও সতর্ক ভাবে দাবিজ্ঞাপনের কর্মধারা, চরমপন্থীদের উদাত্ত প্রতিবাদের আন্দোলন, বিপ্লবীদের আত্মবলি সমৃদ্ধ দুঃসাহসিক কর্মকান্ড, ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ ও ১৯৩২-এর আইন-অমান্য আন্দোলন, ১৯৩৫-৩৬ থেকে শুরু বামপন্থী সমাজবাদী আন্দোলন, ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন এ সবই এক ও অখন্ড, নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় মাত্র। সুতরাং ভারতবর্ষের মত এক বিশাল উপমহাদেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের পূর্বোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে না পেরে যে সকল অনভিজ্ঞ সমালোচক বলেন : 'অমুক আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছিল', তাঁরা শুধু তাঁদের রাজনৈতিক বোধের দীনতাই প্রমাণ করেন।

১৯২২-এর প্রথমভাগে চৌরীচৌরার ঘটনার পরে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দাম গতিবেগ স্তিমিত হয়ে আসে। সেনানীগণ নূতন প্রস্তুতির জন্য শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে। আন্দোলনের বিরতিকাল বা period of respite-এর সময়ে সৈন্যেরা শিবিরে বসে সুখনিদ্রায়

দিন কাটান নি। অসহযোগ আন্দোলন একদল পরিপূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত সুদক্ষ স্বাধীনতাকর্মী সৃষ্টি করে। আন্দোলনের বিরতি কালে এই সব ত্যাগী ও আদর্শনিষ্ঠ কর্মীদল ছোট বড় শহরে, গ্রামেগঞ্জে অনাহারে অর্ধাহারে, ভূমিশয্যায় দিবারাত্রি জাতীয় মানসে স্বাধীনতাকামনার দীপশিখাকে নিয়ত প্রজ্বলিত রেখেছেন। অচিরেই যে আবার একটি ভারতব্যাপী গণ-আন্দোলনের আহ্বান আসবে তাঁরা সেকথা জানতেন এবং প্রত্যেকেই আপন আপন সাধ্য অনুসারে আগামী আন্দোলনের দেশকে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেছেন।

সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের সার্বিক সফলতা জাতীয়মানসে নূতন আশা ও উৎসাহের স্রোতাধারায় গতিপথ উন্মোচিত করে দেয়। গান্ধীজীও ঐ আন্দোলনের সফলতা দেখে তাঁর পরিকল্পিত নূতন ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু করা সম্পর্কে মন স্থির করে ফেলেছিলেন। কর্মীরাও দিন গুনছিলেন প্রত্যাশাদীপ্ত উৎকণ্ঠা বুকে চেপে।

সাইমন কমিশন বয়কট-আন্দোলন যেন এক প্রচন্ড ধাক্কায় জাতীয়মানস থেকে শিথিলতা ও উদাসীনতার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র জাতিকে সংগ্রামী উৎসাহে উদ্দীপিত করে তুললো। প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে যে ছাইটুকু জমা হয়েছিল এক প্রবল বাত্যায় তাকে নিঃশেষে উড়িয়ে দিল। কমিশনের সভ্যগণ ভারতের কোন শহরে প্রকাশ্যে রাস্তায় বাহির হতে পারেন নি। ডাঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ

"The great success of the boycott of Simon Commission induced the Government to try methods of coercion and terrorism. In Lahore, a vast gathering of people headed by Lala Lajpat Rai was assaulted by policemen and many respected leaders were treated to batons and lathi-blows. Lalaji was one of the sufferers and it is believed his death was hastened by the cowardly attack. Lucknow experienced several wanton and unprovoked police charges on unarmed and peaceful gatherings. Even Jawaharlal was not spared by the U.P police. Mountain and foot police displayed their skill with the baton and the lathi on the heads and backs of well known public workers."[১] ডাঃ সীতারামাইয়া আরও বলেছেন ঃ "Lucknow was converted into an armed camp with thousands of mounted and fool police and on four days there were brutal attacks by the police. Private houses were raided, and respected national workers were beaten up and arrested for calling out 'Simon, go back'."[২]

পাটনা শহরে কমিশনের সভ্যেরা যে তারিখে পৌঁছান সেদিন ঐ শহরে কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে পঞ্চাশ সহস্র মানুষ সমবেত হয়। সরকার পক্ষ থেকে ভাড়াটিয়া মোটর লরী যোগে কয়েকশত গ্রামীণ কৃষককে নিয়ে আসা হয়েছিল কমিশনের সামনে হাজির করবার জন্য। শহরে পৌঁছে তারা সকলেই বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান করে 'সায়মন্ লৌট্ যাও' বলে আওয়াজ তুলতে থাকে। কমিশনের সামনে হাজির করবার জন্য তাদের একজনকেও পাওয়া যায় না।

সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্যার জন্ সাইমন তাঁর সহকর্মিদের নিয়ে ৩১শে মার্চ ১৯২৮, বোম্বাই বন্দর থেকে জাহাজে উঠে লন্ডনে ফিরে যান। বিলাত গিয়ে অবশ্য তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে রিপোর্ট দেন যে তার কমিশন "established personal contact with all communities and travels in various parts of India!"[৫]

এদিকে সাইমন কমিশনকে অগ্রাহ্য করে ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত উদ্যোগে সর্বসম্মতরূপে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নের যে প্রয়াস শুরু করা হয়েছিল কংগ্রেসের তরফ থেকে, তদনুসারে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলনের ২৫টি অধিবেশন হয়, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে। পরে ১৯শে মে ১৯২৮ তারিখে সম্মেলনের অপর এক অধিবেশনে ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য পন্ডিত মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। ইতিহাসে এই কমিটি 'নেহরু কমিটি' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ঐ বছরেই ২৮ থেকে ৩০শে মে লক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় সম্মেলনের আর এক অধিবেশনে ভাবী শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত খসড়া নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, স্যার আলি ইমাম, স্যার শঙ্করণ নায়ার, স্যার পি. সি. রামস্বামী, পাটনার খ্যাতনামা উদারনৈতিক নেতা ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, মাহ্‌মুদাবাদের রাজাবাহাদুর প্রভৃতি। নেহরু কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের মৌলিক কাঠামো অনুসরণ করে রচিত হয়েছিল। এইভাবে রচিত খসড়া পরে অনুমোদিত হয়। কংগ্রেসপন্থী সদস্যদের অনেকে দাবি করেন যে ভারতের 'পূর্ণ স্বাধীনতার' বনিয়াদেই ভাবী শাসনতন্ত্রের খসড়া রূপায়িত হওয়া উচিত। মডারেট নেতারা ঐরূপ প্রস্তাব অনুমোদনে সম্মত হন না। পূর্ণ-স্বাধীনতার সমর্থকেরা জাতীয় ঐক্যমতের খাতিরে শেষ পর্যন্ত স্থির করেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের আদর্শে রচিত খসড়া তাঁরা অনুমোদনও করবেন না। তার বিরোধিতাও করবেন না।

সর্বদলীয় সম্মেলন বা All parties conference কর্তৃক ভাবী শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা

১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে। পন্ডিত মতিলাল নেহরু অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সর্বদলীয় সম্মেলনের রিপোর্ট সম্পর্কে কংগ্রেসের মতামত প্রকাশ ছিল এই অধিবেশনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। সর্বদলীয় কমিটির সভাপতি যদিও ছিলেন পন্ডিত মতিলাল নেহরু, তথাপি ঐ কমিটির রিপোর্ট কংগ্রেসের রিপোর্ট নয়; সুতরাং সর্বদলীয় সম্মেলনের অন্যতম অংশগ্রহণকারী হিসাবে ঐ রিপোর্ট সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশের দায়িত্ব ছিল কংগ্রেসের। সর্বদলীয় সম্মেলন কংগ্রেসের সম্মেলন ছিল না। কংগ্রেস ছিল ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী একটি দল মাত্র। ইংরেজের সাহায্য ছাড়াই যে ভারতবাসী সর্বদলসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারে, সাইমন কমিশনের জবাব হিসাবে এই ধরণের জাতীয় ঐক্যমত প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল। সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগদানকারী অন্যান্য দলগুলির সাথে একটা ঐকামতে মিলিত হওয়ার স্বার্থেই সম্মেলনের কংগ্রেসপন্থী সভ্যগণ তাঁদের নিজস্ব দাবিকে সঙ্কুচিত করেও রিপোর্টে স্বাক্ষর করেছিলেন। কারণ কমিটির প্রণীত খসড়া যে দলবিশেষের দ্বারা প্রণীত নয়, সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত দাবি

কলিকাতা কংগ্রেস ১৯২৮

অর্থাৎ ভারতের জাতীয় দাবিই তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, সেইভাবেই ইংরেজদের সামনে রিপোর্টখানা তুলে ধরবার রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল। ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী এ বিষয়ে একটা সুকৌশলী প্রস্তাব (tactical resolution) রচনা করেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে ঃ "সর্বদলীয় সম্মেলন কর্তৃক প্রস্তুতীকৃত খসড়া শাসনতন্ত্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাসমূহের সমাধানের পথে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির সূচক। সকল পক্ষ যে ঐক্যমতের বনিয়াদে ঐ রিপোর্ট উপস্থিত করতে পেরেছেন, এ জন্য কংগ্রেস সর্বদলীয় কমিটিকে অভিনন্দিত করছে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য রক্ষা করে এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে ঐ রিপোর্টে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল সমূহের সর্বাধিক ঐক্যমত প্রতিফলিত হয়েছে (it represents the largest measure of agreement among the important parties in the country)।

"যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বা তৎপূর্ববর্তী কোন সময়ে ঐ রিপোর্ট পরিপূর্ণরূপে (in its enterity) গৃহীত হয়, তা হলে কংগ্রেস ঐ রিপোর্ট স্বীকার করে নেবে। অন্যথায় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে কর প্রদান বন্ধ সহ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করবে। অন্তর্বর্তী সময়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির অনুকূলে প্রচারকার্য চালানো যাবে।" সুভাষচন্দ্র বসু এবং জওহরলাল নেহরু উভয়েই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির সুস্পষ্ট ঘোষণা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব দাখিল করেন। কিন্তু সাবজেক্টস্ কমিটিতে আলোচনার পরে জওহরলাল তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব ও গান্ধীজীর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর উত্তেজনাপূর্ণ বাগবিতন্ডার পরে ভোটাধিক্যে সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় ও গান্ধীজী কর্তৃক উত্থাপিত মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের তাৎপর্য

কলকাতা কংগ্রেসের এই প্রস্তাব নিয়ে অনেকে অনেক প্রকার সমালোচনা করেছেন। বহু স্থলেই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে যে কলকাতা কংগ্রেসে সর্বদলীয় কমিটির রিপোর্টের উপরে গান্ধীজীর মূল প্রস্তাব এবং সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী ও সুভাষের মধ্যে মতাদর্শগত সঙ্ঘর্ষ; গান্ধীজী চেয়েছিলেন 'ডোমিনিয়ন স্টেট্যাস্' কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে গৃহীত হোক, আর সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা-কে কংগ্রেসের লক্ষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। যে সকল লেখক এ ধরণের উক্তি করেছেন তাঁরা মূল প্রস্তাব ও সংশোধনী প্রস্তাবের ভাষা ভাল করে পাঠ করেন নি এবং ঐ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা যে সকল বক্তৃতা করেছিলেন তাও অনুধাবন করেন নি। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত—এ প্রশ্ন কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে আদৌ কোন আলোচনার বিষয় ছিল না। কারণ ১৯২৭-এ মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা-কে কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং 'ডোমিনিয়ন স্টেট্যাস্' চাই না পূর্ণ স্বাধীনতা চাই এরূপ কোন প্রশ্ন পুনরুত্থাপিত (reopened) হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। মূল প্রস্তাব, যা গান্ধীজী উত্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে নেহরু কমিটির রিপোর্ট কংগ্রেস গ্রহণ (accept or adopt) করছে এমন কোন কথাও ছিল না। প্রস্তাবের ভাষা ছিল "This

Congress *will adopt* the constitution if it is accepted in its entirely by the British Parliament on or before the 31st December, 1929"। সুতরাং 'will adopt' একটা প্রতিশ্রুতি। যে প্রতিশ্রুতির পূর্বশর্ত ছিল এই যে নেহরু রিপোর্টে যে ধরনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে তার কোন প্রকার অদলবদল না করে তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, এক বছর সময় সীমার মধ্যে। প্রস্তাবের মুখবন্ধে "While adhering to the resolution relating to complete independence passed by the leaders of Congress"—এই কথাগুলিও স্পষ্টভাবে লিখিত ছিল। ঐ একবছরকাল কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বাধীনতার' অনুকূলে প্রচার চালিয়ে যাবে—এ কথাও স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল। প্রস্তাবের কার্যকরী অংশে (operative part-এ) একবছর কালের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঐরূপ পূর্বশর্ত পালন না করলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির বনিয়াদে সংগ্রাম শুরু করবে, এই সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল। সুতরাং ঐ প্রস্তাবের দ্বারা গান্ধীজী ডোমিনিয়ন স্টেট্যাস্ চেয়েছিলেন এ প্রকার উক্তি সমর্থিত হয় না। সুভাষবাবুর সংশোধনী প্রস্তাবে শুধু 'পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য'—এই কথা ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ঐ লক্ষ্য পূর্ববৎসরে মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং উপস্থিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর গরিষ্ঠাংশ ঐ সংশোধন প্রস্তাব 'অপ্রয়োজনীয়' মনে করে তার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এতে সুভাষবাবুর পরাজয় হয়নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে গান্ধীজীর মূল প্রস্তাবটি ছিল একটি 'tactical resolution'। কংগ্রেস যদি নেহরু কমিটির রিপোর্ট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করত, তা হলে সর্বদলীয় সম্মেলনের বনিয়াদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতো, এবং সর্বসম্মত জাতীয় দাবি উত্থাপনের পরিকল্পনাটি ভেঙে যেতো। অকংগ্রেসী দলগুলি আবার কংগ্রেসের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে পড়তেন। অতএব এমনভাবে প্রস্তাবের বয়ান রচিত হল যার মধ্যে rejected শব্দটি স্পষ্টত উল্লিখিত না হলেও কার্যত নেহরু রিপোর্ট বাতিল করা হল। এক বছরের মধ্যে ইংরেজরা ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করবে কোন পাগলের পক্ষেও এরূপ কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। কারণ ভারতে কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মত কার্যত স্বাধীন (de facto independent) সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রেট্ ব্রিটেনের বাণিজ্যিক ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে যেতো। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে ১৯৩০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে একটি ব্যাপক গণ আন্দোলনের ডাক দেবেন গান্ধীজী, এই বিশ্বাসের দ্বারা উৎসাহিত হয়েই ডেলিগেটগণের মধ্যে গরিষ্ঠাংশ মূল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এই ব্যাপকতাকে কোন ক্রমেই 'গান্ধী ও সুভাষের মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব' কিংবা 'গান্ধীজীর জয় ও সুভাষবাবুর পরাজয়' বলে ব্যাখ্যা করা যায় না।

লাহোর কংগ্রেস ও পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব

১৯২৮-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯২৯-এর ডিসেম্বর এই এক বছর সারা দেশের জনমানসে সংগ্রামী উৎসাহের জোয়ার বয়ে গেছে। ইংরেজরা যে কখনই একবছরের মধ্যে ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তনে সম্মত হবে না সে সম্বন্ধে কারও মনে দ্বিধাসন্দেহের অবকাশ ছিল না। সুতরাং কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩০ সালে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ভারতব্যাপী দুর্বার

গণ-আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। আশু সংগ্রামের উত্তেজনায় সর্বত্র জনমানস উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মীগণ আশু সংগ্রামের অনুকূলে জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলবার কাজে নিরত হলেন। এই আশা, উৎসাহ ও সংগ্রামমুখী উদ্দীপনার মধ্যে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল লাহোরে। জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে। কলকাতা প্রস্তাবে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে সময় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য কর্মসূচীগুলির উপরে আলোচনা শেষ করে প্রতিনিধিগণ অপেক্ষা করলেন ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি ১২ ঘটিকা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত। রাত্রি বারোটার পর বসলো কংগ্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। বিপুল উৎসাহের মধ্যে গগনবিদারী আনন্দধ্বনি সহকারে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির বনিয়াদে করপ্রদান বন্ধ সহকারে সর্বভারতীয় স্তরে গণ-আইন-অমান্য শুরু করবার নির্দেশ দিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল। প্রস্তাবে আরও বলা হল যে এই মুহূর্ত থেকেই নেহরু কমিটির রিপোর্ট বাতিল বলে গণ্য হবে। আশু সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের যাবতীয় কংগ্রেসদলভুক্ত সদস্যগণকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হল, এর আরও নির্দেশ প্রচার করা হল যে সংগ্রাম চলাকালে কোন সাধারণ নির্বাচন বা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কংগ্রেস সমর্থকগণ সেই সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না।

লাহোরের কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্তির পরে দুই দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৩০-এর ২রা জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গণ-আন্দোলন শুরু করার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঐ দিন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে চলতি মাসের শেষ রবিবার অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী—ভারতের 'স্বাধীনতা দিবস' রূপে ঘোষিত হবে, এবং ঐ দিন ভারতবর্ষের সর্বত্র, গ্রামে, গঞ্জে, নগরে, ভারতবাসীগণ জাতীয় পতাকাতলে সমবেত হয়ে ব্রিটিশ সম্পর্কবর্জিত 'পূর্ণ স্বরাজ' অর্জনে আত্মনিয়োগ করবার শপথ (pledge) গ্রহণ করবে। জনমানস পূর্ব থেকেই বিস্ফোরন্মুখ অবস্থায় ছিল। ২৬শে জানুয়ারী দেশব্যাপী প্রচন্ড উদ্দীপনার মধ্যে সবত্র ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী স্বাধীনতা দিবস পালিত হল। সহস্র সহস্র জনসভায় যে শপথবাক্য লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হল সেটা রচনা করেছিলেন গান্ধীজী। তার অংশবিশেষ আমরা উদ্ধৃত করছি ঃ

We believe that it is the inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and enjoy the fruits of their toil and have the securities of life.... We believe also that if any government deprives any people of these rights and oppresses them, the people have the further right to alter it or to abolish it. The British Government in India has not only deprived the Indian people of thier freedom but has based itself on the exploitation of the masses and has ruined India economically, politically culturally and spiritually. We believe therefore that India must sever British connection and attain Purna Swaraj or complete independence.... We hold it to be a crime against God and Man

to submit any longer to a rule that has caused the fourfold disaster to our country. ১৯৩০-এর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উদাত্ত গণজাগৃতির ব্যাপক ও উদ্দীপনাময় আত্মপ্রকাশ প্রকটিত হয় ২৬শে জানুয়ারীর সর্বব্যাপী জাতীয় উৎসাহ-উদ্যমের উদ্দাম ও দুর্নিবার স্রোতোধারার মধ্য দিয়ে।

১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নাই। একটি নিঃসীম প্রশান্ত মহাসমুদ্র যদি অকস্মাৎ প্রচণ্ড গর্জন সহকারে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষেপে প্রমত্ত হয়ে ওঠে, তা হলে তার সেই ভয়াল প্রমত্ততার কতটুকু চিত্র ভাষায় প্রকাশ করা যায়? প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা যখন উন্মত্ত বায়ুবেগে ঘরবাড়ী গাছপালা ভেঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বিশাল বিটপিমালাকে উৎপাটিত করে সুবিস্তীর্ণ দেশের সর্বাঙ্গে পদচিহ্ন অঙ্কিত করে সুদূরে প্রস্থান করে, তখন আমরা মুখের ভাষা দিয়ে বায়ুর সে উন্মত্তলীলার কতটুকুকে প্রকাশ করতে পারি? পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে মানুষের ভাষা যার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। ১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মহাজাগৃতির স্বাক্ষরবাহী এমনই এক অভূতপূর্ব জাতীয় চিত্ত-বিস্ফোরণকে প্রকটিত করলো যার প্রকৃত পরিচয়কে রূপায়িত করবার মত ভাষা আমি আয়ত্ব করতে পারি নাই। পাঠকবর্গের কাছে আমি আমার সে দীনতার কথা স্বীকার করছি।

আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করবার আগে গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি স্বয়ং তাঁর সবরমতী আশ্রম থেকে কয়েকজন নির্বাচিত সহকর্মী নিয়ে যাত্রা করবেন, ২০০ মাইল দূরবর্তী ডাণ্ডি নামক সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামে আইনের নিষেধ অমান্য করে স্বহস্তে লবণ প্রস্তুত করবার জন্য। গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন 'হম্ যব্ যাত্রা শুরু করেঙ্গে তো হিন্দুস্থান উথল জায়েঙ্গে'। সত্য সত্যই ১২ই মার্চ গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম থেকে যাত্রা শুরু করবার সাথে সাথে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠলো। ঝড়ের বেগে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো বিশাল উপমহাদেশের নগরে গ্রামে-গঞ্জে, যে ঝড়ে ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের দীনতম পর্ণকুটির যুগপৎ প্রকম্পিত হল।

১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলন। তার উদাত্ত বেগ, তার বিস্তৃতি, ত্যাগ ও বীর্যবত্তা

অনেকের কাছেই আজকের দিনে এই প্রশ্ন শুনতে হয় যে সরকারি আইন-অমান্য করে দু-চার সের বে-আইনী লবণ প্রস্তুত করলেই কি স্বাধীনতা আসে? তা যে আসে না, তা সকলেই জানে। দু-চারটি সরকারি কর্মচারী হত্যা করলেই যে স্বাধীনতা আসে এমন কথাও কেউ বলবেন না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় বিদ্রোহ সংগঠিত হয় কোন না কোন প্রতীককে আশ্রয় করে। বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে এই ধরনের প্রতীককে আশ্রয় করে, ক্রমশ তার ক্ষেত্র ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। আমরা ইংরেজের প্রভুত্ব মানি না। তার তৈরী আইন কানুনের কাছে বশ্যতা স্বীকারের দিন ফুরিয়ে গেছে। এই সার্বিক বিদ্রোহ জাতীয় মানসে এই ধরনের প্রতীককে আশ্রয় করেই পুষ্ট হয়। তখন আর শুধু লবণের মধ্যে বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ থাকে না। সর্বপ্রকার অত্যাচারমূলক সরকারি আইন ও আদেশ সমস্ত কিছু উদ্ধত বিদ্রোহের আঘাতে চূর্ণ করে নিষ্ঠুরতম দণ্ড ও ক্লেশ বরণের পথে জনবিদ্রোহ দৃপ্ত হয়ে ওঠে,

সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন প্রবলতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় বিদ্রোহের ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। তার ভয়াল রূপ ব্রিটিশ সিংহের হৃৎপিন্ডকে ভীতিবিহ্বল কম্পনের আঘাতে অস্থির করে তোলে। পৃথিবীর ইতিহাসে পরশাসনপীড়িত এক সুবিশাল উপমহাদেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের এ ধরনের দুর্বার ও ব্যাপক প্রতিরোধ অভিযানের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

গান্ধীজীর 'ডাণ্ডি মার্চ' শুরু হতেই দেশে যে অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার প্লাবন শুরু হয় তার সম্পর্কে *বোম্বে ক্রণিকেল* পত্রিকা মন্তব্য করেন ঃ

"The scenes that preceded, accompanied and followed the great national event were so enthusiastic, magnificent and soul-stirring that indeed they beggar description. Never was the wave of patriotism so powerful in hearts of mankind as it was on this great occasion which is bound to go down to the chapters of the history of India's national freedom, a great beginner of a great movement."[৪]

ডাঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ "Ahmedabad had, on this occasion one of the biggest processions during living memory. With possible exception of children and decrepits every resident of the city watched the procession which was about two miles in length. Those who could not find any standing place in the streets made use of the house tops and galleries open walls and trees, and every conceivable place they could get hold of."[৫]

গান্ধীজী যাত্রাপথে মাঝে মাঝেই থেমে থেমে জনসমাগমের কাছে ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ও অগ্নিক্ষরা ভাষায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। একস্থানে তিনি বলেন ঃ

"The British rule in India has brought about moral, material, cultural and spiritual ruination of this great country. I regard this rule as a curse. I am out to destroy this system of Government. I have sung the tune of 'God save the King' and have taught others to sing it. I was a believer in the politics of petitions, deputations and friendly negotiations. But all those have gone to dogs. I know that those are not the ways to bring this Government round. Sedition has become my religion."[৬] গান্ধীজীর নির্দেশ ছিল ৬ই এপ্রিল ভারতের সর্বত্র আইন-অমান্য শুরু হবে। সুতরাং সারাদেশ ঐ তারিখ থেকে সংগ্রামী উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। ডাঃ সীতারামাইয়ার ভাষায় ঃ "The country was ablaze from end to end."

হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের জনতা জাতীয় মুক্তির সংকল্প অন্তরে গ্রহণ করে আন্দোলনে সামিল হল। নারীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ, ধনী নির্ধন ভেসে চললো আন্দোলনের জোয়ারে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। গ্রামীণ কৃষকেরা মাঠের কাজ ফেলে মিছিলে এসে সামিল

হল। একটা ক্ষুদ্র গ্রামের জনসভায় হাজার লোক যোগদান করত। ইংরেজের অত্যাচারের ষ্টীম রোলারও চলতে লাগলো সমান বেগে। কারাবরণের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান, তারই লাগি তাড়াতাড়ি।' শান্তিপূর্ণ জনতার উপরে পুলিশের নির্মম গুলীবর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। ১৪ই জুলাই, ১৯৩০ তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব হেগ্ সাহেব (Mr. H. G. Haig) জানান ১৫ই এপ্রিল থেকে ৩১শে মে এই দেড়মাস বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে মোট ১০১ জন নিহত হয়েছে এবং ৪১৮ জন আহত হয়েছে। তার মধ্যে, ২৩শে এপ্রিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পুলিশের গুলীতে ৩০ জন ব্যক্তি প্রাণ হারায়। ২০শে এপ্রিল চট্টগ্রামে পুলিশ গুলী করে ১০ জনকে হত্যা করে। ৮ই মে বোম্বাইয়ের শোলাপুরে পুলিশ গুলী করে ১২ জন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে ও ২৮ জনকে জখম করে। ২৬/২৭ মে বোম্বাই বাজারে পুলিশের গুলীতে নিহত হয় ৫ জন ও আহত হয় ৬৭ জন। ১লা এপ্রিল কলকাতায় পুলিশের গুলীতে নিহত হয় ৭ জন ও আহত হয় ৫৯ জন। মে মাসের শেষ সপ্তাহে রেঙ্গুনে পুলিশের গুলীতে ২২ জন নিহত হয়, এইরূপে সারা ভারতে শান্তিপূর্ণ আইন-অমান্য আন্দোলন দমনের জন্য ইংরেজ সরকার বর্বরতম পৈশাচিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেও আন্দোলনের উদ্দাম গতিবেগ প্রশমন করতে সমর্থ হয় না। এই আন্দোলনে সারা ভারতে এক লক্ষ লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। সরকারের যতগুলি কারাগার ছিল সেগুলি ভর্তি হয়ে যায়। তখন টিনের চালা তুলে কিংবা পুরানো পরিত্যক্ত সরকারি দালানগুলি ঝেড়ে পুঁছে নূতন নূতন 'স্পেশাল জেল' খোলা হয়। অচিরাৎ সেগুলিও ভর্তি হয়ে যায়। তখন অগত্যা গ্রেপ্তার বন্ধ করে নিষ্ঠুর মারপিট শুরু হয়। মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুকে লবণ প্রস্তুতকারী স্বেচ্ছাসেবকদের শরীরের উপরে ফুটন্ত লবণাক্ত জল ঢেলে দেওয়া হয়। যারা স্বেচ্ছাসেবকদেরকে আশ্রয় বা আহার দিয়েছিল তাদের বাড়ীঘর সম্পত্তি ইস্তক তাদের গরু-বাছুর, ধানের গোলা লুঠ করা হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যদানের অপরাধে নারী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ পৈশাচিক প্রহারের শিকার হয়। যাদের কারাদণ্ড হয় তাদের অনেকেরই কারাদণ্ডের সাথে জরিমানা প্রদানের আদেশ হয়। জরিমানা প্রদানে কংগ্রেসের নিষেধ ছিল। অতএব জরিমানা আদায়ের ছলে এইসব লোকের মূল্যবান সম্পত্তি নিলাম করা হয়। দেশের লোক এই সব নিলাম ডাকায় অংশ গ্রহণ করতো না। অতএব পুলিসের কর্মচারীরা স্বনামে অথবা বেনামে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূল্যবান সম্পত্তি নিলাম ডেকে নামমাত্র মূল্যে কিনে নিত। পাকিস্তানের খ্যাতনামা নেতা মিঞা ইফ্‌তিখারউদ্দিনের মোটর গাড়ী ৫০০ টাকা নিলামে বিক্রী হয়। ২৪ পরগণার মহিষবাথানের লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের একটি গ্রামোফন (অনেকগুলি রেকর্ড সহ) তিন টাকা মূল্যে নিলামে বিক্রয় হয়। ক্রেতা ছিলেন জনৈক সহকারি দারোগা। দেশের মানুষ এই আইন-অমান্য আন্দোলনে পরিমাণহীন ত্যাগ ও দুঃখবরনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে।

যদিও প্রচুর সংখ্যায় মুসলমান জনসাধারণ এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। তথাপি সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করতে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছেন। গান্ধীজী যখন ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখটিকে 'ভারতের স্বাধীনতা

দিবস রূপে' ঘোষণা করে ঐ দিন ভারতবর্ষের সর্বত্র মুক্তিকামী ভারতবাসীগণ কর্তৃক পূর্বোক্তরূপ 'স্বাধীনতার শপথবাক্য' গ্রহণের নির্দেশ দান করেন, তখন মৌলানা মহম্মদ আলি, তাঁর ভ্রাতা মৌলানা শওকত আলি, মৌলানা শকী দাউদী ও নবাব ইসমাইল খাঁ এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করে স্বাধীনতা দিবসের সমাবেশে যোগদান করতে মুসলমান সম্প্রদায়কে নিষেধ করেন। তাঁরা বলেন যে হিন্দু নেতৃবর্গ যেহেতু মুসলমানদের সাথে পূর্বাহ্নে কোন আপোষ রফা না করে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করছেন, অতএব ঐ আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদান করা উচিত হবে না।[৭] এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে বিদেশী সরকারের ইঙ্গিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করাই ছিল তথাকথিত 'মুসলিম রাজনীতির' প্রধান কর্মসূচী। তৎসত্ত্বেও প্রচুর সংখ্যক মুসলমান আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ইংরেজের সমর্থক মুসলিম রাজনীতিকদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজের চিরস্থায়ী অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করা ও এই অপকর্মের পুরস্কার স্বরূপে ইংরেজ শাসকদের অনুগ্রহ প্রদত্ত কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা আহরণ করা। বলা বাহুল্য এই সকল সুযোগ সুবিধা এমন ছিল যা শুধু উচ্চবিত্ত ইংরেজতোষক মুসলমানদের শ্রেণী স্বার্থের পোষক।

সারাভারত জমিয়ত-উল-উলেমা কর্তৃক আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ঢাকা শহরের নারিন্দা একটি মসজিদের সম্মুখ দিয়ে যখন স্বাধীনতা দিবসের মিছিল যাচ্ছিল তখন মসজিদের মধ্য থেকে কিছু মুসলমান বেরিয়ে এসে গোলমাল শুরু করেন এবং ছোটখাটো একটি সঙ্ঘর্ষ হয়। তবে এই অশান্তি অচিরাৎ প্রশমিত হয়। কোন প্রাণহানি ঘটেনি। এদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শাস্ত্রবিদগণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান 'জমিয়ত-উল্-উলেমা-ই-হিন্দ' ১৯৩০ এর ৭ই মে তারিখে পাঞ্জাবে আম্বালা শহরে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয়ঃ

"Where as complete freedom of the country and nation from British domination is the only means to put a stop to all mischiefs and safeguard the honour of Islam, this session of the Jamiat appeals to the Muslims that for the freedom of the country and to protect from the outrage the Islamic personal laws, they should, in coopration with the congress, carry on nonviolent struggle freedom with courage zeal and determination"। ঐ সম্মেলনে গৃহীত আর একটি প্রস্তাবে বলা হয় "মদ্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জন সমর্থন করে জমিয়তের পক্ষ থেকে শীঘ্রই 'ফতোয়া' ও 'ইস্তাহার' প্রচার করা হবে।"

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে জমিয়ত-উল-উলেমা-ই হিন্দ বরাবরই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করেছেন এবং ইংরেজের অনুগ্রহজীবী নবাব, নাইট, খাঁ বাহাদুর, খাঁ সাহেবদের জাতীয়তাবিরোধী কাজকর্ম কোনদিন সমর্থন করেন নাই। জমিয়ত কর্তৃক পরিকল্পিত সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইসলামিক শিক্ষায়তন দেওবন্দের ইসলামিক

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মৌলানা হোসেন আহমদ খাদানী চিরদিনই জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাজনীতিকদের সমর্থক ছিলেন এবং কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ যোগদান করেছেন ও পুনঃ পুনঃ কারাবরণ করেছেন।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ও পরবর্তী ঘটনা

ব্রিটিশবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাসের মত আন্দোলনের গতিবেগ ক্রমাগত স্ফীত হতে থাকে। বালির বাঁধ দিয়ে যেমন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের উদ্ধত তরঙ্গবিক্ষোপকে আটকানো যায় না, সেই প্রকার সরকারি পুলিশবাহিনীর সামুদ্রিক শক্তি সেই উদ্দাম জনবিক্ষোভ প্রশমনের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। দিনের আলোয় গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার মত সাহস ছিল না সর্বশক্তিমান ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর। ৫ই এপ্রিল রাত্রি ১টা ১০ মিনিটের সময়ে গান্ধীকে অকস্মাৎ তাঁর দীনশয্যা থেকে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে একখানি মোটর লরীতে চাপিয়ে বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে একস্থানে নামিয়ে নিয়ে ট্রেনযোগে যারবেদা জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যূষে গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হয়। পূর্বের বন্দোবস্ত মত গান্ধীজীর কার্যভার গ্রহণ করেন বৃদ্ধ নেতা আব্বাস তায়েবজী। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র বিক্ষোভের আগুনে ভারতের আকাশ রাঙা হয়ে ওঠে। কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সমস্ত বড় শহরে হাটবাজার দোকানপাট অফিস আদালত সব বন্ধ হয়ে যায়। বোম্বাইয়ের ৪০টি বড় বড় কারখানার শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে কাজ বন্ধ করে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পঞ্চাশ হাজার লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, মিছিল করে। জি. আই. পি ও বি. বি সি. আই রেলওয়ের ওয়ার্কশপ বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। বস্ত্রব্যবসায়ীরা ছয়দিন ব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শোলাপুরে কিছু উত্তেজিত মানুষ ছয়টি পুলিশ চৌকীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সরকারের পৈশাচিক প্রতিহিংসা ২৫ জনকে হত্যা করে ও প্রায় ১০০ জনকে বন্দুকের গুলীতে জখম করে পৈশাচিক হিংস্রতার রেকর্ড সৃষ্টি করে। গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদে পানামার ভারতীয় অধিবাসীগণ ২৪ ঘণ্টার হরতাল পালন করে। অনুরূপভাবে হরতাল পালন করে সুমাত্রা দ্বীপের ও নাইরোবীর প্রবাসী ভারতীয়গণ। ফ্রান্সের নানা সংবাদপত্রে গান্ধীর প্রশস্তিমূলক বিবরণ প্রকাশিত হয়। জার্মানীর অনেক বস্ত্রপ্রস্তানীকারক বিলাতের কারখানাসমূহে যে সকল সুতিবস্ত্রের অর্ডার দিয়েছিল তাদের অনেকে সে সকল অর্ডার বাতিল করে দেয়। ভারতবর্ষেরও বহুতর ব্যবসায়ী বিলাতী দ্রব্যের আমদানির ব্যাপারে নতুন অর্ডার দিতে অস্বীকার করেন এবং অনেকে পূর্বের দেওয়া অর্ডার বাতিল করে দেয়। ম্যাঞ্চেষ্টার ও লিভারপুলের অনেক বস্ত্রকলের কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

আমেরিকার ১০২ জন খৃস্টান ধর্মযাজক (clargymen) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. ম্যাকডোনাল্ডের নিকটে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করে তাঁকে অনুরোধ করেন গান্ধীজী ও ভারতীয় জনগণের সাথে আপোষ মীমাংসার জন্য উদ্যোগী হতে তাঁকে আহ্বান জানান। এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নিউ ইয়র্কের ডঃ জোহন হেইনস হোম্‌স্ (Dr. John Hayenes Holmes)। ধর্মযাজকগণ তাঁদের আবেদনে এ কথা উল্লেখ করেন যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যেন গ্রেট ব্রিটেন, ভারতবর্ষ ও সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে মানবজাতির চূড়ান্ত অকল্যাণের সম্ভাবনাযুক্ত বিরোধ নিরসনে উদ্যোগী হন (The message appealed

to the Prime Minister in the interests of Britain. India and the world to avoid the tragedy of a conflict which would mean catastrophe for all mankind.)[৮]

আন্দোলনের দুর্বার গতি বিলাতের বণিকমহলকে আতঙ্কে অস্থির করে তোলে। বিলাতের *Daily Mail*- এর ম্যাঞ্চেষ্টারের সংবাদদাতা লেখেন : "The latest news from India is likely to bring Lancashires' Indian trade to a complete standstill. Already spinning mills and weaving sheds are closing down indefinitely. are thousands of operaters and joining the ranks of the unemployed."[৯]

আন্দোলন দমনের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা। মিঃ ব্রেইলসফোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণী

ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সিংহ নিরস্ত্র জনসাধারণের বলপ্রয়োগবর্জিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমনের জন্য যে উন্মত্ত হিংস্রতার আশ্রয় গ্রহণ করে তা আইন, ন্যায়, নীতি ও মনুষ্যত্ববোধের সকল সীমালঙ্ঘন করে ইতিহাসের ভাণ্ডারে ব্রিটিশ জাতির দূরপনেয় কলঙ্কের এক ঘৃণার্হ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এই সময়ে ব্রিটিশ সাংবাদিক মিঃ ব্রেইল্‌স্‌ফোর্ড (Mr. Brailsford) ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করে সরকারি পৈশাচিকতার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, সে বিবরণটি কিছুটা দীর্ঘ হলেও তার ঐতিহাসিক মূল্যের কথা বিবেচনা করে আমরা তার অনেকাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। ১৯৩১ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে বিলাতের *ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান* পত্রিকায় এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মিঃ ব্রেইল্‌স্‌ফোর্ড লিখেছেন :

"****Everywhere one heard complaints about the brutality of the police in dispersing prohibitted meetings. I heard much to this effect from an English eye-witness, and from Indian doctors who attended the injured. I also questioned police officers. ****Though the speeches quietly spoken was seditious, they always condemned violence, and the immense crowds, squatting silent on the ground, after spinning as they listened, with a big proportion of women among them, were gentle and passive as only Indians can be. **** As it was, especially in Bombay, the policy of rough dispersal moved the whole city to anger. To face *lathi* charges became a point of honour, and in a spirit of martyrdom, volunteers went out in hundreds to be beaten. They gave a display of disciplined passive courage. Again and again I heard descriptions by Europeans of the beating of slight and perfectly passive youths by barly constables which made one almost physically sick.

"****At Calcutta some students witnessing from a balcony of the university the brutal beating of participants in a peaceful procession, shouted 'Cowards'. Two hours later, the police returned, rested into the

university under an English officer, invaded the classrooms and beat the students indiscriminately as they sat at their desks till the walls were spattered with blood. I heard details of this affair from professors whose repute in the European scientific world stands high. ****A similar affair occurred at Lahore where the police, again under an English officer, invaded a college and beat not only the students but professors also. ****At Contai in Bengal, five villagers were pushed into a tank and drowned. At Merrat I met a leading lawyer who was the chief speaker at a dispersed meeting. While under arrest, he was beaten and in this position a policeman shot him at close range so that his arm had to be amputated.

"****Of the police brutality in the villages of Gujrat, I had ample evidence, for I spent five days touring them. The peasants, almost to a man were refusing from a mixture of motives, personal devotion to Gandhi, desire for Swaraj and economic distress due to terrific fall of agricultural prices—to pay the land tax. The reply is to confiscate their fields, buffaloes, irrigation pums etc, and these are sold at nominal prices so that for a tax of Rs. 40/- or so, a man looses his all. The usual date of collection was anticipated by three months, so that peasants, who had already paid two instalments for 1930, were required, in last October, to pay the instalment normally due in January 1931. The police, armed with rifles and *lathis*, made a practice of surrounding the disaffected villages and beating peasants indiscriminately with lathis or the but-end of a rifle. I have fortyfive naratives given to me personally by the victims, and in all but two cases I saw their wounds and bruises (one gine was two modest to show them). Some of these cases were serious; one man had a broken arm, another a thumb-joint cut to the bone. Other cases which I could not verify were in a distant hospital. ****I have statements of several men who themselves were not tax payers, but were compelled by beating to pay an absent neighbour's tax ****In two cases a man was beaten till he removed his Gandhi Cap. A frequent police joke was to say—'Do you want *Swaraj*? Then here it is'—and down would came the *lathi*."[১০]

কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রামের সাথে যাঁদের প্রায় কোন-প্রকার সম্পর্ক ছিল না—তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে আইন-অমান্য আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকগণকে সামিল করা হয় নাই। এ ধরনের মন্তব্য অসত্য এবং ঐ সব ঐতিহাসিকের অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত বা অভিসন্ধি প্রণোদিত অপভাষণ মাত্র। ভারতবর্ষের যে

লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু দেশপ্রেমের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি অর্জনের জন্য অপরিমিত ত্যাগ ও দুঃসহ ক্লেশ বরণ করেছে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেণীর মানুষ ছিল। কৃষক ও শ্রমিকেরাও সাধ্যানুযায়ী সে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে। ভারতের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী দেশপ্রেমে অপরাপর সম্প্রদায় থেকে পশ্চাৎপদ ছিল না। ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রামে অগণিত নিম্ন মধ্যবিত্ত যুবক ও বয়স্ক লোক দীর্ঘ কারাবাস দারিদ্র্য ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করেছেন অনেকে জীবন দান করেছেন, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগতভাবে কোন মুনাফা আহরণের মনোবৃত্তি তাঁদের ছিল না। দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন। কৃষক ও শ্রমিকেরাও সেই দেশপ্রেমের তাগিদেই আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি সহ্য করেছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। জাতীয় জাগৃতির সেই পর্যায়ে কৃষক-শ্রমিকের শ্রেণীভিত্তিক সংগ্রাম দানা বাঁধে নি। সুতরাং যাঁরা বলেন যে কৃষক ও শ্রমিকের শ্রেণীগত আর্থিক দাবি আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলে কৃষক ও শ্রমিকেরা এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় নি তাঁরা পরোক্ষে কৃষক ও শ্রমিকদের দেশপ্রেমের অবমাননা করেন। 'আমার কতটুকু লাভ হবে বলুন—তারপর বুঝে শুনে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবো'—এ ধরনের মনোবৃত্তি সম্পন্ন কৃষক বা শ্রমিক অন্তত সে যুগে ছিল না।

ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম যে বহু শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন (Multiclass Movement) হতে বাধ্য এ তত্ত্ব মার্ক্সীয় মতবাদের দ্বারা সমর্থিত। কারণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্তরে সংগ্রামের সার্থকতার জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য সংগঠিত করবার প্রয়োজন হয়, সেই ঐক্যকে খণ্ডিত করলে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত শক্ত হয়, জাতীয় সংগ্রাম দুর্বল হয়। ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম সর্বহারার মুক্তিসংগ্রামের একটি আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু সর্বহারার মুক্তি সংগ্রাম একের পর এক নানা মধ্যবর্তী স্তর অতিক্রম করে চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়। প্রত্যেক স্তরের রণকৌশলের প্রকারভেদ আছে। প্রত্যেক স্তরে 'সহযোগী' (allies) ও 'বৈরীপক্ষ' (enemies) পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। এক স্তরে যারা 'সহযোগী' পরবর্তী স্তরে তারা বৈরীপক্ষ বলে গণ্য হতে পারে। আধুনিক কালে অপরিণত মার্ক্সবাদীদের অশিক্ষিত পাণ্ডিত্যের কবলে পড়ে মার্ক্সবাদ নানা ভাবে অপচিত্রিত হচ্ছে।

এদিকে সাইমন কমিশন সম্পর্কে যেভাবে ব্যাপক জনবিক্ষোভ সমগ্র ভারতে উদ্বেল হয়ে ওঠে, সেই বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে আতঙ্কিত করে তোলে। সাইমন কমিশন যে ভারতবাসীদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, সুচতুর ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা তা বুঝতে পারেন এবং ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ জনচিত্তকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে নূতন পথের সন্ধান করতে থাকেন। ১৯২৯-এর জুন মাসে বড়লাট লর্ড আরউইন বিলাত যান, এবং তথায় যথোপযুক্ত শলাপরামর্শ সারা করে অক্টোবর মাসে ভারতে ফিরে আসেন। তার অব্যবহিত পরেই, ৩১শে অক্টোবর ১৯২৯ তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরূপে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক ঘোষণাবাণী প্রচার করেন। ঐ ঘোষণায় বলা হয় যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভারতের ভাবী

গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কিত ঘোষণা

শাসনতন্ত্র রচনার কার্য সুসম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও ভারতবাসী এই উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে লন্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক (Round table conference) বসবে। বড়লাটের এই ঘোষণা অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় রচিত ছিল এবং সুদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ কোন না কোন দিন কানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলির তুল্য মর্যাদা অর্জন করবে এ আশা প্রকাশ ছাড়া ভারতবর্ষকে আশু কোন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার বা মর্যাদা প্রদানের কোন প্রতিশ্রুতি ঐ ঘোষণার মধ্যে ছিল না। "His Majesty's Government should meet representatives both of British India and of the states for the purpose of seeking the greatest possible measure of agreement for the proposals which it would later be the duty of His Majesty's Government to submite to the Parliament." এই ঘোষণা জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতিভাত হল। কংগ্রেস এই ঘোষণাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহরু বলেন ঃ

"Dominion status in action to which he (Captain Wedgewood Benm) draws attention, has been .. share for us, and has certainly not reduced exploitation of India. ****He has given us some insight into what more Dominion status may mean for us. It means the shadow of authority to a hars free of Indians, and more repression and exploitation of the masses. ****Peace can not come at the point of bayonet and if we are to continue to be dominated by the allien people. ****We have but one goal today, and that of independence. ****We stand therefore work for the fullest freedom of India. The congress has not acknowledge and will not acknowldge the right of the British Parliament to dictate to us in any way."[১১]

আইন-অমান্য আন্দোলনের দুর্বার তরঙ্গ যখন ভারতীয় জনচিত্তকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার উত্তুঙ্গস্তরে উপনীত করেছে, সেই সময়ে ইংরেজদের অনুগ্রহজীবী কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে ১২ই নভেম্বর ১৯৩০ লন্ডন শহরে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন শুরু হয়। কিন্তু কংগ্রেস বর্জিত এই বৈঠক এমন কি ইংরেজ রাজনীতিকদের কাছেও নিতান্ত ছেলেখেলা বলে প্রতিভাত হয় এবং মাত্র ২/১টি কমিটি গঠন করবার পর ১৯শে জানুয়ারী ১৯৩১ তারিখে ঐ বৈঠক অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

এদিকে নিষ্ঠুরতম সরকারি নৃশংসতা সত্ত্বেও আন্দোলনের গতিবেগ প্রশমিত হওয়ার কোণ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিলাতের বণিকশ্রেণী চোখে অন্ধকার দেখছে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আর কোন অধিবেশন আহ্বানও যে নিতান্ত হাস্যকর প্রয়াস হবে, ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা সে কথাও ভালোভাবেই বুঝেছেন। নিরুপায় লর্ড আরউইন অগত্যা ভারতের নরমপন্থী (moderate) রাজনীতিকদের শরণাপন্ন হলেন। তিনি গুরু তেজবাহাদুর

শাপ্রু ও স্যার চিমনলাল শীতলবাদকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বড়লাটের অনুরোধে মডারেট রাজনীতিকদের সংস্থা ইন্ডিয়ান লিবার‍্যাল ফেডারেশনের কাউন্সিলের এক অধিবেশন বসলো। এই কাউন্সিল আইন-অমান্য আন্দোলনের নিন্দা করলেন বটে, কিন্তু সেই সাথে দাবি করলেন যে ডোমিনিয়ন স্টেট্যাসের ভিত্তিতেই গোলটেবিল বৈঠক আহুত হোক এবং সেইরূপে বৈঠকের আনুষ্ঠানিক শর্তাবলী (terms of reference) ঘোষিত হোক। যার ফলে যে সকল গোষ্ঠী ঐ বৈঠক সম্পর্কে বর্তমানে প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন তাঁরাও বৈঠকে যোগদানে আগ্রহী হন। কাউন্সিল আরও প্রস্তাব করলেন যে কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করে এমন একটি আপোষরফার পন্থা উদ্ভাবন করা হোক, যার ফলে একই কালে কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন থেকে বিরতি ঘোষণা করবেন ও সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্টও যাবতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করবেন এবং এইভাবে গোলটেবিল বৈঠকে সকল রাজনৈতিক দলের যোগদানের পথ উন্মোচিত করবেন, (It further laid strees on the simultaneous cessation of civil disobedience and initiation of active conciliation on the part of the Government to be manifested by release of all those whose freedom has been restrained for political reasons and the taking of all parties into government's full confidence.)"[১২] ইতিমধ্যে বিলাতের *ডেইলি হেরাল্ড* পত্রিকার সম্পাদক মিঃ সোলোকোম্ব্ (Mr. Solocombe), যিনি আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য ভারতে এসেছিলেন, তিনি শান্ত ধীর স্থির আইন-অমান্যকারী স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে সরকারি পুলিশের বীভৎস অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করে অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করেন ও তাঁর পত্রিকায় লিখে পাঠান ঃ

"It was humiliating for an Englishman to stand among the ardent, friendly but deeply moved crowd of volunteers and sympathisers and watch the representatives of the country's administration engaged in this ludicrous embarassing business."[১৩]

২০শে মে তারিখে মিঃ সোলোকোম্ব্ যারবেদা কারাগারে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও কথাবার্তা বলেন। অতঃপর মিঃ সোলোকোম্ব্ ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে *ডেইলী হেরাল্ড্* পত্রিকায় এক বিবরণী প্রকাশ করেন। মিঃ সোলোকোম্ব্ তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেন যে, 'even at this critical hour a settlement is possible'। তিনি জানান যে কতকগুলি শর্তে আইন-অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানে হয়ত গান্ধীজী সম্মত হতে পারেন। তিনি লেখেন ঃ

Negotiation is still possible and after my two meetings with Gandhi in prison, I am convinced that concilliation will be met with concilliation, but that violence on either side will not compel surrender of the other. Incalculable disastar may yet be avoided by the frank recognition that the

imprisoned and Mahatma now incarnates the very soul of India."[১৪]

অতঃপর মিঃ সোলোকোম্ব্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ও ভারতবিখ্যাত আইনবিদ ডঃ মুকুন্দরাও জয়াকরকে অনুরোধ করেন কংগ্রেসের সাথে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একটা আপোষ রফা সাধনের উদ্দেশ্যে উভয়পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থের (intermidiary-র) দায়িত্ব গ্রহণ করতে। তাঁরা উভয়ে এই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। ১৯৩০-এর জুলাই ও আগস্ট মাসে ঐ দুই নেতা কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতাদের সাথে ও বড়লাট লর্ড আরউইনের সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান দাবিগুলি সম্পর্কে লর্ড আরউইনের প্রতিকূল মনোভাবের কোন হেরফের হয় না। কংগ্রেসের দাবি ছিল প্রধানত (ক) গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা হবে ভারতের শাসনব্যাপারে ভারতবাসীগণ কর্তৃক নির্বাচিত সংস্থার পূর্ণ কর্তৃত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে, ছিটেফোঁটা শাসন সংস্কারের ভিত্তিতে কোন আলোচনা হবে না। (খ) স্বইচ্ছায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ভারতবাসীর থাকবে। (গ) লবণকর সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত করণের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। (ঘ) ইংলন্ড হোমচার্জ নাম দিয়ে যে প্রচুর টাকা প্রতিবৎসর ভারত থেকে লুণ্ঠন করছে, তার যৌক্তিকতা কোন নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন হবে। (ঙ) আন্দোলন দমনের নামে পুলিশী অত্যাচারে যাদের সম্পত্তিহানি ঘটেছে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (চ) আইন-অমান্য স্থগিত হওয়া সত্ত্বেও বিলাতী বস্ত্র ও মদ্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং চলতে থাকবে। পিকেটিং দমনের জন্য যে সকল অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। লর্ড আরউইন এই সমস্ত দাবির কোন একটির সম্পর্কেও সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকৃত হন না। স্যার তেজবাহাদুর ও ডঃ জয়াকর ১৬ই আগস্ট তারিখে মতিলাল নেহরু ও গান্ধী, জওহরলাল প্রভৃতির কাছে পত্র লিখে তাঁদের জানিয়ে দেন লর্ড আরউইনের কাছ থেকে সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি আদায়ে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা লর্ড আরউইন কর্তৃক লিখিত চিঠির কপিও নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। যারবেদা কারাগার থেকে গান্ধীজী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বল্লভভাই প্যাটেল ও জয়রামদাস দৌলতরাম পত্র লিখে স্যার তেজবাহাদুর ও ডঃ জয়াকরকে জানিয়ে দেন যে আপোষ আলোচনার নিবৃত্তি ঘটেছে। আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। লর্ড আরউইন গান্ধীজীর কঠোর মনোভাব দেখে হয়ত কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন। এ দিকে ভারতে যাঁরা ইংরেজদের হিতৈষী বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা এবং বিলাতের বণিক সমাজ আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন। লর্ড আরউইন দুমুখো নীতি অবলম্বন করেছেন। একদিকে আন্দোলন দমনের জন্য দশটি নির্যাতনমূলক অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন। অন্য দিকে বক্তৃতার নিবৃত্তিতে ভারতের উদাত্ত জাতীয়তাবাদী জাগৃতি সম্পর্কে দু চারটা প্রশংসাবাক্যও বর্ষণ করছেন। কলকাতায় ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভায় তিনি বললেন :

সাপ্রু-জয়াকরদৌত্য, প্রথম পর্যায়, আরউইনের অনমনীয়তার ফলে আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

"However emphatically we may condemn the civil disobedience movement, we should. I am satisfied make a profound mistake if we fail

to understand the genuine and powerful meaning of Nationalism that is today animating much of the Indian thought."

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ জওহরলাল নেহরু ও ডঃ সৈয়দ মাহ্‌মুদকে ভিন্ন জেল থেকে যারবেদা কারাগারে নিয়ে আসা হল অর্থাৎ তাঁদেরকে গান্ধীজীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হল।

পূর্বেই বলা হয়েছে রামহীন রামায়ণের মত কংগ্রেস বর্জিত প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ১৯শে জানুয়ারী তারিখে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। বৈঠকের শেষদিকে অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারী ১৯৩১-এ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ব্যামসে ম্যাকডোনাল্ড বৈঠকের সদস্যদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রচার করেন। তিনি বলেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনবিধিতে শাসনবিভাগীয় পদাধিকারীগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভাসমূহের কাছে দায়ী থাকবে, এ নীতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। তবে দেশরক্ষা (সৈন্য বিভাগ) ও বৈদেশিক দপ্তরের উপরে আইনসভার কর্তৃত্ব থাকবে না। তা ছাড়া, কিছুকালের জন্য (for a period of transition) কেন্দ্রে বড়লাটের হাতে ও প্রদেশসমূহে গভর্নরদের হাতে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক দায়িত্বের ব্যাপার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কতকগুলি 'বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত' থাকবে। ঐ বিবৃতির শেষাংশে প্রধানমন্ত্রী বলেন ঃ

"If in the mean time, if there is response to the Viceroy's appeal from those engaged at present in civil disobedience, steps will be taken to enlit their services."

দুই দিন পরে অর্থাৎ ২১শে জানুয়ারী এলাহাবাদে স্বরাজভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে। তখন ওয়ার্কিং কমিটি 'বেআইনী সংস্থা' (unlawful association) বলে ঘোষিত ছিল। তৎসত্ত্বেও বয়োবৃদ্ধ নেতা মদনমোহন মালব্য অসুস্থ শরীর নিয়ে অধিবেশনে আগাগোড়া উপস্থিত থাকেন। ইতিমধ্যে গুরুতর অসুস্থতার কারণে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকেও জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন দেশীয় 'রাজা' (princes)-এর কতিপয় ইংরেজতোষক নামী ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাতে যে তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, কংগ্রেস তাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করছে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে কংগ্রেস যে সকল শর্ত দিয়েছে তা গৃহীত না হলে পুনরায় আপোষ আলোচনার কোন প্রশ্ন ওঠে না। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি দুর্বার বেগে আইন-অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। স্থির হয় যে পরদিন, অর্থাৎ ২২শে জানুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা হবে। কিন্তু ২১শে তারিখেই অকস্মাৎ লন্ডন থেকে স্যার তেজবাহাদুর ও স্যার শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত একখানি টেলিগ্রাম মতিলাল নেহরুর হাতে পৌঁছায়। ঐ টেলিগ্রামে শাপ্রু ও শাস্ত্রী জানান যে তাঁরা অবিলম্বে দেশে ফিরে আসছেন, তাঁদের বক্তব্য শ্রবণ না করে ওয়ার্কিং কমিটি যেন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন। এর ফলে ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব সংবাদপত্রে প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়।

এর পরেই ২৫শে জানুয়ারী বড়লাট লর্ড আরউইন আকস্মিক ভাবে এক ঘোষণা প্রচার করে জানান যে কংগ্রেস যাতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১৯শে জানুয়ারী তারিখের ঘোষণাটি খোলা মনে বিচারবিবেচনা করতে পারেন তদুদ্দেশ্যে ভারত গভর্নমেন্ট প্রাদেশিক গভর্নমেন্টসমূহের সাথে পরামর্শ করে মিঃ গান্ধী এবং ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারীর পরে এ যাবৎ যত কংগ্রেস নেতা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হয়েছেন তাঁদের সকলের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে 'অবৈধ সংস্থা' বলে ঘোষণা করে যে আদেশ প্রচারিত হয়েছিল, সে আদেশ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। লর্ড আরউইন ঐ ঘোষণায় আরও বলেন :

"My government will impose no conditions on these releases, because we feel that the best hope for restoration of peaceful conditions lies in the discussions being conducted by them under terms of unconditional liberty. Our action has been taken in pursuance of a sincere desire to assist the creation of such peaceful conditions as would enable the government to implement the undertaking given by the Prime Minister."[১৫]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 'অবৈধ সংস্থা' বলে ঘোষিত হওয়ার পর যতবার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়েছে ততবারই সঙ্গে সঙ্গে কমিটির যাবতীয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছে। এইভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন চলা কালে ৮/১০ বার নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছে। ঐ সময়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দিষ্ট সভ্য সংখ্যা ছিল ১৫ জন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এইরূপ এক অন্তর্বর্তী কমিটির সভ্যপদে বৃত হন। তার পরেই নৈনীতালে সেই কমিটির অধিবেশনে যোগদান করে তিনি গ্রেপ্তার হন ও ছয়মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। যতদূর মনে পড়ছে এইরূপ সর্বশেষ অন্তর্বর্তী কমিটির সভাপতি ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের খ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী নেতা চৌধুরী খালিকউদ্‌জমান। বড়লাটের ঘোষণা অনুসারে যাবতীয় অন্তর্বর্তী ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যেরই কারামুক্তির আদেশ প্রদত্ত হয়। ঐরূপ কোন সদস্যের পত্নী যদি কারারুদ্ধ হয়ে থাকেন তবে তাঁকেও মুক্তি দিতে হবে, বড়লাট এই মর্মে আদেশ প্রচাব করেন।

দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আপোষ আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একতরফা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের তরফ থেকে কোনরূপ প্রার্থনা বা অনুরোধ জানানো হয় নাই। জুলাই-আগস্ট মাসে শাপ্রু জয়াকরের মধ্যস্থতায় যে আপোষ প্রচেষ্টা হয়, তা লর্ড আরউইনের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই ব্যর্থ হয়। অথবা, ৪/৫ মাস পরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আকস্মিক মতি পরিবর্তনের কারণ কি হতে পারে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকগণের মনকে আলোড়িত করবে। এটা খুবই সম্ভব যে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের শোচনীয় ব্যর্থতা ব্রিটিশ রাজনীতিকগণকে ভাবিত করে তুলেছিল। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ৮৬ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন (সকলেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত), তার মধ্যে ১৩ জন ছিলেন ব্রিটিশ রাজনীতিক, ১৬ জন দেশীয় রাজা (আলোয়ার ও বিকানীদের

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আকস্মিক মতি পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ সমূহ

মহারাজা, ভূপালের নবাব বাহাদুর প্রভৃতি)। বাকী ৫৭ জন মডারেটপন্থী ভারতীয় রাজনীতিক ও নানা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের নেতা, নির্ভেজাল ইংরেজ ভক্ত। ভারতের জনসাধারণের উপরে যে এঁদের বিশেষ কোন প্রভাব নাই, ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা সেকথা ভালোভাবেই জানতেন। মডারেটপন্থী ভারতীয় রাজনীতিকেরাও প্রায় একবাক্যে ঘোষণা করলেন—'ডোমিনিয়ন স্টেট্যাসের' ভিত্তিতেই আলোচনা চলবে। স্যার তেজবাহাদুর, স্যার শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মডারেট নেতৃবৃন্দ অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে হলে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান তাঁরাও বুঝেছিলেন যে কংগ্রেসবিহীন গোলটেবিলবৈঠক যে সিদ্ধান্তই করুক না কেন, ভারতবাসীদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, সাইমন কমিশনকে যে ভাবে ভারতবাসী সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে, গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তও সেইভাবে অগ্রাহ্য হবে। তার অর্থ ভারতে অশান্তি চলতে থাকবে। ব্রিটিশ পণ্যের ভারতীয় বাজার ক্রমাগত সঙ্কুচিত হবে, বিলাতে আর্থিক সঙ্কট দেখা দেবে। অতএব এটা খুবই সম্ভব যে মডারেটপন্থী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও একদল বুদ্ধিমান ব্রিটিশ রাজনীতিক সমবেতভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উপরে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তারই ফলে কংগ্রেসের সাথে আপোষ রফাব জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একতরফা উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ থেকে লর্ড আরউইনের সাথে গান্ধীজীর আলোচনা শুরু হয়। ইতোমধ্যে ৭ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মৃত্যু ঘটে। আলোচনায় কখনও বা আশার আলোকরশ্মি দৃষ্ট হয়, কখনও মেঘের ঘনঘটা। প্রত্যেকটি প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা। ভারতের ভাবী সংবিধান পূর্ণ স্বাধীনতার কতটা নিকটবর্তী হবে? Substance of independence পাওয়া যাবে কি না? সামরিক বিভাগ ও বৈদেশিক বিভাগের উপরে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কতটুকু ভারতীয়দের অনুকূলে সংরক্ষিত থাকবে? বন্দীমুক্তির সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে? পুলিশী প্ররোচনা ও অত্যাচারের ফলে যেখানে হিংসাত্মক আচরণের অজুহাতে সত্যাগ্রহীদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদন্ড হয়েছে, তারা মুক্তি পাবে কিনা? বৈপ্লবিক অপরাধে দণ্ডিত ও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের কি হবে? আইন-অমান্য বন্ধ হলেও বিদেশী পণ্যের বিক্রয় ও মদ্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং কতটা চলতে দেওয়া হবে? পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হবে কি না? করবন্ধ আন্দোলনের জন্য যাদের সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে নিলামে বিক্রয় হয়েছে তারা সম্পত্তি ফেরৎ পাবে কি না?—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। প্রায় প্রতিদিন গান্ধীজী ও লর্ড আরউইনের দীর্ঘ আলোচনা এবং তার পরেই মুক্তিপ্রাপ্ত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে তার রিপোর্ট প্রদান, তাদের প্রত্যেকের মতামত গ্রহণ। এমনও হয়েছে যে কোনদিন বড়লাটের কুঠি থেকে গান্ধীজী ফিরেছেন রাত্রি আড়াইটায়। এইভাবে দিনের পর দিন দীর্ঘ আলোচনার পরে ওয়ার্কিং কমিটির (অর্থাৎ ১৯৩০ জানুয়ারী থেকে শুরু করে যতগুলি ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছে তার) সকল সদস্যের অনুমোদন ক্রমে ৫ই মার্চ ১৯৩১ গান্ধী আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির প্রধান প্রধান শর্ত

গান্ধী-আরউইন চুক্তি/ আইন-অমান্য সাময়িক-ভাবে স্থগিত/ গোল-টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণে কংগ্রেসের সম্মতি

হল—আইন-অমান্য আন্দোলন সাময়িক ভাবে স্থগিত থাকবে; কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবে; বিদেশী পণ্য ও মদ্য বিক্রয়ের সম্পর্কে বলপ্রয়োগ ও জুলুম বর্জিত শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-এর অধিকার কংগ্রেসের থাকবে; আইন-অমান্য আন্দোলনের শুরু থেকে সরকার যে সকল দমনমূলক অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন, তা প্রত্যাহৃত হবে। কিন্তু ১৯৩১ সালের ১নং অর্ডিন্যান্স যা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য চালু করা হয়েছে, সেটি বহাল থাকবে; বিভিন্ন সংস্থাকে বেআইনী-সংস্থা বলে ঘোষণা করে যে সকল আদেশ প্রচারিত হয়েছে তা প্রত্যাহৃত হবে; আইন-অমান্য আন্দোলনে, হিংসাত্মক কার্য্যের অভিযোগে যাঁরা দণ্ডিত হন নাই এমন সব বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে, সমুদ্রের বা লবনাক্ত জলাশয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কোন প্রকার কর প্রদান না করে নিজেরা লবণ প্রস্তুত করতে পারবে; করবন্ধ আন্দোলনে আইনবিগর্হিত উপায়ে যাদের সম্পত্তি হরণ করা হয়েছে তারা অভিযোগ করলে জেলাশাসকেরা উপযুক্ত তদন্ত করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ইত্যাদি।

গান্ধী আরউইন চুক্তি নিয়ে আধুনিক কালে কিছু কিছু অবান্তর সমালোচনা শ্রুত হয়। এক ধরনের সমালোচক আছেন যাঁরা বলেন আন্দোলন সিদ্ধির দুয়ারে পৌঁছেছিল, এমন সময়ে গান্ধীজী গলা টিপে আন্দোলনকে হত্যা করলেন। এ ধরনের সমালোচকরা প্রায়শই এই আন্দোলনের ধারে কাছে ছিলেন না এবং আন্দোলন সম্পর্কে কোনরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এঁদের ছিল না। আন্দোলনে যে সহস্র সহস্র মানুষ ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছেন, তাঁদের মনে এই চুক্তি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তাই দিয়েই এই চুক্তির প্রকৃত রাজনৈতিক মূল্যায়ন সম্ভব। এই চুক্তির ফলে কি আন্দোলনে অংশ-গ্রহণকারীদের মনে হতাশা বা অবসাদ নেমে এসেছিল? অথবা নূতন আশার আলোকে তাঁদের চিত্ত উদ্ভাসিত হয়েছিল? প্রকৃত ঘটনা এই যে কংগ্রেসের মধ্যে কিংবা কংগ্রেস-সমর্থক ব্যক্তিদের মধ্যে এই চুক্তি নূতন উৎসাহের জোয়ার সৃষ্টি করে। সমগ্র দেশে কংগ্রেসের সম্মান ও মর্যাদা প্রচণ্ডরূপে বৃদ্ধি পায়। এই চুক্তি অনুচিত হয়েছে, এমন কোন মন্তব্য কোন কংগ্রেস কর্মীর প্রমুখাৎ প্রকাশ পায় নাই। মুক্তি প্রাপ্ত বন্দীরা যখন নিজ নিজ কাজের এলাকায় ফিরে এসেছেন তখন সহস্র সহস্র মানুষ তাঁদেরকে বীরের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে। চুক্তির ফলে জনউৎসাহের গতিবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা অদম্য উৎসাহে জনসংযোগের কাজে লেগেছেন, শ্রান্তি ক্লান্তি সব যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কর্মীদের মনে বলিষ্ঠতা এসেছে। কংগ্রেসই যে স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি কংগ্রেসবিরোধীদের মনেও এ সত্যের উপলব্ধি জন্মেছে। যে নয়মাস চুক্তি বলবৎ ছিল, ঐ সময়ে কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারাও প্রকাশ্য জনসভায় কংগ্রেসবিরোধী কোন প্রচার করতে সাহস পান নাই। গান্ধীজী নিজের উপরে কোন দায়িত্ব রাখেননি, অতগুলি অন্তর্বর্তী ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সভ্য দিল্লীতে উপস্থিত থেকেছেন। গান্ধীজী প্রতিদিনের আলোচনার রিপোর্ট প্রদান করেছেন তাঁদের কাছে। ঐ সমস্ত সদস্যের সর্বসম্মত অনুমোদন লাভের পরে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সুতরাং গান্ধীজী ঐ চুক্তি করে আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করেছেন—এ ধরনের সমালোচনা অপরিণতবুদ্ধি বালকের মন্তব্যের মতই উপেক্ষার যোগ্য।

জনমনে গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রতিক্রিয়া

২৯শে আগস্ট ১৯৩১ গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বোম্বাই বন্দর থেকে রওনা হন। সঙ্গী ছিলেন তাঁর পুত্র দেবদাস গান্ধী, দুই জন সেক্রেটারী ও মিস্ শ্লেড্ (মীরা বেন)। গান্ধীজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি (sole delegate) হিসাবে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে কংগ্রেসের আর কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। তবে কংগ্রেসনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক নারী প্রতিনিধি (women delegate) হিসাবে মনোনীতা হয়ে বৈঠকে যোগদান করেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অবশ্য ঘোষণা করেন যে অন্য যে কোন দল এককভাবে যত সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে কংগ্রেসকে তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দিতে গভর্নমেন্ট প্রস্তুত আছেন। কিন্তু গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি একমাত্র প্রতিনিধি (sole delegate) রূপে গান্ধীজীকে প্রেরণ করেন। গান্ধীজী বলেন যে সংখ্যা দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা জাতীয় দাবি উত্থাপন করব। আমাদের যা বক্তব্য তা একজনে বল্‌লেই চলবে। প্রতিনিধি একজন হলেও কংগ্রেস প্রতিনিধিকেই অধিকাংশ ভারতবাসীর প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে নেওয়ার দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

গান্ধীজীকে 'একমাত্র প্রতিনিধি' করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত শুভ ফলপ্রসূ হয় নাই। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হয়েছিল কি না সে প্রশ্ন তর্কাতীত নয়। মনে হয়, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ভাব প্রবণতার আতিশয্য কংগ্রেস নেতৃবর্গের বাস্তববুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল। বিলাতের একদল কট্টর রক্ষণশীল রাজনীতিক যে গোপনে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও জাতীয়তাবিরোধী শক্তিসমূহের সহায়তায় ভারতবাসীর জাতীয় একতাকে বিধ্বস্ত করবার হীনষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, এই বিপদ সম্পর্কে কংগ্রেসনেতৃবর্গ যথাযথরূপে অবহিত ছিলেন না। ইংরেজের অনুগ্রহজীবী একদল রাজনীতিককে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে প্রদর্শন করে এঁরা গোলটেবিল বৈঠকের সামনে এমন একটা কৃত্রিম চিত্র উপস্থিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে কংগ্রেস শুধুমাত্র স্বল্পসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর প্রতিনিধি, মুসলিম সম্প্রদায় এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে যে বিপুল সংখ্যক অনুন্নত জাতি (depressed classes) রয়েছে তারা কংগ্রেসকর্তৃক উপেক্ষিত এবং তাদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ কংগ্রেসের হাতে নিরাপদ নয়। অতএব ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই তথাকথিত সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের দায়িত্বকে উপেক্ষা করতে পারে না—ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে এই তথাকথিত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সম্পর্কে ব্যবস্থা থাকা চাই এবং সেজন্য বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্নরদের হাতে প্রচুর পরিমাণে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা চাই, এই সব প্রচার চালানো হচ্ছিল। একদিকে যেমন ইংরেজের অনুগ্রহজীবী রাজ-উপাধির শিরস্ত্রাণশোভিত সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গকে মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত মুখপাত্ররূপে প্রদর্শন করা হল, অপরদিকে ডঃ আম্বেদকরকে যাবতীয় অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত নেতারূপে চিত্রিত করে প্রচার অভিযান চলতে লাগলো। যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ও তথাকথিত অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে বরাবর যুক্ত থেকে প্রচুর ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছেন, তাঁদের কথা বিবেচনার মধ্যে স্থান পেলো না। কংগ্রেস ইচ্ছা করলেই জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান কংগ্রেস পক্ষীয়

মুসলিম নেতাদের কয়েকজনকে এবং তথাকথিত অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের কংগ্রেসপন্থী কয়েকজন নেতাকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভূক্ত করতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে বিলাতের লোকেও বুঝতে পারতো যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিমনেতারা এবং ডঃ আম্বেদকর মুসলিম সম্প্রদায়ের বা তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায় সমুহের স্বয়ং নির্বাচিত নেতা মাত্র, ঐ দুই সম্প্রদায়ভুক্ত প্রচুর সংখ্যক লোক তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করেন না। মুসলিমদের মধ্যে স্যার ওয়াজির হাসানের নেতৃত্বাধীন শিয়া সম্প্রদায়, সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জমিয়ত-উল্-উলেমা-ই-হিন্দ, অহর গোষ্ঠী, বিহারের মোমিন শ্রেণী, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান্-ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামীগণ, বেলুচিস্তানের খান্ আব্দুস্ সামাদ খানের অনুগামীরা, বাংলার কৃষকপ্রজা দলের নেতৃবৃন্দ, এঁরা যে শুধু কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন তাই নয়, কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতাসংগ্রামে এঁদের অনেকের ত্যাগ ও দুঃখবরনের ঐতিহ্য যেমন অত্যুজ্জ্বল, তেমনই অবিস্মরণীয়। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানগণের অতুলনীয় ত্যাগ, দুঃখবরণ, শৌর্য ও আত্মবিসর্জনের কাহিনী জাতীয় ইতিহাসের চিরকালীন সম্পদ। ৩রা জুন ১৯৩০ তারিখে *বোম্বে ক্রনিকেল* পত্রিকার সম্পাদক এম. এ. ব্রেলভী ও জমিয়ত-উল-উলেমার সম্পাদক মৌলানা আহমদ সইদ্-এর নেতৃত্বে একমাইল দীর্ঘ এক মুসলিম শোভাযাত্রা আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে।[১৬] কংগ্রেস যে কোন এককদলের চেয়ে বেশী সংখ্যায় প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ লাভ করা সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রতিনিধিমণ্ডলীতে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত জাতীয়তাবাদী কোন কোন নেতাকে অন্তর্ভুক্ত না করে গান্ধীজীকে 'একমাত্র প্রতিনিধি' মনোনীত করে ভুল করেছিলেন। এই ভুলের ফলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও ইংরেজের অনুগ্রহজীবী মুসলিম নেতাদের ও ডঃ আম্বেদকরের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের দাবি যে একটা শতছিদ্র জলপাত্রের তুল্য, এই কঠোর সত্যটি বৈঠকের সামনে যথাযথরূপে তুলে ধরা গেল না। গান্ধীজী লর্ড আরউইনকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন যে গোলটেবিল বৈঠকে তিনি যে সকল প্রতিনিধি মনোনীত করবেন তার মধ্যে যেন ডাঃ আন্সারীর নাম থাকে। কিন্তু বড়লাট প্রভাবশালী মুসলিম নেতাদের প্রবল আপত্তির কথা উল্লেখ করে সে অনুরোধ পালনে অসম্মত হন। কংগ্রেস তার হাতের তাস ছেড়ে দিয়েছে। কংগ্রেসের নিজস্ব তালিকায় অনায়াসে ডাঃ আন্সারী, তাসউদ্দিক আহম্মদ শেরওয়ানী, মিঃ আসফ আলি, ডাঃ সমিউদ্দিন কিচলু, ডাঃ খান সাহেব, ডঃ সৈয়দ মাহমুদ প্রভৃতির মধ্য থেকে অন্ততঃ ২/৩ জনকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতো, কিন্তু সাময়িক ভাবপ্রবণতার দ্বারা নেতৃবর্গের বাস্তববুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছিল। সরকার মনোনীত মুসলিম প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে একমাত্র পাটনার স্যার আলি ইমাম জাতীয়তাবাদী মতাবলম্বী ছিলেন। ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলনে স্যার আলি ইমাম সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রথার নিন্দা করেন ঃ

"He declared that although he at one time belonged to the school of political thought which take great stress on separate electorate...he had after careful study come definitely to the conclusion that seperate

electorate not only meant negation of Indian nationalism, but was definitely harmful to Muslims themselves."[১৭]

গান্ধীজী ১২ই সেপ্টেম্বর লন্ডনে পৌঁছান। ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি গোলটেবিল বৈঠকের ফেডাবাল স্ট্রাক্‌কার কমিটিতে তাঁর প্রথম ভাষণ দেন। তিনি বলেন, তিনি খোলা মন নিয়ে বৈঠকে যোগ দিতে এসেছেন, যদি কখনও তাঁর মনে হয় যে বৈঠকের মাধ্যমে তিনি কোন পক্ষের কোন উপকার করতে পারছেন না, তা হলে তিনি সরে দাঁড়াবেন (will not hesitate to withdraw)। He then read the mandate of the Karachi congress and stated that the goal ol absolute independence stated in it remained intact......"He said he had carefully read the Premier's statement on British policy and had found it fall far short of the congress claims," He said, "he did not minimise Britain's ability to hold India in subjection under sword.....If possible he would convince the British Mnisters that India was a valuable partner to be held by the silken cord of love."[১৮]

কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকের কাজ সামান্যমাত্র অগ্রসর হতেই বিলাতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। অক্টোবরের প্রথমেই ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদলের পরাজয় ঘটে। মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড এতদিন শ্রমিকদলের নেতারূপেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করেছিলেন। অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্‌কালে তিনি শ্রমিকদল পরিত্যাগ করে জাতীয় শ্রমিকদল নামে এক ক্ষুদ্র দল গঠন করেন এবং নির্বাচনের পরে রক্ষণশীল সদস্যভূয়িষ্ঠ পার্লামেন্টের আওতায় জাতীয় যুক্ত সরকার (coalition government)-এর নেতারূপে প্রধান মন্ত্রীত্ব বজায় রাখেন। তখন তিনি রক্ষণশীলদের হাতের পুতুল। কট্টর রক্ষণশীল স্যার স্যামুয়েল হোর ভারত সচিবের পদ লাভ করেন। নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র তৎকর্তৃক সম্পাদিত *Indian Annual Register*-এ মন্তব্য করেছেন :

বিলাতেব সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলেব পরাজয় এবং গোলটেবিল বৈঠকের উপরে তার প্রভাব

"October opened with the dissolution of the parliament. In the General elections, The House of Commons had been packed with torries, as the R.T.C. had been packed with nominees and communalists. *The Daily Herald* wrote that the Torries, now in overwhelming majority, would prove too powerful for those who intended to do their duty by India, and these elements, with the more pilant-elements in the R.T.C. would be able to wreck it. In fact they were planning to wreck it—said the *Daily Herald*."[১৯]

গান্ধীজী সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতাদের দ্বারা উত্থাপিত রক্ষাকবচের দাবি সমুহ প্রায় ষোল আনা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের বলেছিলেন সাদা চেকে সই করে দিচ্ছি (Blank cheque) শুধু তোমরা যৌথ নির্বাচন (joint electorate) স্বীকার করে নাও। কিন্তু অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদীদেব কুটিল রাজনীতির খেলা

চলতে লাগলো। যেসব নবাব নাইট ইংরেজের অনুগ্রহভোজী এবং রাজদত্ত উপাধির শিরস্ত্রাণশোভিত হয়ে মুসলিম স্বার্থের ধূম্র যবনিকার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদীদের সিংহাসন স্কন্ধে বহন করবার জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন নূতন রাজনৈতিক অবস্থা তাঁদের রসনাকে লালাসিক্ত করলো। দেখা যাচ্ছে ১লা অক্টোবর তারিখেই মাননীয় আগা খাঁ, মৌলানা শওকত আলি, স্যার মহম্মদ শফী প্রভৃতি সরকার মনোনীত মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে বিলাতের লর্ড সভার কতিপয় ভারতবিরোধী সদস্য ও কমন্সভার সদ্যনির্বাচিত কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল সদস্যের এক সভা হয় কমন্সসভার কমিটিরুমে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কট্টর ভারতবিরোধী লর্ড ব্রেন্টফোর্ড। এ ছাড়া লর্ড লয়েড্ ও লর্ড সিদেনহ্যাম ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। লর্ড ব্রেন্টফোর্ড তাঁর প্রাথমিক বক্তৃতায় বলেন যে 'ভারতবর্ষে গান্ধী যে মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তা যে সকল ভারতবাসীর মত নয়, তা ছাড়াও যে অন্য মতবাদ আছে তা এই সভার দ্বারা প্রমানিত হল' "Musalmans had long been loyal to the King Emperor. He urged that Britain was responsible for fair deal to all sections in India, and he hoped whatever the outcome of the conference, this reputation would be maintained." স্যার মহম্মদ শফী দাবি করেন "Musalmans ought not to be deprive! of the right of seperate elections until they voluntarily surrender it" মৌলানা শওকত আলি বলেন "If Musalman's faith was untouched, they would find Musalmans honest, and they would stand by Britain through thick and thin."[২০]

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের হাতে তৈয়ারী ছায়াবাজীর পুতুলগুলিকে আসরে নামিয়ে দিয়ে অন্তরাল থেকে সুতো টেনে তাদের পদক্ষেপ, শয়ন-উত্থান লম্ফঝম্ফ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো। নৃপেন মিত্র লিখেছেন ঃ

"The communal delegates would not comedown and meet Gandhi's formula even halfway. It was hinted by some London correspondents that they had been in secret cordial entente with the diehard section of British Torryism represented, for example, by Lord Loyed, Lord Brentford, Lord Gydenham & others. They were said to have been breack up whenever signs of weakness or yeilding indicated ****we find that the Moslem delegates persistently refused to have anything to do with federation or central responsibility unless their entire communal demands were first conceded."[২১]

গোলটেবিল বৈঠকে তথাকথিত 'সংখ্যালঘু' সম্প্রদায় সমূহের দাবি-দাওয়ার মীমাংসার ভার অর্পিত হয় 'মাইনরিটিজ্ কমিটি' নামে একটি কমিটির হাতে। ৮ই অক্টোবর ঐ কমিটির অধিবেশন বসে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁদের সামগ্রিক দাবি থেকে কণামাত্রও ছাড়বেন না এই দৃঢ় মনোভাব নিয়েই কমিটিতে যোগ দেন। সুতরাং আপোষ মীমাংসার কোন দ্বার খোলা ছিল না। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ ত চাইই, উপরন্তু ওয়েটেজ্ও (weightage) চাই (অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে যে প্রদেশে

মুসলমানগণের যত আসন প্রাপ্য হয় তার চেয়ে অধিক সংখ্যায় তাঁদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে)। যে প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সেখানেও ওয়েটেজ্ চাই। আবার বাংলা পাঞ্জাব প্রভৃতি যে সব প্রদেশে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও 'ওয়েটেজ্' চাই। গান্ধীজী এই সব অযৌক্তিক দাবিও মেনে নিতে সম্মত ছিলেন, তাঁর শর্ত শুধু এইটুকু ছিল যে যৌথ নির্বাচন প্রথা মুসলমানেরা মেনে নেবেন। কিন্তু মুসলিম নেতৃবৃন্দ 'পৃথক নির্বাচনের' সুযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ করবেন না। গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল এই যে কোন্ সম্প্রদায়ের থেকে কত জন নির্বাচিত হলেন এটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। সভ্যদের প্রত্যেককেই যদি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভোটে নির্বাচিত হতে হয় অর্থাৎ নির্বাচিত সদস্য যদি উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হন, তাহলে তিনি হিন্দু কি মুসলমান এ প্রশ্ন অবান্তর। 'মাইনরিটিজ কমিটি' শুধুই উত্তপ্ত তর্কবিতর্কে পর্যবসিত হয়, অতএব সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন মীমাংসা হল না। আলোচনা যে ব্যর্থ হবে তা আগে থেকেই জানা ছিল। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সাংবাদিক মিঃ এডোয়ার্ড টমসনের নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"During the Round Table Conference, there was rather an obvious understanding and alliance between the more intransigent Moslems and certain particularly undemocratic British political circles. That alliance is constantly asserted in India to be the real block to progress. I believe, I could prove that this is largely true. And there is no question that in former times we frankly practised 'Divide and Rule' method in India. From Warren Hasting's time onwards men made no bones of the pleasure Hindu-Muslim conflict gave them; even such man as Elphinstone, and Malcom and Metcalfe admitted its value to the British."[২২]

যতক্ষণ ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাগিয়ে রাখা যাবে, ততক্ষণ সাম্রাজ্যবাদীরা নিরাপদ। ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতৃবর্গ জানতেন যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের প্রভাব নেই। ইংরেজদের কাছে রাজদন্ড উপাধির শিরস্ত্রাণের জৌলুষ যত উজ্জ্বল হোক্ না কেন, ঐ শিরস্ত্রাণ দেখে জনসাধারণ তাঁদের ভোট দেবে না। একমাত্র পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করে তাঁরা হয়ত দু-চার দশটি আসন ভোটে জিতে নিতে পারবেন। সুতরাং এঁদের মুখের সামনে পৃথক নির্বাচনের লোভনীয় মোয়া ঝুলিয়ে রেখে সাম্প্রদায়িক আপোষ মীমাংসার পথ রুদ্ধ করা যায়। অন্তরালবর্তী অশুভ শক্তি এই কাজটুকুই করেছিলেন। মুসলিম নেতৃবর্গকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে 'তোমরা যদি পৃথক নির্বাচনের দাবিতে অটল থাকো, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কখনও যৌথ নির্বাচন প্রথা চালু করবেন না'। এই প্রতিশ্রুতির প্ররোচনাকে পাখার বাতাস দিয়ে মালসার আগুন জ্বালিয়ে রাখার মত নিরন্তর জ্বেলে রাখা হয়েছিল। মাইনরিটিজ্ কমিটির বৈঠক নিষ্ফল হলে গান্ধীজী তাই দুঃখ করে বলেছিলেন ঃ

"Dangle special privilages before the eye of any community, and the chances are ninetynine to one that it will jump at it and swallow the bait.

And once it has tasted the furits (poisoned though they are) of special representations and reservations, the chances are again ninetynine to one that it will refuse the part with them, and oppose any attempt, however wise and well-intentional to induce it to do so."[২৩]

দ্বিতীয়, গোলটেবিল বৈঠককে সামনে রেখে বিলাতের কট্টর সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকগণ যে ষড়যন্ত্রের জাল প্রস্তুত করেছিলেন, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় অংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করে হিন্দু সম্প্রদায়কে বিভক্ত করবার ও তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব চিরতরে খর্ব করে দেওয়ার অপপ্রয়াস। এ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীরা ডঃ আম্বেদকরকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি মাইনরিটিজ্ কমিটির সামনে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করে দাবি করেন যে 'শুধু মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকলেই চলবে না। মুসলমান, শিখ, পার্শী, খৃস্টান ও হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত অনুন্নতশ্রেণী' এদের সকলের জন্যই আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা চালু করতে হবে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে 'অনুন্নত সম্প্রদায়' (depressed classes) বাদে আর যাদের কথা ডঃ আম্বেদকর বলেছেন তারা সবাই পৃথক পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায়। কিন্তু depressed classes হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ। অতএব প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে (majority community) বিভক্ত করে তাদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা। এই কার্য করতে পারলেই ভারতের দুর্বার স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন তার তীব্রতা হারাবে। তার ফলে ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারী নিরাপদ হবে। মুসলমান, শিখ, খৃস্টান প্রভৃতি চিরদিনই 'মুসলমান' 'শিখ' ও 'খৃস্টান' থাকবেন। গান্ধীজী প্রশ্ন তোলেন যে depressed classes কি চিরদিনই depressed থাকবে? তিনি বলেন তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য তিনি জীবন পণ করেছেন। তিনি হিন্দুসমাজভুক্ত অনুন্নত জাতি সমূহকে একটা পৃথক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করবার অপচেষ্টাকে প্রাণ দিয়েই প্রতিরোধ করবেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে হীনবল করবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সম্প্রদায়কে বিভক্ত করবার অপপ্রয়াস

ডঃ আম্বেদকর নিঃসন্দেহে একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করেন নি, বরাবর ইংরেজদেরই অনুরক্ত থেকেছেন। তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্যও তিনি যে কোন উল্লেখযোগ্য কার্য করেছেন এমন কোন তথ্য কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে তিনি মাঝে মাঝে বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করেছেন। বর্ণগত (castebased) বৈষম্যসমূহের দূরীকরণের জন্য অনেক বর্ণহিন্দু নেতা তাঁর চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছেন। ডঃ আম্বেদকর যে caste ভুক্ত ছিলেন, তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। কোন্ গুণে তিনি যাবতীয় 'অনুন্নত', জাতিভুক্ত হিন্দুর প্রতিনিধি বলে গণ্য হলেন? গান্ধীজী ডঃ আম্বেদকরকে সামনে রেখে হিন্দু সম্প্রদায়কে শতধাবিভক্ত করবার প্রয়াসকে 'vivisection of the nations'-এর অপচেষ্টা বলে আখ্যাত করেন তথাপি মাইনরিটিজ কমিটিতে

ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতাদের ও সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের যৌথ ভোটে ডঃ আম্বেদকরের প্রভাব গৃহীত হয়, অবশ্য গান্ধীজীর প্রতিবাদের কথাও লিপিবদ্ধ হয়। পার্শী সম্প্রদায় জানান তাঁরা পৃথক নির্বাচন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন।

২০শে অক্টোবর বোম্বাইয়ের 'লোয়ার প্যারেলে' অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের এক জনসভায় ঐ সম্প্রদায়ের কয়েক সহস্র লোক সমবেত হয়ে ঘোষণা করেন যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কোন কথা বলবার অধিকার ডঃ আম্বেদকরের নাই। তাঁরা গান্ধীজীর প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করেন এবং ডঃ আম্বেদকর কর্তৃক উত্থাপিত 'পৃথক নির্বাচন' ফর্মুলার প্রতিবাদ করেন।

২৮শে নভেম্বর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের মূল সভার প্রথম অধিবেশন বসে। ঐদিন বিশেষ কোন কাজ হয় না। এর পর ১লা ডিসেম্বর দ্বিতীয় অধিবেশনের পরেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করেন যে অতঃপর যথাসময়ে তৃতীয় রাউন্ড টেব্‌ল্ কনফারেন্স ডাকা হবে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আরও ঘোষণা করেন : "His Majesty's government intent to decide the communal question if a voluntary agreement is not arrived at by the communities by an early date."

প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধুয়া তুলে খানিকটা জল ঘোলা করা ছাড়া দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আর কোন কাজ হয় নাই। গান্ধীজী ১০ই নভেম্বর তারিখে বিলাতের League of Fellowship and Reconcilliation -এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন :

"Why does the Round Table Conference seem to be failing? The answer is, because it does not contain real representatives of the nation, but merely supposed representatives I, who am represetning over ninety per cent of the Indian population, am pitted against 149, or whatever the number of the other delegates. So, how can I prove that I overshadow the other 149? Immidiately I make good that claim, you will see that my task before the conference and the British Ministers will be easier. Unless I prove that the Congress represents the bulk of the poeple, I must go back and re-start civil disobedience."[২৪]

১লা ডিসেম্বর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণার পর গান্ধীজী যখন ভাঙা মন নিয়ে ভাঙা হাট ছেড়ে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন লর্ড স্যাঙ্কি, লর্ড লন্ডনডেরী প্রভৃতি ধুরন্ধর ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা গান্ধীজীর প্রতি অজস্র প্রশংসাবাক্য বর্ষণ করে আশা প্রকাশ করলেন যে দেশে ফিরে গান্ধীজী তাঁর দেশকে পুনরায় একটা উন্মত্ততা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দেবেন না। জবাবে গান্ধীজী বললেন, "আমার স্বদেশকে পুনরায় অগ্নিপরীক্ষায় আহ্বান জানানোর আগে আমাকে বার বার ভাবতে হবে। কিন্তু আপাতত আমি কোন আলোকরশ্মি দেখতে পাচ্ছি না। (I shall have to think thrice

before issuing call to my countrymen to jump into another fiery ordeal. But just now I am not seeing any light.)

২৮শে ডিসেম্বর শূন্যহস্ত গান্ধী ব্যর্থতার বোঝা বহন করে বিলাত থেকে ফিরে স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন।

সূত্র নির্দেশ

১। Dr. Pattavi Sitaramaiya, *History of Indian National Congress*, Vol. I, p. 320-21

২। *Op. cit.*, p. 321.

৩। *Op. cit*

৪। *Op. cit.*, p. 383.

৫। *Op cit.*, p. 384.

৬। *Op. cit.*

৭। N. Mitra (ed), *Indian Annual Register, 1931,* Vol. II. p. 22.

৮। Dr. Pattavi Sitaramaiya *History of Indian National Congress*, Vol I, p. 396.

৯। *Op. cit.*, p. 399.

১০। Mr. Brailsford's letter published in the *Manchestar Guardian*, London. quoted from Dr. Sitaramaiya's *History of Indian National Congress*, Vol. I, p 407-408.

১১। Presidential Speech of Jawharlal Nehru, *Congress Presidents'* Speeches, published by B.P.C C., p. 234-235.

১২। Dr. Pattavi Sitaramaiya. *History of Indian National Congress*, Vol. I, p. 396.

১৩। *Op. cit.*, p. 401.

১৪। *Op. cit.*

১৫। *Op. cit.*, p. 426.

১৬। N. Mitra (ed), *Indian Annual Register. 1930,* Vol. I.

১৭। *Op. cit.*, p. 134.

১৮। *Op. cit., 1931*, Vol. II, p. 16.

১৯। 'Indian Home Polity' (1931) article by N. Mitra in *Indian Annual Register. 1931*, Vol. II, p. 62-63.

২০। N. Mitra (ed.), *Indian Annual Register, 1931*, Vol. II, p. 19.

২১। *Op. cit.*, p. 61.

২২। Dr. Rajendra Prasad, *India Divided*, p. 135.

২৩। N. Mitra 'Indian Home Polity', article in *Indian Annual Register, 1931*, Vol. II, p. 50.

২৪। N. Mitra (ed.), *Indian Annual Register, 1931*, Vol. II, p. 24.

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। গান্ধীজী শূন্যহস্তে ভগ্নহৃদয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ করণের পশ্চাতে বিলাতের একদল কট্টর সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিক এবং ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগ্রহজীবী একদল কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী, কায়েমীস্বার্থসেবী ভারতীয় রাজনীতিকের যৌথ ষড়যন্ত্র সক্রিয় ছিল। তা পূর্বপরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। ১৯৩১-এর অক্টোবরে বিলাতের সাধারণ নির্বাচনে ব্রিটিশ প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর করায়ত্ত হওয়ার ফলে ভারত ব্রিটিশ সম্পর্কের (Indo-British relations-এর) মোড় ঘুরে যায় এবং নতুন উদ্যমে ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। ভারতবর্ষ নামক যে সর্বৈশ্বর্যপ্রসবী কামধেনুকে দোহন করে বিলাতের ধনিকবণিকশ্রেণী ধন-মান-সৌভাগ্যের উচ্চ-চূড় সৌধে নিশ্চিন্ত বিলাসে কালযাপন করছিলেন, সেই কামধেনুর উপরে নিয়ন্ত্রণ শিথিলের প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলনের আঘাত তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে বিপন্ন করেছিল ঠিকই। শ্রমিকদল নিয়ন্ত্রিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হয়ত বুঝেছিলেন যে ভারতে ইংরেজদের বাণিজিাক স্বার্থকে যথাসম্ভব বিপদমুক্ত করতে হলে ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান জন-অসন্তোষকে প্রশমিত করা প্রযোজন, এবং সেই কার্য সাধন করতে হলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনরজ্জুর বন্ধনগুলি কিয়ৎ পারমাণে শিথিল করে দিতে হবে অর্থাৎ ভারতবাসীদের হাতে খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার অর্পণ করতে হবে। কট্টর সাম্রাজ্যবাদীরা এই 'সাম' নীতির অর্থাৎ policy of appeasement-কে পছন্দ করেন নি। এত কাল ত 'ভেদনীতি' অর্থাৎ 'divide and rule' policy-র দ্বারাই ভারতীয় 'এজিটেটর'-গণকে দাবিয়ে রাখা গেছে, এখন পারা যাবে না কেন? অক্টোবরের নির্বাচনে রক্ষণশীল গোষ্ঠী পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মতি-পরিবর্তন ঘটলো। দলত্যাগী প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড তখন রক্ষণশীলদের ঘরে বন্দী। কট্টর সাম্রাজ্যবাদী স্যার স্যামুয়েল হোর হলেন ভারত-সচিব। পরিবর্তিত অবস্থায় শাসনক্ষমতা যাঁদের হাতে এলো তাঁরা মনে করতে লাগলেন বিদায়ী ভারতসচিব ওয়েজউড বেন্ ও শ্রমিক গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত বড়লাট লর্ড আরউইন যথোপযুক্ত কঠোরতার সাথে 'দণ্ডনীতি' (repressive policy) প্রয়োগ করতে পারেননি, দ্বিধাগ্রস্ত কম্পিত ও দুর্বল হস্তে 'দণ্ড নীতি' প্রয়োগ করেছেন। সেই

জন্যই আইন-অমান্য আন্দোলন অতটা প্রবল হতে পেরেছে। অতএব দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থকরণের জন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে গোপন আঁতাত সাধন করে, মনু কথিত 'দান' নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে উৎকোচের মোয়া ঐ সব অশুভ শক্তির সামনে ঝুলিয়ে রেখে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা হল, এবং তাদের সহায়তায় সর্বপ্রকার আপোষমীমাংসার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে বৈঠক ব্যর্থ করা হল। ষড়যন্ত্রের কারিগর রূপে যে সকল ব্রিটিশ রাজনীতিক কাজ করেছিলেন, তাঁদের প্রশংসা করা উচিত। তাঁরা মনু কথিত 'সাম', 'দান', 'ভেদ' ও 'দন্ড' এই চতুর্মুখী রাষ্ট্রনীতির মর্ম ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে এবং কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

পূর্বোক্তরূপ ষড়যন্ত্র যে সত্য সত্যই হয়েছিল, ওটা শুধু যে অনুমানের ব্যাপার নয়, মিঃ এডওয়ার্ড বেন্থল্ কর্তৃক ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের বরাবরে প্রেরিত একখানা বিজ্ঞপ্তিপত্র (circular letter) থেকে তার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ী বেন্থল্ সাহেবকে ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও লগ্নীকারকদের স্বার্থরক্ষার্থে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়েছিল। তিনি কয়েকজন ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয় বণিকসঙ্গীসহ বিলাতে এসে কি প্রকাব কৃতিত্বপূর্ণ কার্যসাধন করেছেন তার পরিচয় তাঁর স্বজাতিবর্গের কাছে বিজ্ঞাপিত করবার উদ্দেশ্যেই ঐ 'সার্কুলার লেটার' প্রচার করেছিলেন।

মিঃ বেন্থলের 'সার্কুলার লেটার' ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত একখানি প্রামাণিক দলিল

বেন্থল্ সাহেব প্রথমেই লিখেছেন ঃ "আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে কিছু অনুকূল ফল লাভের সঙ্কল্প নিয়ে আমরা লন্ডনে আসি একথা সত্য, কিন্তু আমাদের মনে এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে—ভারতবর্ষে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয় বণিকদের যে সব সঙ্ঘ (অর্থাৎ চেম্বার অফ ট্রেড্ অ্যান্ড কমার্স) আছে তাদের, এবং সাধারণভাবে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের দ্বারা অনুমোদিত রক্ষাকবচের (safe-guards -এর) দাবিসমূহ থেকে আমরা তিলমাত্রও পরিত্যাগ করতে সম্মত হব না।" পত্রের প্রাপকদেরকে লক্ষ্য করে বেন্থল্ সাহেব লিখছেন ঃ

"If you look to the results of the last session, you will see that Gandhi and the Indian Chambers of Commerce are unable to point to a single concession wrung from the British Government or their visit to St. James Palace. He (Gandhi) landed in India with empty hand."[১]

তারপর বেন্থল্ সাহেব কি উপায়ে এই দুঃসাধ্য কর্ম সাধন করলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"He (Gandhi) undertook to settle the communal problem and failed before all the world. The Muslims were a solid and enthusiastic team. Ali Imam, the nationalist Muslim caused no division. They played their cards with great skill throughout. They promised us support and they gave it in full measure. In return they asked us that we should not forget their

economic plight.......and do what we can to find places for them in European firms."[২]

মুসলিম নেতৃবৃন্দ শ্বেতাঙ্গ বণিকগণকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলেন, পরিবর্তে শুধু চাইলেন যে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহে তাঁদের পুত্রপৌত্র 'ভাই-বেরাদর'দের যেন কিছু কিছু চাকুরী দেওয়া হয়। আজকার দিনের যে কোন মুসলমান সে দিনের 'ব্রিটিশ মনোনীত মুসলিম প্রতিনিধিদের' এই অত্যদ্ভুত আচরণের কথা স্মরণ করতেও লজ্জায় মাথা নত করবেন। সম্প্রদায়ের নেতা সেজে এঁরা গোলটেবিল বৈঠকে গিয়েছেন, দেশের স্বাধীনতা দাবি করবার জন্য নয়, ইংরেজবণিকদের পক্ষভুক্ত হয়ে স্বাধীনতার দাবির বিরোধিতা করবার জন্য, শুধু শ্বেতাঙ্গ সওদাগরী অফিস সমূহে দু-চারজন মুসলিম প্রার্থীর চাকুরীর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। ইংরেজশাসন ভারতবর্ষে অনন্তকাল অনড় হয়ে থাকুক—ইংরেজদের হাতে তাচ্ছিল্য সহকারে ছুঁড়ে দেওয়া দু চারটা মাছ ও রুটির টুক্‌রো পেলেই মুসলিম সম্প্রদায় খুশী থাকবে। যারা এইভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজকে অবমাননা করেছে, ভারতবাসীর আত্মমর্যাদাকে কলঙ্কিত করেছে, তাদেরকে মুসলিম সমাজের নেতা সাজিয়ে ইংরেজরা গোলটেবিল বৈঠকে নিয়ে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যাসমূহের যুক্তিসম্মত সমাধানের সর্বপ্রকার চেষ্টাকে ভেস্তে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

বেন্‌থল্‌ সাহেব অতঃপর জানিয়েছেন যে অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দক্ষিণপন্থী সদস্যগণের লক্ষ্যই হল যে কোন উপায়ে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ করা। আমরা বুঝেছিলাম এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে কংগ্রেসের সাথে লড়াই হবেই। আর সেই লড়াইয়ে সুনিশ্চিত জয় অর্জন করতে হলে কতকগুলি গোষ্ঠীকে আমাদের দলে টানতে হবে।

"On the whole there was one policy of the British Government and the British Community in India, and that was to make up our mind on a national policy and stick to it. But after the general election, the right wing of the British Governement made up its mind to break up the conferrence and to fight the conference and to fight the congress. The Muslims who do not want responsibility at the centre were delighted. Government undoubtedly changed this policy and wanted to get away with Provincial Autonomy with a promise of central reforms. We had made up our minds that the fight with the congress was inevitable, but we made up our minds that for a crushing success we should have all possible friends on our side. The Muslims were alright; so were the Princes and the minorities."[৩]

সুতরাং ষড়যন্ত্র কোন উদ্দেশ্যে কার স্বার্থে হল, সে ষড়যন্ত্রে অংশীদার কোন কোন গোষ্ঠী, কোন গোষ্ঠীর কি ভূমিকা সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। গভর্নমেন্টের মধ্যেই কট্টর ভারতবিরোধী গোষ্ঠী এই ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা। ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয় বণিক ও

লগ্নীকারকেরা সে ষড়যন্ত্রের কারিগর। আর তারা দলে ভিড়িয়েছে অপদার্থ দেশীয় রাজন্যবর্গকে, ব্রিটিশ মনোনীত ও ব্রিটিশের দ্বারা অনুগৃহীত একদল 'সাজানো' মুসলিম নেতাকে, সংখ্যালঘু অনুন্নত শ্রেণীর স্বয়ং নিযুক্ত নেতা ডঃ আম্বেদকারকে, এবং সম্ভবত কিছু সংখ্যক খয়ের খাঁ মডারেট হিন্দুনেতাকেও। সকলেরই এক লক্ষ্য গোলটেবিল বৈঠককে ব্যর্থ করতে হবে, আর ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাসের উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এই ষড়যন্ত্র যে কী অপূর্ব সাফল্য অর্জন করলো, বেন্থল্ সাহেব উল্লসিত হয়ে সে কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

"So we joined strange companies. Government saw the argument and the conferrence, in stead of breaking up in disorder with 100 per cent of the Hindu political India against us, ended in promises of cooperation by 99 percent of the conference, including even such people as Malaviya, while Gandhi himself was indisposed to join the standing committee. The Muslims have become firm allies of the Europeans. They are satisfied with their own position, and are prepared to work with us."[৪]

বেন্থল্ সাহেব সবই ঠিক লিখেছেন, কেবল একটা ভুল করেছেন। তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি যে গান্ধীজীকে বাদ দিলে বৈঠকের ১ শতাংশ বাদ দিয়ে ৯৯ শতাংশ অবশিষ্ট থাকে না। গান্ধীজী নিজের উক্তি অনুসারে, 'আমাকে বাদ দিলে বৈঠকের শতকরা নব্বই ভাগ বাদ যায়। কারণ আমি ভারতের শতকরা নব্বই জনের প্রতিনিধি বাকী ১৪৯ জন মনোনীত সদস্য ভারতবাসীদের শতকরা দশ ভাগেরও প্রতিনিধিত্ব করে না'। গান্ধীজী লন্ডনে বসে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা আয়োজিত সভায় এই কথা ঘোষণা করে এসেছেন।

গান্ধীজী শূন্য হস্তে ভারতে ফিরে এসে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবেন না, একথা ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্গণ অবশ্যই জানতেন। সুতরাং তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে ভারতে পুনরায় একটা দুর্বার ও ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হবে। তাই তাঁরাও সেই সম্ভাব্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গড়ে তোলার কাজে কালবিলম্ব করলেন না। এবার আর 'কম্পিত দুর্বল হস্তে' দন্ডপ্রয়োগ নয়। এবারে কংগ্রেসের আন্দোলনকে দমন করবার জন্য ক্ষিপ্ত-ব্যাঘ্রের হিংস্রতা এবং তৈমুর ও নাদির সাহের নিষ্ঠুরতা আয়ত্ব করতে হবে। আর চিরদিনের মত কংগ্রেসকে খোঁড়া করে দিতে হবে, ভারতীয় মহাজাতিকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করে। এই সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা স্থির করে নিয়ে শক্ত মানুষ লর্ড উইলিংডনকে বড়লাট নিযুক্ত করে পাঠানো হল।

গান্ধীজী দেশে পৌঁছানোর পূর্ব থেকেই সরকারপক্ষ রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়ে ব্যূহরচনা শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা এমন ভাবে কাজ শুরু করে দেন যে গান্ধীজী যেন দেশে

উইলিংডনীয় রণনীতি

পৌঁছেই বুঝতে পারেন যে সরকারপক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। শত্রুপক্ষকে ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে যুদ্ধোদ্যম থেকে তাকে নিরস্ত করবার উদ্দেশ্যে আগে ভাগে নিজেরাই যুদ্ধের দামামা বাজানো, একপ্রকার চতুর রণনীতি বা সামরিক কৌশল বটে। উইলিংডন হয়ত মনে করেছিলেন, এই কৌশল কার্যকরী হবে। আগে ভাগে

শক্তিপ্রদর্শন করে যদি গান্ধীজীকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে সরকারপক্ষ সম্ভাব্য আন্দোলন নির্দয়হস্তে দমন করবার সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গড়ে তুলেছে, তা হলে গান্ধীজী হয়ত পুনরায় গণআন্দোলন শুরু করতে সহসা সাহসী হবে না। সম্ভবত উইলিংডনীয় রণনীতি এই পথে অগ্রসর হচ্ছিল।

গান্ধীজী দেশে পৌঁছানোর পূর্বেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। গান্ধী-আরউইন চুক্তির সর্ত অনুসারে বারদৌলির করবন্ধ আন্দোলনকালে পুলিশী নৃশংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্ত হওয়ার কথা ছিল, সেই তদন্তে এমন ইচ্ছাকৃত গোলমাল সৃষ্টি করা হল যে কংগ্রেস সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল এবং কংগ্রেসপক্ষীয় ব্যবহারজীবী ভারতবিখ্যাত আইনবিদ্ ভুলাভাই দেশাই তদন্ত থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। লবণ প্রস্তুতের উপরে নতুন করে অতিরিক্ত কর (additional duty) বসানো হল। এই দুটি কাজই ছিল গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তবিরোধী। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উপজাতীয়দের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করবার অজুহাতে নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করে বাদশা খানের অনুগামী শান্তিপূর্ণ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে নতুন করে অত্যাচার শুরু করা হল। ১৪ই ডিসেম্বর (অর্থাৎ গান্ধীজী ভারতে পৌঁছানোর দুই সপ্তাহ পূর্বে) U. P. Emergency Powers Ordinance নামে এক নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করা হল। আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশে (অর্থাৎ বর্তমানের উত্তরপ্রদেশে) করবন্ধ আন্দোলনের কর্মিদের উপরে ঐ নূতন অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে অত্যাচারের লগুরাঘাত চলতে লাগলো, কংগ্রেস পক্ষ থেকে প্রতিবাদে কোন ফল হল না। গান্ধীজী দেশে পৌঁছানোর পাঁচদিন পূর্বে সংযুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি খ্যাতনামা কংগ্রেসনেতা তাসউদ্দিক আহম্মদ শেরোয়ানী এবং নিখিল ভাবত কংগ্রেসের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারী জওহরলাল নেহরুকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হল। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান্ আব্দুল গফুর খান্ তাঁর ভ্রাতা খ্যাতনামা ডাঃ খানসাহেব ও গফুর খানের পুত্র ওয়ালি খান্‌কে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার করে বিনাবিচারে আটক করা হল। সুভাষচন্দ্র বসু বোম্বাই আসছিলেন, পথিমধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হল। বঙ্গদেশেও 'সন্ত্রাসবাদ' দমনের অজুহাতে নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করে নাগরিকবর্গের সর্বপ্রকার ব্যক্তি স্বাধীনতা অপহরণ করা হল।

সুতরাং ভারতেব মাটিতে পা দিতেই গান্ধীজী অবগত হলেন যে উইলিংডন 'যুদ্ধং দেহি' বলে হুঙ্কার ছাড়ছেন এবং শরক্ষেপন শুরু করে দিয়েছেন।

পুনরায় ব্যাপক গণ-আইন-অমান্য আন্দোলন যে আসন্ন, এ বিষয়ে কংগ্রেসের নেতা ও কর্মিদের মনে কোন দ্বিধা সংশয় ছিল না। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের স্বাধীনতা দাবি নিয়ে আলোচনা হবে, এই প্রতিশ্রুতির উপরেই ১৯৩১-এর মার্চ মাসে আইন-অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। বৈঠকের ব্যর্থতার পরে পুনরায় আন্দোলন শুরু করাই ছিল স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। কর্মিরা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

গান্ধীজী দেশে পৌছানোর পরদিনই অর্থাৎ ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩১, লর্ড আরউইনের কাছে একখানি টেলিগ্রাম পাঠান। ৩১শে ডিসেম্বর বড়লাটের পক্ষ থেকে তাঁর প্রাইভেট

সেক্রেটারী টেলিগ্রামের জবাব দেন এবং তিনি বলেন যে গান্ধীজীর টেলিগ্রামে উল্লিখিত অভিযোগ সমূহ অমূলক এবং সরকার যা কিছু করেছে তা একান্ত প্রয়োজনবোধেই করা হয়েছে। ১লা জানুয়ারী ১৯৩২ গান্ধীজীর বক্তব্য শ্রবণ করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করবার জন্য জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে ও তৎসম্পর্কিত কিছু কিছু নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী বড়লাটকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঐ প্রস্তাবের মর্ম জানিয়ে দেন এবং ঐ টেলিগ্রামে বলা হয় যে বড়লাটের মনোভঙ্গী পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত না পাওয়া গেলে অবিলম্বে ভারতব্যাপী গন-আইন-অমান্য (mass civil disobedience) শুরু হবে। যথারীতি তার প্রত্যুত্তর পাঠালেন বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী ২রা ডিসেম্বর তারিখে। জবাবের উপসংহারে বড়লাটের সেক্রেটারী বললেন ঃ

"His Excellency and his Government can hardly believe that you or the working comittee contemplate that His Excellency can invite you, with the hope of any advantage, to an interviewer held under threat of resumption of civil disobedience. They must hold you and the congress responsible for all the cosequences that may ensure from the action which the congress have announced their intention of taking and to meet which, the government will take all necessary measurers."[৫]

সুতরাং ভারতের মুক্তিকামী জনতা লর্ড উইলিংডনের উদ্ধত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, 'মৃত্যুপণ, জীবনপণ/ হয় বিজয় নয় মরণ' সঙ্কল্প নিয়ে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হন। শুরু হল ১৯৩২ সালের দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েই ছিল। ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র নগরে, গ্রামে, গঞ্জে অগণিত স্বাধীনতা-কর্মী অধীর আগ্রহে সেনাপতির আদেশের অপেক্ষা করছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে আসমুদ্র হিমাচল চঞ্চল হয়ে উঠলো। যেন অকস্মাৎ এক মহাঝটিকার উন্মত্ততায় টালমাটাল হয়ে উঠলো সুবিশাল উপমহাদেশ।

দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন ১৯৩২-১৯৩৪

দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলনের ঘটনাবলীর বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ১৯৩০-এর ধারা অনুসরণ করে দৃপ্তবেগে এগিয়ে চললো আন্দোলন। ডাঃ সীতারামাইয়া খুব অল্প কথায় এই আন্দোলনের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"The events of 1932-33 ran on much the same lines as those of 1930-31. Only, the fight was more intensive and more determined. The repression was even so much more ruthless and the suffering was ever so more deep."[৬]

৪ঠা জানুয়ারী তারিখেই গান্ধীজী এবং তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ঐ দিন থেকে সারা ভারতে ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই জেলগুলি ভর্তি হয়ে যায়। টিনের বা খড়ের চালাযুক্ত বড় বড় অস্থায়ী ঘর তুলে 'স্পেশাল জেল', 'ক্যাম্প জেল' ইত্যাদি নাম দিয়ে নূতন নূতন অস্থায়ী জেলখানা

হয়। সেগুলিও অবিলম্বে ভর্তি হয়ে যায়। ডাঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন :

"Arrests were made in large numbers, but they were made with discrimination, the total number of convictions being anything not less than a lakh. It became soon apparent that in spite of camp jails and temporary jails being opened, the numbers that offerred themselves for arrest, could not be accommodated. It was therefore necessary to make a selection and only those who were supposed to possess organising capacity, were arested."[৭]

১০ই আগস্ট, ১৯৩২ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য কিশোরী মোহন চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে হোম মেম্বার রীড সাহেব জানান যে ঐ সালের জানুয়ারী থেকে শুরু করে মে মাস, এই পাঁচ মাসে আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গদেশে মোট দশ হাজার তিনশত ব্যক্তি ধৃত হয়েছে। তার মধ্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে ৮৯৭২ জন পুরুষ ও ৫২১ জন মহিলা। ১৯৫৫ জন কারাদণ্ড ও জরিমানা এই উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

উইলিংডনীয় রণনীতির এক বিশেষ অঙ্গ ছিল সভ্যজগতে নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকারগুলিকে অলঙ্ঘনীয় বলে স্বীকার করা হয়, 'অর্ডিন্যান্সের' সাহায্যে সেগুলি হরণ করা, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির হাতে মানুষের সম্পত্তি, শরীর ও জীবন যথেচ্ছভাবে হরণ করবার ক্ষমতা অর্পণ করা, এক কথায় 'আইনের শাসন' সম্পূর্ণ বিলোপ করে পুলিশী স্বৈরাচারের হস্তে সমস্ত দেশকে সমর্পণ করা। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখেই উইলিংডন চারটি নূতন 'অর্ডিন্যান্স' জারী করেন। এই চারটি অর্ডিন্যান্স হল : (১) Emergency Powers Ordinance, (২) Unlawful Instigation Ordinance (৩) Unlawful Association Ordinance ও (৪) Prevention of Molestation and Boycott Ordinance. ১নং অর্ডিন্যান্সে যে সকল ক্ষমতা পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির হাতে অর্পিত হল তার তালিকা এত দীর্ঘ যে তার আনুপূর্বিক উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে কোন ব্যক্তির গতিবিধি, জীবনযাত্রা, জীবিকা, আচার-আচরণ ইত্যাদি যে কোন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির উপরে অর্পিত হল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি চাকুরী করে তার উপরে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বা তার বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা অবস্থানের আদেশ দিয়ে তাকে জীবিকাচ্যুত করবার, যে ব্যক্তির আবাস থানা থেকে দশ মাইল দূরে তার উপরে প্রত্যহ থানায় হাজিরার আদেশ দিয়ে তাকে প্রত্যহ ২০ মাইল পথ হাঁটতে বাধ্য করবার, যে কোন বাড়ী বা ঘর পুলিশের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য করবার, কোন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির উপরে অমুক শিক্ষককে বরখাস্ত করণের আদেশ দেওয়ার এবং যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত যানবাহন সরকারি কাজের জন্য রিকুইজিসন করবার অধিকার অর্পিত হল পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির উপরে। বস্তুত সমগ্র জনমণ্ডলীকে পুলিশের ক্রীতদাসে পরিণত করবার ব্যবস্থা হল ঐ অর্ডিন্যান্সের দ্বারা। ২নং অর্ডিন্যান্সের দ্বারা ব্যবস্থা করা হল যে কোন প্রাপ্য বা 'liability' কে 'notified liability' বলে ঘোষণা করতে পারবেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং ঐ notified liability প্রদানের জন্য যার উপরে নোটীশ জারী হবে, সে

স্বেচ্ছায় ঐ টাকা প্রদান না করলে তার সম্পত্তি ক্রোক করে সে টাকা আদায় হবে এবং কোন ব্যক্তি যদি উক্তপ্রকার নোটীশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঐ liability প্রদান না করবার জন্য প্ররোচিত (instigate) করে, তবে ঐরূপ প্ররোচনাদানকারীর (instigator-এর) দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড হতে পারবে। ৩নং অর্ডিন্যান্সের দ্বারা সরকারের উপরে এরূপ ক্ষমতা অর্পিত হল যে—যে কোন সঙ্ঘ, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান শান্তিশৃঙ্খলার বিঘ্নকর কার্যো রত আছে এরূপ সন্দেহ হলেই সরকার সেই প্রতিষ্ঠানকে 'বেআইনী প্রতিষ্ঠান' (unlawful association) বলে ঘোষণা প্রচার করতে পারবেন, এবং ঐরূপ ঘোষণা প্রচারিত হলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় বাড়ী-ঘর, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, মায় তাদের ব্যাঙ্কে জমানো টাকা বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। উপরন্তু ঐরূপ আদেশ প্রচারিত হওয়ার পরে যদি কোন ব্যক্তি ঐরূপ unlawful association-এর পক্ষে কোন কার্য করে তবে তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ৪নং অর্ডিন্যান্সে যা বলা হল তার সারমর্ম হল এই যে আন্দোলনবিরোধী কার্যের জন্য কোন ব্যক্তিকে যদি 'molest' (হেনস্থা) বা বয়কট করা হয় বা ঐরূপ কার্যে যদি কেউ প্ররোচনা দান করে বা সাহায্য করে তবে তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। অর্ডিন্যান্সটি এমন ভাষায় রচিত হয়েছিল যে দারোগাকে বাড়ী, গাড়ী বা নৌকা ইত্যাদি ভাড়া দিতে অস্বীকার করলে, কিংবা মদ, গাঁজা, বিলাতি বস্ত্র ই্ত্যাদির বিক্রয়ে বাধা সৃষ্টি করলে (অর্থাৎ পিকেটিং করলে), এমন কি কোন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে আশ্রয় দিলে বা পিপাসার্ত কোন স্বেচ্ছাসেবককে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিলেও তাকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। তা ছাড়া এই অর্ডিন্যান্সে এইরূপ নিয়ম করা হয় যে, কোন অঞ্চলে সরকার বিরোধী কাজের প্রবলতা ঘটলে সেই অঞ্চলের বা গ্রামের সকল লোকের উপরে 'পিউনিটিভ ট্যাক্স' ধার্য করা যাবে এবং সকলের উপরে যৌথ জরিমানা (collective fine) আরোপ করা যাবে। এসব liability স্বেচ্ছায় না দিলে মালক্রোক করে আদায় করতে হবে। চারিটি অর্ডিন্যান্সের সার্বিক ফল হল এই যে সমগ্রদেশ থেকে 'আইনের শাসন' প্রায় সর্বাংশে প্রত্যাহৃত হল এবং স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীকে শায়েস্তা করবার জন্য সারাদেশে 'জঙ্গলের আইন' প্রবর্তিত হল।

এই অর্ডিন্যান্সগুলির অমানুষিক বিধিবিধান সম্পর্কে ভারতের সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রকাশ সম্ভবপর ছিল না। কারণ Press Emergency Ordinance নামে আর একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে সকল ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বৈদেশিক সংবাদ সংস্থাগুলির মাধ্যমে ভারতের Jungle Law প্রবর্তনের সংবাদ বিদেশে প্রচারিত হয়। ২৬শে মার্চ ১৯৩২-এ বিষয়ে বিলাতের কমন্স্‌সভায় আলোচনা ওঠে। ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরকে স্বীকার করতে হয় যে অর্ডিন্যান্সগুলি অতিশয়িতরূপে 'কঠোর' হয়েছে। "(He) admitted that the ordinances were very drastic and severe. They covered almost every activity of Indian life" একথা স্বীকার করে ও স্যার স্যামুয়েল কৈফিয়ৎ স্বরূপে বলেন যে : They were drawn up in that comprehensive form because the government, with full knowledge at their disposal, believed that they were threatened with an attack on the whole basis of the government."[৯]

সুতরাং এটা সুস্পষ্টরূপেই স্বীকৃত হল যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির বনিয়াদে আন্দোলন শুরু করাটাই ছিল ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর অপরাধজনক কার্য, আর, সেই অপরাধ দমনের জন্যই গোটা দেশকে Jungle Law-এর কবলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

৩নং অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করে সমস্ত কংগ্রেস কার্যালয়, কংগ্রেসকর্মিদের দ্বারা পরিচালিত অগণিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বিদ্যালয়, সেবা সমিতি একান্তভাবে আত্মনিবেদিত (totally dedicated) কংগ্রেস কর্মিদের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য আশ্রম; চরকা ও খদ্দরের উৎপাদন ও বিক্রয়কেন্দ্র সমূহ 'বে-আইনী প্রতিষ্ঠান' বলে ঘোষিত হল এবং সঙ্গে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ও টাকাপয়সা বাজেয়াপ্ত করা হল। বঙ্গদেশের বিখ্যাত 'অভয়-আশ্রম' ও তাদের সমস্ত শাখা বে-আইনী ঘোষিত হল ও তাঁদের সম্পত্তি পুলিশ দখল করে নিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কয়েকটি প্রদেশে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' (National University) স্থাপিত হয়েছিল। তার মধ্যে 'কাশী বিদ্যাপীঠ' ও 'বিহার বিদ্যাপীঠ' দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রথমে বিখ্যাত দার্শনিক ডঃ ভগবান দাস, পরে আচার্য নরেন্দ্র দেব। বিহার বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য জে. বি. কৃপালনী। দানশীল জাতীয়তাবাদী নেতা শিবপ্রসাদ গুপ্ত বহু অর্থব্যয়ে কাশী বিদ্যাপীঠের একটি সুন্দর লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় 'বে-আইনী প্রতিষ্ঠান' বলে ঘোষিত হয় এবং তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কাশী বিদ্যাপীঠের লাইব্রেরীর কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের পুস্তকও বাজেয়াপ্ত করা হয়। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে যিনি এম. পি. হয়েছিলেন) তাঁর দ্বারা পরিচালিত ঢাকা নবাবগঞ্জের জাতীয় বিদ্যালয়টিকেও ঐ রূপে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করে তার সমস্ত সম্পত্তি, মায় স্কুলগৃহ, শিক্ষকদের বাসগৃহ ও সমস্ত আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। সারা ভারতের হাজাব হাজার জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী সম্পত্তি ও টাকা পয়সা এইভাবে সরকারি আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়। ডঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ "The *Ashrams* and Congress offices which had been taken possession of, were demolished or even set fire to."[৯] মিটিং, মিছিল ও পিকেটিং ইত্যাদি সবই ছিল আইনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কার্য। আর এই নিষিদ্ধ কার্য দমনে পুলিশ চিরাচরিত প্রথায় লাঠি ও ব্যাটনের আঘাতে সহস্র সহস্র কর্মীর মাথা ফাটিয়েছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন করেছে। ১৯শে আগস্ট কুমার শান্তিশেখরেশ্বর রায়ের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রীড় সাহেব জানান আন্দোলনের প্রথম সাত মাসে পুলিশ বঙ্গদেশে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে গুলীবর্ষণ করেছে ১৭ বার। তার ফলে নিহত হয়েছে ১৩ জন এবং জখম হয়েছে ৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবক।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৫, এই কালটি ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের (Revolutionary Movement-এর) প্রচন্ড কর্মময় কাল। সুতরাং সরকার আইন-অমান্য আন্দোলন দমন করতে গিয়ে বিপ্লব দমনের আইনগুলিকেও কাজে লাগিয়েছেন। ১৯৩২-৩৩-এ বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম ও দ্বিতীয় সারির বিপ্লবী নেতা ও কর্মীবৃন্দ প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ, তথাপি বৈপ্লবিক অ্যাকশন বন্ধ হয় না। মেদিনীপুরে একই সাথে আইন-অমান্য ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ দমনের অজুহাতে সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনী নামিয়ে চূড়ান্ত পৈশাচিক অত্যাচার

করা হয়। গৃহস্থের গোলার ধান ও গরু বাছুর লুঠ করা হয়েছে, ধানের মরাই পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মেয়েপুরুষ যুবকবৃন্দ নির্বিশেষে নিরপরাধ মানুষকে নির্মম প্রহারে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে এবং গ্রামীণ রমণীগণকে মাঠে ঘাটে রাস্তায় প্রকাশ্যে ধর্ষণ করা হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী (কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা) মেদিনীপুরের ধর্ষিতা নারীদের কাছ থেকে বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু Press Emergency Act-এর দ্বারা সমস্ত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা ছিল, সুতরাং এই সকল পৈশাচিকতার কাহিনী ঐ সময়ে প্রায়শই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যায় নি।

চন্ডনীতির প্রচন্ডতাকে মুকাবেলা করবার জন্য স্বাধীনতা কর্মিগণও '৩২-এর আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে নানা নূতন রণকৌশল উদ্ভাবন করেন। সাংগঠনিক ব্যাপারে সাধারণ সাংগঠনিক নিয়মকানুন 'যুদ্ধকালের উপযুক্ত' করে পরিবর্তন করে নেওয়া হয়। সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর হাতেই ন্যস্ত থাকে। প্রদেশ, জেলা, মহকুমা ইত্যাদি প্রত্যেক স্তরে আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠন করা হয় ছোট আকারের 'সমর সংসদ' বা War Council; কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদবী দেওয়া হয় 'ডিক্টেটর'। তিনি গ্রেপ্তার হলে পরবর্তী ডিক্টেটর মনোনীত করে যেতেন। নূতন ডিক্টেটর আবার নূতন 'ওয়ার কাউন্সিল' গঠন করতেন। এইভাবে, যে দুই বৎসরকাল আন্দোলন অপ্রতিহত বেগে চলেছিল, সেই সময়ের মধ্যে কোথাও কোন স্তরে সাংগঠনিক ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়নি। আগের মত, জেল ভর্তি করার দিকে বেশী লক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। দায়িত্বশীল ও দক্ষ কর্মিদের সকলকে একসাথে জেলে পাঠানো হয়নি। বাছাই করে কিছু দক্ষ কর্মীকে পিছনে সরিয়ে রাখা হত। তাঁরা আত্মগোপনে আপন আপন এলাকার সংগঠনকে খানিকদূর এগিয়ে নেওয়ার পর, পরবর্তী চিহ্নিত ব্যক্তির হস্তে কার্যভার সমর্পণ করে গ্রেপ্তার বরণ করতেন। এইভাবে পর পর চলতো ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হত। তবে শুধু গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য কেউ আত্মগোপন করতে পারতেন না—সেটা নিষিদ্ধ ছিল। সরকার কর্তৃক কংগ্রেস ও তার সমস্ত সংগঠন 'বে-আইনী সংস্থা' বলে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের 'গোপন কার্যালয়' প্রায় সর্বস্তরে বজায় রইল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব গোপন কার্যালয়ের হদিস পায় নাই পুলিশ। আত্মগোপনকারী কর্মীদের হদিস সংগ্রহ করতেও পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে কারণ ঐ সময়ে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক ছিলেন কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং যে কোন গ্রামে, কোন-না-কোন সহানুভূতি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে আত্মগোপনকারী কংগ্রেস কর্মীর আশ্রয় জুটতো। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বৎসর সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে এবং জিলা ও মহকুমা স্তরে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন কোথায় হবে বা হচ্ছে পুলিশ তা আগে থেকে ঘুণাক্ষরে জানতে পারে নাই। অনেক সময়ে সম্মেলনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব মুহূর্তে 'অমুক জায়গায় এখনই সম্মেলন হবে' এই মর্মে ভুল নির্দেশ ছাপিয়ে কৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া হত যার ফলে পুলিশও ভুল জায়গায় গিয়ে লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতো—এদিকে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে ডেলিগেটগণ সমবেত হয়ে সম্মেলন শুরু হয়ে যেতো। আসল খবর পেয়ে পুলিশ যখন সেখানে এসে পৌঁছাতো

সরকারি চন্ডনীতির কঠোরতার মুকাবেলা করবার জন্য আন্দোলনের কর্মীগণও নূতন নূতন রণকৌশল উদ্ভাবন

ততক্ষণে সম্মেলন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ তখন মারপিঠ করে কিছু লোককে জখম করতো। কিন্তু পরদিন হয়ত দেখা যেত ব্যান্ডেজবাঁধা জখমী কর্মীদেরকে রিক্সায় বসিয়ে মিছিল বেরিয়েছে। অবশ্যই বে-আইনী মিছিল। কিন্তু এই জাতীয় মিছিল লোকের মনে এত উত্তেজনার সঞ্চার করত যে শত শত লোক এসে সেই মিছিলে যোগ দিত, এবং অবস্থা এমন দাঁড়াতো যে ঐ মিছিল ভাঙতে হলে পুলিশকে বহুলোকের উপর বলপ্রয়োগ করতে হবে, যার ফল হবে আরও খারাপ। সুতরাং পুলিশকে বাধ্য হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে হত। কণ্ঠরোধ ছিল, সুতরাং আন্দোলনের খবর প্রচারের জন্য সাইক্লোস্টাইল করা বা গোপন প্রেসে মুদ্রিত ইস্তাহার কংগ্রেস সংগঠনের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচারিত হত। অনেক সময়ে এই 'প্রচারবুলেটিন' সংগ্রহ করবার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। ডাকযোগে কংগ্রেসের বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি পাঠানো যেতো না। কারণ ঐ প্রকার দ্রব্য ডাকযোগে পাঠানো হচ্ছে জানতে পারলেই সেগুলি নষ্ট করে দেওয়ার নির্দেশ ছিল ডাক বিভাগের উপরে। এর ফলে বহু এলাকায় কংগ্রেস কর্মীরা বিকল্প 'স্বদেশী ডাক' ব্যবস্থা চালু করে।

১৯৩২ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৩৪-এর জুন পর্যন্ত কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত ছিল। সেই অবস্থাতেও সরকার পক্ষের প্রবল বাধা ও পাশবিক বলপ্রয়োগ অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৩২-এর এপ্রিলে দিল্লীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছিল দুর্ভেদ্য গোপনতার আড়ালে। পণ্ডিত মালব্য ঐ কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লী পৌঁছানোর পূর্বেই রাস্তায় ট্রেন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তথাপি গুজরাটের শেঠ বনছোড়দাস অমৃতলালের সভাপতিত্বে থমারী অধিবেশন বসে ও নিয়মমাফিক সকল কার্য সমাধা করা হয় পুলিশের লগুড়বর্ষণ অগ্রাহ্য করে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পাঁচশত ডেলিগেট সমবেত হয়েছিলেন।

১৯৩৩-এর কলকাতা কংগ্রেস অনেকের কাছেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৩২-এর ৩১শে মার্চ এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনেও পন্ডিত মালব্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু আসানসোল স্টেশনে ট্রেন থেকে গ্রেপ্তার করে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। তৎকালীন অস্থায়ী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাধব শ্রীহরি অ্যানেকেও কলকাতা অভিমুখী ট্রেন থেকে গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন ঐ বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেস অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিদেশিনী পত্নী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা। বিহারের ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ ও পাঞ্জাবের ডাঃ আলম সহ ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ২২০০ ডেলিগেট। উত্তরপ্রদেশ থেকে ৬৭৩ জন, বিহার থেকে ২৮৪ জন, জব্বলপুরের ৫০ জন, দিল্লী থেকে ১৭ জন, আসাম থেকে ২৯ জন, বোম্বাই প্রদেশ থেকে ৩১ ও বঙ্গদেশের ৩০০ জন ছাড়া আরও ডেলিগেট এসেছিলেন অন্যান্য প্রদেশ থেকে। পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্য একঘণ্টা আগে শহরে বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে এখনই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হচ্ছে। তখন লাঠিধারী ও বন্দুকধারী পুলিশ ঐ পার্ক ঘিরে রাখে। ইতোমধ্যে পূর্বনির্দিষ্ট স্থান এসপ্ল্যানেড্ ট্রাম ডিপোর কাছে অধিবেশন শুরু হয়ে

যায়। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা তাঁর অভিভাষণ পাঠ করতে থাকাকালে ছুটতে ছুটতে লাঠিধারী পুলিশ এসে ডেলিগেটদের মস্তকে শিলাবৃষ্টির মত লগুড় বৃষ্টি শুরু করে দেয়। শ্রীমতী সেনগুপ্তা ঐ অবস্থার মধ্যেও সামান্যমাত্রও বিচলিত না হয়ে তাঁর অভিভাষণ পাঠ শেষ করেন এবং পাঠ শেষ করে তিনি বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করা মাত্র পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যায়।

৩রা এপ্রিল তারিখে পণ্ডিত মালব্য মুক্তি পেয়ে কলকাতায় আসেন ও ঐ কংগ্রেস উপলক্ষে পুলিশের অমানুষিক আচরণের কথা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতিতে তিনি লেখেন ঃ

"Delegate after delegate, as he stood up to move a resolution, was violently attacked by sergeants wealding lathis with all their might......The lathis were supplemented by kicks and blows. On 30.3.33, 29 delegates from U.P. after having been taken into custody, were assaulted by European and Anglo-Indian police sergeants at the Lalbazar Thana. The assaults were brutal and evidently pre-meditated......Sergeants lined themselves up between the exit of the van and gate of the lock up.....shouts of 'ready' 'ready' were raised.....each one of the prisoners, after alighting, was set upon by the sergeants and belaboured with sticks and fists....Blows were freely directed at the stomach, chest, face, eyes and head. Delegates who tottered under a blew which fell on the right side received another immidiately on the left. When one cuffed in the stomach, placed his hands there, a shower of fists fell on his unprotected head and face. One who lowered his head, got a push on his chin. One delegate from Etowa who had to protect his head with hands, was seized by the sergeants who dashed his head against a wall, and kept it pressed to it by the throat, Moulvi Abdual Latif of Lucknow, fainted from his injuries."[৯ক]

প্রেস-ইমার্জেন্সী অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে যাবতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র দশদিনব্যাপী হরতাল পালন করে। তারপর দীর্ঘদিন যাবৎ জাতীয়তাবাদী সমস্ত সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভের স্থান শূন্য থাকতো। সেখানে কোন কিছু মুদ্রিত হত না। এটা ছিল সেন্সরশিপ আদেশের প্রতিবাদ। এ ছাড়া বহু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে কারাদন্ড ভোগ করতে হয়েছে, তাদের হাজার হাজার টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে পুনরায় দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ পরিমাণ জামানত তলব করা হয়েছে এবং এই বর্দ্ধিত জামানত জমা দেওয়ার অ-সামর্থ্যের জন্য বহু সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহের সক্রিয় ও উজ্জ্বল ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

উইলিংডনীয় চন্ডনীতির আর একটি সুপরিকল্পিত অপকৌশল ছিল কারাগারের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের উপরে অমানুষিক নিপীড়ন। রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য

মর্যাদাসম্পন্ন বিধিব্যবস্থার দাবিতে ১৯২৯ সালে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ৬৭ দিন অনশনে থেকে যতীন দাসের গৌরবময় আত্মদান সারা দেশে যে জনবিক্ষোভের অগ্নি প্রজ্বলিত করে তা দেখে বিচলিত হয়ে ইংরেজ সরকার কারাগারে বন্দীদের শ্রেণী বিভাগের এক নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেন। নূতন নিয়মেও 'রাজনৈতিক বন্দী' বলে কোন পৃথক শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করতে ইংরেজ সরকার সম্মত হল না। বন্দীদের ব্যক্তিগত সামাজিক ও শিক্ষাগত মর্যাদা এবং তাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মানের স্তরভেদ অনুসারে রাজনৈতিক, অ-রাজনৈতিক নির্বিশেষে তাদেরকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিশন বা 'এ', 'বি' ও 'সি' ক্লাসে বিভক্ত করবার নিয়ম প্রচলিত হল। রাজনৈতিক বন্দীরা এই ব্যবস্থাকে স্বাধীনতাকর্মীদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির একটা কূটকৌশল বলে মনে করলেন। ১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলনে প্রথমদিকে যাঁরা দন্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলকেই প্রথম ডিভিসন বা 'এ' ক্লাস শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কিন্তু অল্পদিন পরেই নূতন দন্ডিত বন্দীদের সকলকেই এক সাপ্টা তৃতীয় ডিভিশন দেওয়া হয় (অর্থাৎ সাধারণ চোর ডাকাত পকেটমার প্রভৃতির সাথে একশ্রেণীভুক্ত করা হয়)। এ নিয়ে বিভিন্ন জেলে সংগ্রাম চলে, কিন্তু অকস্মাৎ গান্ধী আরউইন চুক্তির শর্তানুসারে সকল বন্দীর মুক্তি ঘটায় এই সংগ্রাম কোন পরিণতিতে পৌঁছাতে পারে না। ১৯৩২-এর আন্দোলনে সরকার নির্দেশ জারী করেন যে আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দন্ডিত বন্দীদের মধ্যে যাঁরা 'উচ্চতর শ্রেণীর' মর্যাদা লাভের জন্য দরখাস্ত করবেন, সরকার তাঁদের যোগ্যতা বিবেচনা করে দেখবেন। যাঁরা দরখাস্ত করবেন না, তাঁদের সকলকেই তৃতীয় ডিভিশন বা 'সি' ক্লাসভুক্ত করা হবে. কংগ্রেস নির্দেশ প্রচার করলেন যে বিদেশী শাসকদের কাছে কেউ দরখাস্ত করে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করবেন না। ফলে ১৯৩২ সালে যে একলক্ষ ব্যক্তি আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দন্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ২/৪ জন খ্যাতনামা সর্বভারতীয় নেতা ছাড়া আর সকলকেই 'সি' ক্লাস বা তৃতীয় ডিভিশন ভুক্ত করা হয় অর্থাৎ সকলকেই সাধারণ চোর-ডাকাত-পকেটমার প্রভৃতির তুল্য গণ্য করে অমানুষিক কারাবিধির অধীন করা হয়। ডঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ

কারাগার সমূহের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের উপরে অমানুষিক নিপীড়ন

"Graduates, professors, lawyers, editors, well-to-do traders, rich zamindars, highgrade agriculturists, phillanthropic workers.......were all thrown pell-mell into the last class with the food and clothing of ordinary convicts."[১০]

বঙ্গদেশে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অজয় মুখার্জি, সতীশ সামন্ত, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নৃপেন বসু, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের এম.পি.) হেমন্ত কুমার বসু, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, চারুচন্দ্র ভান্ডারী, অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি সমস্ত খ্যাতনামা নেতাকেই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এছাড়া জেলখানার নানা অমানুষিক ও অপমানজনক কারাবিধি অমান্য করবার অজুহাতে ও নানা মিথ্যা অজুহাতে রাজনৈতিক বন্দীদের উপরে ক্রমাগতরূপে নির্যাতন চলতে থাকে। তার ফলে প্রতিটি কারাগার সর্বসময়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। হিজলী অ্যাডিশন্যাল

স্পেসাল জেলে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে 'সেলাম' করতে অস্বীকার করার দরুণ বহু নেতার ডান্ডারেড়ী ও 'খাড়াহাতকড়ি' (standing handcuff)* ইত্যাদি অমানুষিক দন্ড দেওয়া হয়। এইভাবে দন্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে চারুচন্দ্র ভান্ডারী ও ক্ষিতীশ দাশগুপ্তও ছিলেন। তাঁদের ৪ দিনের standing handcuff হয়। মাথায় কয়েদীটুপি পরতে অস্বীকার করার জন্য ঐ জেলের যাবতীয় রাজনৈতিক বন্দীকে ৪ দিন খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয় শুধু ভাতের মাড়, তাও লবণবিহীন। বন্দীরা (সংখ্যায় ২২০০) ঐ অপমানজনক খাদ্যগ্রহণে অস্বীকার করেন ও চারদিন নির্জলা উপবাস করেন। একটি ওয়ার্ডে কিছু ছেলে রাত্রিকালে গান গেয়েছিল এই অপরাধে ঐ ওয়ার্ডের সমস্ত বন্দীর প্রতি ১৫ দিন চট্-কাপড় (অর্থাৎ সাধারণ 'বস্তার' চট দিয়ে তৈরী 'জাঙ্গিয়া' ও কোর্তা) পরিধান করবার আদেশ দেওয়া হয়। বন্দীদের সব জাঙ্গিয়া ও কোর্তা খুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁরা চট্-কাপড় পরতে অস্বীকার করেন এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কাল কাটাতে থাকেন। পাঁচদিন উলঙ্গ অবস্থায় কাটানোর পর জেলকর্তৃপক্ষ শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করেন। এছাড়া প্রায়শই মারপিট ইত্যাদি। সুপরিকল্পিতরূপেই প্রতিটি কারাগারকে নরকে পরিণত করা হয়।

দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এই আন্দোলনে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৩২-এর জুলাইয়ের শেষে ভারতের বিভিন্ন জেলে আইন-অমান্য সম্পর্কে ধৃত ও দন্ডপ্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা ছিল ১০০০। বঙ্গদেশেই এদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। মেদিনীপুর জেলার অধীন হিজ্‌লীতে ঐ আন্দোলনের সময়ে শুধু মহিলা-বন্দীদের আবদ্ধ রাখবার জন্য একটি স্পেশাল জেল খোলা হয়। সেখানে ৩/৪ শত মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

১৬ই আগস্ট, ১৯৩২ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড তাঁর সেই বহু বিতর্কিত 'সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত' ঘোষণা করলেন যা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশল বলে এ যাবৎ নিন্দিত হয়ে আসছে। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড একটি বক্তৃতায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ যদি পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যাসমূহের

'কম্যুন্যাল' অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ্

* 'খাড়াহাতকড়ি' —শাস্তি অত্যন্ত পৈশাচিক। বন্দীর দুই হাত হাতকড়ায় আবদ্ধ করা হয়। তারপর দেয়ালে বা কাঠের খুঁটিতে, মাটি থেকে চার ফুট উচ্চে আটকানো একটা লোহার আংটার সাথে হাতকড়ি লক্ করে আটকে দেওয়া হয়। এইভাবে বাহুযুগল উদ্ধোত্থিত ও দেয়াল বা খুঁটিতে আট্‌কানো অবস্থায় শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকালে তিন ঘণ্টা ও বিকালে তিনঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়।

বর্তমান লেখক ১৯৩৩-এর ৩০শে অক্টোবর হিজলী জেল থেকে মুক্তিলাভ করে বাইরে এসে হিজলী জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি নানা অসহনীয় অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে সংবাদপত্রে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রেরণ করেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেই সুদীর্ঘ বিবৃতি কলকাতার সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ বিবৃতিকে কেন্দ্র করে প্রচন্ড আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের পরিণতিতে 'সেলাম' সংক্রান্ত নিয়মটি কারাবিধি থেকে ছেঁটে ফেলা হয়।

ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবিগুলির সম্পর্কে সর্বসম্মত কোন ফর্মুলা উদ্ভাবন করতে না পারনে এবং সে ক্ষেত্রে তাঁরা মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের উপরে ঐরূপ একটি ফর্মুলা ধার্য করে দেওয়ার ভার অর্পন করলে তিনি সে কার্য করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু গান্ধীজী ঘরোয়া বিবাদ নিষ্পত্তির ভার মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের হাতে অর্পন করতে সম্মত হন না এবং অন্যান্য নেতৃবর্গও এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। দ্বিতীয়, গোলটেবিল বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়ার পর কংগ্রেস বাদে অপরাপর গোষ্ঠীর কোন কোন নেতা নাকি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে ঐরূপ ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তারই বনিয়াদে মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড তাঁর 'অ্যাওয়ার্ড' বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। 'অ্যাওয়ার্ড' শব্দটি আইনের শব্দ। বিবদমান পক্ষগণ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যদি কোন ব্যক্তির বা আদালতের উপরে কোন বিরোধীয় বিষয়ের ভার অর্পন করেন তবে ঐ ভাবে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তার নাম 'অ্যাওয়ার্ড'। এখানে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডের উপরে ভার অর্পন করেন নাই। মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড প্রকৃতপক্ষে 'স্বনিয়োজিত সালিশ' (self appointed arbitrator) হিসাবে তাঁর 'অ্যাওয়ার্ড' প্রচার করেন।

'অ্যাওয়ার্ড'-এ বিতর্কিত সাম্প্রদায়িক দাবি দাওয়া সমূহের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় নাই। শুধু ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে সকল 'প্রাদেশিক বিধানসভা' গঠিত হবে, সেই সব বিধানসভায় কোন সম্প্রদায়ের জন্য কত সংখ্যক আসন নির্দিষ্ট থাকবে ও কি প্রণালীতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হবে সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। কেন্দ্রীয় বিধানমন্ডলীর গঠন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ স্থগিত (defend) রাখা হয়। ২৪টি প্যারাগ্রাফে রচিত এই 'অ্যাওয়ার্ডের' সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হল।

(ক) মুসলমান, ইউরোপীয় ও শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারগণ পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। শুধু স্ব স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারদের নিয়েই তাদের পৃথক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী (constituency) গঠিত হবে (দশ বছর পরে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় সমূহের সম্মতিক্রমে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে)।

(খ) যে সকল ভোটার মুসলমান, ভারতীয় খৃস্টান, শিখ, ইউরোপীয় ও অ্যাংলোইন্ডিয়ান এই পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হবে। পূর্বোক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সাধারণ নির্বাচকমন্ডলীর ভোটার হতে পারবেন না বা সাধারণ নির্বাচকমন্ডলী থেকে প্রার্থী হতে পারবেন না।

(গ) 'অনুন্নত শ্রেণী'-ভুক্ত (depressed classes) ব্যক্তিগণ সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতে ভোটার তালিকাভুক্ত হবেন এবং সাধারণ নির্বাচকমন্ডলীতে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন। উপরন্তু, যেহেতু বেশ কিছুকাল পর্যন্ত (for a considerable period) সাধারণ নির্বাচক মাধ্যমে ঐ শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের মধ্য থেকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হবেন না, সেইহেতু প্রতি প্রদেশে শুধু অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত ভোটারদের নিয়ে কয়েকটি 'বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী' (special constituency) গঠিত হবে। এই সব নির্বাচকমণ্ডলী থেকে শুধু অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবতে পারবেন। বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর

জন্য পঞ্জীভুক্ত ভোটারগণ সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতেও ভোটার হবেন ও ভোট দিতে পারবেন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ 'সাধারণ' ও 'বিশেষ' এই উভয় প্রকার নির্বাচকমণ্ডলী থেকে প্রার্থী হতে পারবেন।

(ঘ) বঙ্গদেশে যেহেতু সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীসমূহে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত ভোটারদেরই সংখ্যাধিক্য থাকবে বলে অনুমিত হচ্ছে, সেহেতু বঙ্গদেশের Special Depressed Class + Constituency-র সংখ্যা আপাতত নির্দিষ্ট করা হল না। এই সংখ্যা পরে ঘোষিত হবে। তবে ঐ সংখ্যার সর্বোচ্চ সীমা হবে ১০।

(ঙ) কোন কোন জাতি (caste) 'অনুন্নত' বলে গণ্য হবে তা পরে ঘোষণা করা হবে। ভোটাধিকার নির্ণায়ক কমিটির (Franchise Committee-র) রিপোর্ট বিবেচনা করে 'অনুন্নত' পর্যায়ভুক্ত জাতির তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

(চ) সরকার মনে করছেন যে ২০ বছর পরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ নির্বাচকমন্ডলী গঠন প্রয়োজন হবে না।

(ছ) ভারতীয় খৃস্টান ও অ্যাংলোইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারদের নিয়ে পৃথক পৃথক নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হবে।

(জ) প্রত্যেক প্রদেশেই এমন ২/৪ টি নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হবে যার মাধ্যমে শুধু মহিলা প্রার্থীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

(ঝ) শিল্পোদ্যোগ (Industry), বাণিজ্য (Commerce), শ্রম (Labour), চা-বাগান, (Planting), খনি (Mining) প্রভৃতি স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য পৃথক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হবে।

বিছার বিষ থাকে তার পুচ্ছে। সেই প্রকার মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের অ্যাওয়ার্ডের পুচ্ছে অর্থাৎ ২৪ নং প্যারাগ্রাফরূপে চিহ্নিত সর্বশেষ প্যারাগ্রাফে দুরভিসন্ধির বিষ অধিকতম পরিমাণে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে। এই প্যারাগ্রাফে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন বন্টনের বিস্তারিত নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য)

২৪ নং প্যারাগ্রাফ অনুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সর্বমোট সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় ২৫০। হিন্দু ও মুসলমান এ দুই প্রধান সম্প্রদায়ের কারও অনুকূলে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। ইউরোপীয়গণ ও ধনিক বণিক প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থের জন্য অত্যধিক হারে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যানুপাতিক ভাগ থেকে অনেকগুলি আসন কেটে নেওয়া হয়। সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে হিন্দু-প্রতিনিধিগণকে নির্বাচিত হতে হবে। দুই জন মহিলা সদস্য সহ বঙ্গদেশে সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হল ৮০। (এর মধ্য থেকে 'অনুন্নত শ্রেণীর' জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে)। এই সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা কত হবে, তা 'অ্যাওয়ার্ড'-এ নির্দিষ্ট করা ছিল না। বলা হয়েছিল ঐ সংখ্যা পরে ঘোষিত হবে। মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচিত হবে একজন মহিলা সহ ১১৯ জন সদস্য। এ ছাড়া ভারতীয় খৃস্টানদের জন্য ২টি, অ্যাংলোইন্ডিয়ানদের জন্য ৪টি, ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকের জন্য একটি করে, এবং শ্রম বা Labour-এর

জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। আলোচ্য সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রদেশের সর্বমোট জনসংখ্যার ৪৪.৮ শতাংশ, আর মুসলিম জনসংখ্যা প্রদেশের মোট জনসংখ্যার ৫৪.৮ শতাংশ। ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রদেশে সমগ্র জন্যসংখ্যার .০১ শতাংশ। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন ঃ

"In Bengal Hindus were 44.8 per cent. They were given 80 seats in a house of 250 (that is only 32 per cent of the total). The Muslims were 54.8 per cent, they were given 119 territorial seats (that is 47.6 per cent of the totals). The population of Europeans in the country was 0.1 per cent. They were given a heavy weightage of 100 per cent of their population. Is will thus appear that though both Hindus and Musalmans had to sacrifice some seats out of their due quota, for providing heavy weightage to Europeans, the proportion of sacrifice imposed on Hindus was greater than what was imposed on Muslims."[১১]

একদিকে যেমন ইউরোপীয়গণকে পর্বত প্রমাণ 'ওয়েটেজ' দেওয়া হল, অন্যদিকে তেমনি সেই ওয়েটেজের সিংহভাগ কেটে নেওয়া হল হিন্দুদের কোটা থেকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যানুপাতিক কোটা থেকে কেটে নেওয়া হল শতকরা ৭.২ ভাগ, আর হিন্দুদের জনসংখ্যানুপাতিক কোটা থেকে কাটা হল শতকরা ১২.৮ ভাগ। অর্থাৎ জনসংখ্যানুপাতে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হলে যেখানে মুসলমানেরা পেতেন ১৩৭ টি ও হিন্দুরা পেতেন ১১৪টি আসন, সেখানে মুসলমানেরা ১১৯টি এবং হিন্দুরা পেলেন ৮০টি আসন। মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে ছাড়তে হল ১৮টি আসন, আর সংখ্যালঘু হিন্দুদের কাছ থেকে ৩৪টি আসন কেড়ে নেওয়া হল। মন্টেগু চেম্সফোর্ড রিফর্মস্ পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মোট ১১৩টি নির্বাচনযোগ্য আসনের মধ্যে 'অমুসলমান'দের (অর্থাৎ হিন্দুদের) জন্য নির্দিষ্ট ছিল ৪৬টি আসন, মুসলমানদের জন্য ছিল ৩৯টি। অবশ্য ঐ পরিকল্পনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন করা হয় নি। 'ভোটার' সংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন করা হয়। অমুসলমান ৫,৪১,১৮৯ জন ভোটার হিসাব করে তাদেরকে ৪৬টি আসন দেওয়া হয়, আর ৬০,১২৭ মুসলমান ভোটারের জন্য দেওয়া হয় ৩৯টি আসন। অর্থাৎ অমুসলমানরা (হিন্দুরা) পেয়েছিলেন প্রতি ১০৩০২ জন ভোটার পিছু একটি করে আসন, আর মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল প্রতি ১৫৪২ জন ভোটার পিছু একটি করে আসন। এখানেও মুসলমানেরা প্রচুর পরিমাণে ওয়েটেজ পেয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সর্বদা স্বীকার্য যে ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন বিজ্ঞানসম্মত প্রথা নয়। তা ছাড়া ঐ সময়ে যে সকল পরিবার বার্ষিক অন্তত দুই টাকা চৌকীদারী ট্যাক্স প্রদান করে না, তারা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয় না। এর ফলে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষেরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ট্যাক্স প্রদানকারী এক পরিবার থেকে মাত্র একজনই ভোটার হতে পারেন, ট্যাক্সের পরিমাণ যতই হোক না কেন। সুতরাং মন্টেগু চেম্সফোর্ড রিফর্মস্ পরিকল্পনার আসন বন্টনকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করবার অনুকূলে কোন

যুক্তি নাই। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় যে হিন্দু সম্প্রদায় ১১৩টি নির্বাচনযোগ্য আসনের অর্দ্ধেক দখল করতেন, তাঁদেরকে অকস্মাৎ ২৫০টি নির্বাচনযোগ্য আসনের একতৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু মানসকে উত্তপ্ত করবে। মনে হয় ইংরেজেরা এটাই চেয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কে নিয়ত তিক্ততাযুক্ত করে রাখা ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশলের একটি স্তম্ভ বিশেষ।

মর্লি-মিন্টো আমলে উদ্ভাবিত 'ভেদনীতির' সম্প্রসারণ ও দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে ভারতের উপরে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীকে চিরস্থায়ী করবার দুরভিসন্ধি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের মতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত। মর্লি-মিন্টো আমলে পৃথক নির্বাচন প্রথার (seperate electorate-এর) প্রবর্তন দ্বারা ভেদনীতির আশ্রয়ে ভারতশাসন করবার অপকৌশলের ভিত্তি স্থাপিত হয়। স্মরণ রাখা উচিত যে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই 'ভেদনীতি'-কে ইংরেজেরা মৌলিক শাসননীতি রূপে গ্রহণ করেন।

'কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড' ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধির ছাপমারা একখানি সর্বনাশা দলিল

তারপরে ১৯২১ সাল, ১৯৩০ সাল ও ১৯৩২ সালের তিনটি প্রবল ও ব্যাপক গণ-আন্দোলনের আঘাত ইংরেজদেরকে প্রচণ্ডরূপে আতঙ্কিত করে তোলে। ইংরেজেরা বুঝতে পারলেন যে ভারতবাসীর জাতীয় মুক্তির কামনা এখন আর শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর মধ্যে কিংবা একদল তপ্তমস্তিষ্ক বে-পরোয়া মধ্যবিত্ত যুবকের মধ্যে কোটরবদ্ধ অবস্থায় নাই। ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং তা ক্রমবর্দ্ধমানরূপে উগ্রতর ও ব্যাপকতর রূপ ধারণ করছে। গণ-আন্দোলনরূপী দুর্দমনীয় ভুজঙ্গকে অতিকুৎসিত চণ্ডনীতির প্রয়োগ করেও আর ঝাঁপির মধ্যে ঢোকানো যাবে না। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র রক্ষাকবচ যা হাতে আছে তা হল 'ভেদনীতির' সম্প্রসারণ ও তার দৃঢ়ীকরণ।

হিন্দু বা মুসলমান, আইনসভায় কে কয়টি আসন লাভ করলেন, 'পৃথক নির্বাচন' প্রথা না থাকলে এ প্রশ্ন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কারণ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য প্রার্থীকে যেখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস্যতা অর্জন করতে হয়, সেখানে বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে কতজন হিন্দু আর কতজন মুসলমান এ বিচার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং আসন বন্টনের ব্যাপারে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডে যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, যৌথ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে তা নিয়ে কোন সম্প্রদায়ের মনে বিশেষ কোন বিক্ষোভ থাকতো না। কিন্তু যৌথ নির্বাচন স্বীকৃত হলে কংগ্রেস, মডারেটপন্থী হিন্দুগণ, এমন কি হিন্দু মহাসভাপন্থীগণও বাংলা ও পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫১ ভাগ আসন সংরক্ষিতকরণের প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন। এতে বঙ্গদেশের প্রাদেশিক পরিষদে মুসলমানেরা ১২৮টি আসন পেতেন। যে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের দাক্ষিণ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানেরা পেলেন শতকরা ৪৭$\frac{১}{২}$ ভাগ অর্থাৎ ১১৯টি আসন, যদিও পৃথক নির্বাচন প্রথা বহাল রইলো। ইংরেজেরা ভালভাবেই বুঝেছিলেন, যে 'ভেদনীতি' তাঁদের সাম্রাজ্যশাসনের মূল স্তম্ভ। পৃথক নির্বাচন প্রথা রহিত হলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দুর্বার হয়ে উঠবে এবং তাঁদের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হবে। পৃথক নির্বাচন প্রথার গর্ভে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষভাণ্ড

লুকানো থাকে। পৃথক নির্বাচন প্রথায় নির্বাচন প্রার্থীরা নিজেদেরকে যত বেশী করে সাম্প্রদায়িকতার ধারক হিসাবে জাহির করতে পারবেন, তাঁদের সাফল্যের সম্ভাবনা তত বেশী বৃদ্ধি পাবে। হিন্দু প্রার্থী তাঁর নির্বাচকদের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন যে তিনিই হিন্দু স্বার্থের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পোষক। তেমনি মুসলমান প্রার্থী প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন তিনিই মুসলিম স্বার্থের বিশ্বস্ততম সংরক্ষক। এইভাবে নির্বাচনী প্রচারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রচারমাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। আমরা ইতঃপূর্বে দেখিয়েছি যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলিম ডেপুটেশনের উদ্যোগকালে ইংরেজদের প্ররোচনার ফলেই পৃথক নির্বাচনের দাবিকে ডেপুটেশনের দাবি-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিষবাহী সম্পর্ক কাজে লাগিয়েই এ যাবৎ ইংরেজেরা ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয়তাবাদী জাগৃতিকে প্রতিরোধ করে আসছেন। অতএব এ প্রথা যে সাম্রাজ্যবাদের নিরাপত্তার পক্ষে কতদূর কার্যকরী তা তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, সুতরাং পৃথক নির্বাচন প্রথার রহিতকরণে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সম্মতি লাভ প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব ছিল।

১৯৩০ ও ১৯৩২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রচন্ড আঘাত ও ১৯২৪ থেকে ১৯৩২ এই সময়ের মধ্যে বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে সাম্রাজ্যবাদীদের মনে আতঙ্ক ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা উপলব্ধি করলেন যে ভারতবর্ষে গ্রেট ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করণের জন্য নতুন কোন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এতদিন তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রতিরোধ করবার যে কূটকৌশল অনুসরণ করেছিলেন, ভারতবর্ষের নিয়ত ক্রমবর্ধনশীল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উন্মাদনার মুকাবিলার পক্ষে তা যে যথেষ্ট নয়, এ সম্পর্কে সচেতনতা জন্মালো ব্রিটিশ রাজনীতিকদের বিপন্ন মানসে। অতএব ভেদনীতির সম্প্রসারণ করে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়কে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করবার দুর্বুদ্ধি উদ্‌গত হল ব্রিটিশ মানসে। এই দুর্বুদ্ধির বশেই কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডে হিন্দু অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে প্রতিনিধি বাছাই এর নিন্দনীয় ব্যবস্থা কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডে স্থান লাভ করলো।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বড়লার্ট লর্ড ডাফরিণ জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক দাবিসমূহকে উপহাস করে বলেছিলেন ঃ

"how could any reasonable man imagine that the British Government would be content to allow this microscopic minority to control the administration of that majestic and multiform empire for whose safets and welfare they are responsible in the eye of God and before the eyes of civilisation?..... it appears to me to be a groundless contention that it represents the people of India..... large section of the community are already becoming alarmed at the thought of such self-constituted bodies interposing between themselves and the august impartiality of the British rule."[১২]

লর্ড ডাফরিনের ঐ উদ্ধত উক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের তাৎকালিক মনোভাবকে প্রতিফলিত

করে। কিন্তু আন্দোলনের ব্যাপকতা বর্ষার জলের মত ক্রমাগতরূপে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। শুরু হল বিপ্লবী যুবকদের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড—তাদের সাহস, রণচাতুর্য ও নিঃসঙ্কোচে আত্মদান চমৎকৃত করলো দেশের আপামর সাধারণকে। ইংরেজেরা বলতে লাগলেন—'এ সব যা হচ্ছে, তা কতিপয় উত্তপ্তমস্তিষ্ক বিপথগামী নিষ্কর্মা মধ্যবিত্ত যুবকের উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতার ফল মাত্র।' তার পরে এলো ১৯২০ সালের পর থেকে দুর্বার গণ-আন্দোলনের পৌনঃপুনিক আঘাত। ইংরেজদের ধারণা হল ভারতের হিন্দু জনসাধারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাবাধীন। সেই জন্যই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ভারতের জনতার সমর্থন লাভ করছে। অতএব সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হলে হিন্দু-মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাথে হিন্দু মেহনতকারী শ্রেণীর বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য ইংরেজেরা, যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ, ঢাকার নবাব বাহাদুর ও মুসলমান নবাব-নাইট-খাঁ-বাহাদুর-খাঁ সাহেবদের কাজে লাগিয়েছিলেন, তেমনি ডঃ আম্বেদকারকে 'হিন্দু অনুন্নত সম্প্রদায়ের' নেতা রূপে রঙ্গমঞ্চে হাজির করে হিন্দু সমাজকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করবার কূট-পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হল ইংরেজ রাজনীতিকদের মস্তিষ্ক থেকে।

ভেদনীতি সম্প্রসারণের নূতন পরিকল্পনার প্রতিবাদে গান্ধীজী কর্তৃক আমরণ অনশনের সঙ্কল্প ঘোষণা

১৯৩১-এর ২রা অক্টোবর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে গান্ধীজীর লন্ডনে অবস্থানকালে একটি বে-সরকারি 'মাইনরিটিজ্' কনফারেন্সে ডঃ আম্বেদকর 'অনুন্নত সম্প্রদায়ের' জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি উপস্থিত করেন। গান্ধীজী ঐ সভায় ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পরে গোলটেবিল বৈঠকে ১৩.১১.৩১ তারিখে ঘোষণা করেন তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ঐরূপ দুরভিসন্ধিকে প্রতিরোধ করবেন (will resist the dismemberment of the untouchables from the Hindu Society with his life)। ১৯৩২-এর মার্চ মাসে সংবাদপত্রে এরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট 'অনুন্নত সম্প্রদায়ের' জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে মন স্থির করে ফেলেছেন। গান্ধীজী তখন যারবেদা জেলে বন্দী। ১১ই মার্চ তিনি যারবেদা কারাগার থেকে ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোরকে এক পত্র লিখে জানান :

"You will perhaps recollect that at the end of my speech in the R.T.C., when Minorities' claim was presented, I had said that I should resist with my life the grant of seperate electorate to depressed classes... From the newspapers I am permitted to read, I observe that at any moment. His Majesty's Government may declare their decision... I am not against their representation in legislaturs. I should favour every one of their adults, male and female being registered as voters... But I hold that seperate electorate is harmful for them and for Hinduism... So far as Hinduism is concerned, seperate electorate will simply vivisect and disrupt it... I therefore respectfully inform His Majesty's Government, that in the event for their decision creating seperate electorate for the depressed classes, I must fast unto death."[১৩]

১৯৩২-এর আগষ্ট মাসে 'কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড' প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই অর্থাৎ ১৮ই আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডকে একখানা পত্র লিখে গান্ধীজী জানান ঃ

"I have read the British Government's decision on the representation of Minorities. In pursuance of my letter to Sir Samuel Hoare and my declaration at the meeting of the Minorities Committee of the R.T.C. at the St. James Place, I have to resist your decision with my life. The only way I can do so is by declaring a perpetual fast unto death from food of any kind, save water, with or without salt and soda..... The proposed fast will come into operation in the ordinary course from to noon of the 20th september next unless the said decision is meanwhile revised...."[১৪]

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২, প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড গান্ধীজীর চিঠির জবাব দেন। তিনি জানান যে "অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের বহুতর সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা যে প্রচুর আবেদনপত্র পেয়েছি সেগুলি বিবেচনা করে (in view of numerous appeals we have received from depressed class organisations) এবং তাদের উপরে যে সকল সামাজিক বাধানিষেধ আরোপিত আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনুভব করেছি যে আইনসভা সমূহে সীমিত সংখ্যক আসন অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা আমাদের কর্তব্য। যাতে এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দু সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে না যায়, সে বিষয়েও আমরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। মুসলমানদের ক্ষেত্রে নির্বাচকমন্ডলীকে যে ভাবে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়েছে, অনুন্নতদের ক্ষেত্রে আমরা সে প্রকার ব্যবস্থা করি নি। আমি অনুরোধ করছি যে আমাদের সিদ্ধান্তের মর্ম আপনি যথাযথরূপে অনুধাবন করবেন এবং আপনি যা করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন তা সঙ্গত কি না তা গভীরভাবে (seriously) বিবেচনা করে দেখবেন।"

৯ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী যারবেদা কারাগার থেকে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে পত্র দিয়ে জানিয়ে দেন যে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে তিনি অনিচ্ছুক। কারণ ঃ "I sense the injections of a poison that is calculated to destroy Hinduism and do no good to the depressed classes." গান্ধীজী তাঁর পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ অনশনে। ভারতসরকারের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘোষণা করেন যে গান্ধীজী অনশন শুরু করলে তাঁকে কারাগার থেকে কোন উপযুক্ত বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হবে এবং সেখানে তাঁর উপরে শুধু এইমাত্র নিয়ন্ত্রণ থাকবে যে তিনি সেই বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র যাবেন না। গান্ধীজী এ সুবিধা প্রত্যাখ্যান করলেন।

নির্দ্ধারিত ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে যারবেদা কারাগারে গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন। প্রবীণ জাতীয়তাবাদী নেতা আব্বাস তায়েবজীর কন্যা মিস্ তায়েবজী কর্তৃক একটি হিন্দী প্রার্থনা সঙ্গীত দিয়ে অনশনের সূচনা ঘোষিত হল।

গান্ধীজীর অনশন ও তার দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া

অনশন শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের সমক্ষে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

গান্ধীজীর অনশন সারা ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সারাদেশে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কালোমেঘ ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষীয়ান জাতীয় নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আহ্বানে সারা ভারতের সম্মানিত নেতৃবর্গ বোম্বাই নগরে উপনীত হন। ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে বোম্বাই বণিকসভার ভবনে সর্বভারতীয় নেতৃ-সম্মেলন শুরু হয়। খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হয়ে ওঠেন। সম্মেলনে উপস্থিত হন স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, মুকুন্দরাও জয়াকর, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ মুঞ্জে, স্যার চিমনলাল শীলতবাদ, স্যার বালচাঁদ হীরাচাঁদ, হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু, ডঃ চৈতরাম পিদোয়ানী, টি. প্রকাশম, দেবীপ্রসাদ খৈতান্, হংস মেহতা, এম. এস. অ্যানে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা এম. সি. রাজা, রাও বাহাদুর, শ্রীনিবাসন প্রভৃতি। শেষোক্ত দুইজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা নেতা।

এম. সি. রাজা অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন, এবং ১৩ই সেপ্টেম্বব তারিখে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত এক ভাষণে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি ও মর্যাদাপ্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজীর অক্লান্ত প্রয়াসের প্রশংসা করে ঘোষণা করেন যে পৃথক নির্বাচন প্রথা অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে হানিকর এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনও 'পৃথক নির্বাচন' দাবি করে নি। মিঃ রাজা আরও বলেন—"I claim that my community is already in favour of common electorate." তিনি উল্লেখ করেন যে ডঃ আম্বেদকর ও রাও বাহাদুর শ্রীনিবাসন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক 'অনুন্নত সম্প্রদায়ের' প্রতিনিধি বলে মনোনীত হয়েছিলেন। এই ডঃ আম্বেদকরই ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের কাছে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন যৌথ নির্বাচন সমর্থন করে। বোম্বাই প্রদেশের সাইমন কমিশন কমিটির সভ্য হিসাবে তিনি যে 'আপত্তিপত্র' (Minute of dissent) দাখিল করেন, সেখানেও তিনি যৌথ নির্বাচন দাবি করেছিলেন। রাও বাহাদুর শ্রীনিবাসন মাদ্রাজ অনুন্নত সম্প্রদায় ফেডারেশনের সভাপতি। ফেডারেশন যৌথ নির্বাচনের অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং রাও বাহাদুরকে নির্দেশ (mandate) দেয় ফেডারেশনের ঐ অভিমত গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করবার জন্য। তদনুসারে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যৌথ নির্বাচন সমর্থন করেন। মিঃ রাজা বলেন—"I don't know what brought about a revolution in the state of mind of Dr. Ambedkar and Mr. Srinivasan."

কিন্তু ভেদনীতি সফল করবার জন্য তাঁদের নিজেদের হাতে তৈরী নেতাদেরকেই 'সম্প্রদায়ের নেতা' (leader of the community) রূপে মঞ্চে হাজির করা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চিরাচরিত নীতি। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তাঁরা তাঁদের দেওয়া 'উপাধির' মুকুটশোভিত কর্তাভজাগণকেই তাঁরা 'মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা' বলে জাহির করেছেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা বলতে তাঁরা তাঁদের অনুগত ডঃ আম্বেদকরকেই চিহ্নিত করেছিলেন। এম. সি. রাজা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়া সত্ত্বেও 'নেতা' বলে স্বীকৃতি লাভ করলেন না।

অতএব গান্ধীজীর অনশনের ফলে দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল, সে পরিস্থিতিতে ডঃ আম্বেদকরই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ালেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঘোষণা

করেছেন—'সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহ একমত হয়ে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের কোন সংশোধন অনুমোদন করলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তদনুযায়ী 'অ্যাওয়ার্ড' সংশোধন করতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষেত্রে ডঃ আম্বেদকর অন্যান্য নেতৃবর্গের কোন সংশোধনী প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন না করলে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে তা গ্রাহ্য হবে না।

অতএব চেষ্টাচরিত্র করে ডঃ আম্বেদকরকে বোম্বাইয়ের নেতৃ-সম্মেলনে নিয়ে আসা হল। তিনি প্রথমে সময় চাইলেন। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তিনি বললেন যে গান্ধীজীকে অনুরোধ করা হোক তিনি তাঁর ঘোষিত অনশন ১০/১২ দিন স্থগিত রাখুন। অন্য প্রতিনিধিরা বললেন গান্ধীজীকে কিছুতেই ঐরূপ প্রস্তাবে রাজি করানো যাবে না। ডঃ আম্বেদকর তখন যৌথ নির্বাচন মেনে নেওয়ার পূর্ব-শর্ত হিসাবে কতকগুলি দাবি পেশ করলেন। দাবিগুলির মধ্যে ছিল যে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডে বিভিন্ন প্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে হবে এবং এইভাবে বর্দ্ধিত আসন সমূহের কতকাংশ যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে ও কতকাংশ পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে পুরণ করা হবে, আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ২৫ বছর কাল চালু থাকবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অনুপাতে তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং সে আসনগুলিও পূর্বোক্তরূপে কতক যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে ও কতক পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটের ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (adult franchise) প্রবর্তিত হবে। পূর্বোক্ত নীতি অনুসারে জেলাবোর্ড, লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, গ্রাম্য ইউনিয়নবোর্ড, স্কুল বোর্ড, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানে জনসংখ্যার অনুপাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি ও আধাসরকারি চাকুরীসমূহ সংরক্ষিত থাকবে, প্রতি প্রদেশের বাজেটে শিক্ষা খাতে যত টাকা বরাদ্দ হবে, তার জনসংখ্যানুপাতিক অংশ অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এবং পূর্বোক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে কোন ব্যাপারে অবিচার ঘটলে বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে 'আপীল' করা চলবে এবং সেই আপীলের রায় সকল পক্ষের উপরে বাধ্যকর হবে।

ডঃ আম্বেদকরের সুকৌশলী দরকষাকষি

স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে, ডঃ আম্বেদকরের দাবিগুলি কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের চেয়েও ক্ষতিকর এবং এ দাবিগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল হিন্দুসমাজকে তথা ভারতীয় জাতিকে বহুখন্ডে বিভক্ত করে ইংরেজদের প্রবর্তিত ভেদনীতির চূড়ান্ত সম্প্রসারণ এবং ইংরেজ শাসকবর্গের হাতে বিবদমান পক্ষদের স্থায়ী অভিভাবকত্ব প্রদানের পরিকল্পনা। ডঃ আম্বেদকর ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রনীতি ও সাংবিধানিক আইন (Constitutional law) সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি ছিল। সুতরাং তিনি অবশ্যই বুঝেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী হিন্দুনেতৃবর্গ কখনই ঐ সকল অবাস্তব ও ক্ষতিকর দাবি স্বীকার করে নিতে সম্মত হবেন না। খুব সম্ভবত তিনি দরকষাকষির কৌশল (bargaining tactics) হিসাবে তার প্রথম দাবিসমূহকে উঁচু পর্দায় তুলে ধরেছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাছে গান্ধীজীর জীবনের মূল্য কত বেশী সে কথা ডঃ আম্বেদকর ভালভাবেই জানতেন। সুতরাং তিনি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সর্বাধিক

সুবিধা আদায় করে নেওয়ার মতলবে উঁচু পর্দায় রচিত দাবিপত্রখানি নেতৃ-সম্মেলনের সামনে ছেড়ে দিলেন।

এদিকে গান্ধীজীর জীবনের জন্য দেশব্যাপী দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত বহ্নিশিখার মত অবিশ্বাস্য বেগে বেড়ে চলেছে। দেশের সর্বত্র মন্দিরে মসজিদে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, প্রত্যহ নগরে গ্রামে গঞ্জে সহস্র সহস্র মানুষের উদ্বেগপূর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সমবেত উপবাস দিবস পালিত হচ্ছে। খ্যাতনামা মানবিকতাবাদী সি. এফ. এন্ডরুজ তখন লন্ডনে ছিলেন। মিঃ এন্ডরুজ, মিঃ পোলক ও শ্রমিকদলের নেতা মিঃ ল্যান্সবেরীর উদ্যোগে বহুতর বিদগ্ধব্যক্তির স্বাক্ষরিত আবেদন প্রকাশিত হল লন্ডনে। শান্তিনিকেতনে সমবেত উপবাস পালিত হল এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপবাসে যোগদান করলেন।

চূড়ান্ত উদ্বেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অবিশ্রাম চলতে লাগলো নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা, গান্ধীজীর কাছে ও ডঃ আম্বেদকরের কাছে নেতৃবৃন্দের পুনঃ পুনঃ ছুটোছুটি। ২৩শে সেপ্টেম্বর স্যার তেজবাহাদুর, ডঃ এম্. আর. জয়াকর, পন্ডিত মালব্য, রাজাগোপাল আচারী, ডঃ আম্বেদকর প্রভৃতি দশজন শীর্ষ নেতা যারবেদা কারাগারে গিয়ে কুড়ি মিনিটকাল কথাবার্তা বলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। অনেক বিষয়ে জটিলতা সরলতর হয়ে এলেও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেদিনও হল না। তারপরদিনও সারাদিনব্যাপী ছুটোছুটি, আলোচনা ইত্যাদি চললো। অবশেষে ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রি তিনটার সময় একটা সর্বসম্মত ফর্মূলা উদ্ভাবন করা সম্ভব হল—ডঃ আম্বেদকরের পূর্ণ অনুমোদনক্রমে। তদনুসারে 'চুক্তিপত্র' রচিত হল। চুক্তিপত্রে প্রথম স্বাক্ষর দান করলেন নেতৃ-সম্মেলনের সভাপতি পন্ডিত মালব্য, দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারী ডঃ আম্বেদকর। অতঃপর স্যার তেজবাহাদুর, ডঃ মুকুন্দরাও জয়াকর, রাজাগোপাল আচারী, স্যার চুনীলাল মেহতা, এ. ভি. ঠক্কর, মিঃ এম. সি. রাজা, শ্রীনিবাসন, মিঃ রাজভোজ, মিঃ শিবরাজ প্রমুখ নেতৃ-সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবর্গ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি 'পুনা-চুক্তি' (Poona pact) নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছে।

২৬শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় হোম মেম্বার ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সানন্দে পুণা চুক্তির শর্তসমূহ গ্রহণ করেছেন। ঐ দিনই, অর্থাৎ ২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন চার ঘটিকা পনেরো মিনিটের সময় গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন যারবেদা কারাগারে। গান্ধীজীর খাদ্যগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রথমে কবিগুরু 'গীতাঞ্জলী' থেকে নির্বাচিত একটি গান করেন আবেগভরা কণ্ঠে। অতঃপর ঐ কারাগারে বন্দী জনৈক কুষ্ঠরোগী একটি গান করে। তারপর শ্রীমতী কমলা নেহরু কমলালেবুর রস করে শ্রীমতী কস্তুর বা গান্ধীর হাতে দেন। গান্ধীজী তাঁর সহধর্মিনী ও সহকর্মিনীর হাত থেকে পানীয় গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন।

নয়টি প্যারাগ্রাফে পুণাচুক্তির শর্তগুলি লিপিবদ্ধ হয় (পরিশিষ্ট খন্ড দ্রষ্টব্য)। সংক্ষেপে চুক্তির সারমর্ম হল এই যে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে বিভিন্ন প্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে। কোন্ কোন্ জাতি (caste) 'অনুন্নত' বলে গণ্য হবে তার তালিকা প্রস্তুত করে সাংবিধানিক আইনের তপসীলে সেই তালিকা সন্নিবিষ্ট

করা হবে। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী (general constituency)-তে যাঁরা ভোটার তালিকাভুক্ত হবেন তাঁদের মধ্য থেকে উক্তরূপে 'তপশীলভুক্ত জাতি' সমূহের অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত হবে। এই শেষোক্ত তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে তাঁরা সমষ্টিগত ভাবে একটি 'নির্বাচনী কলেজ' (Electoral college) বলে গণ্য হবেন। এ ভাবে গঠিত Electoral college-গুলি প্রতি সংরক্ষিত আসনের জন্য চারজন করে প্রার্থী মনোনয়ন করবেন। এই পর্বে শুধু তপশীলী জাতিভুক্ত ভোটাররাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এইভাবে মনোনীত ৪ জন প্রার্থী ছাড়া অন্য কেউ কোন সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন না। এভাবে মনোনয়ন বা 'প্রাথমিক নির্বাচন' (primary election)-এর মারফতে যে ৪ জন 'প্রার্থী' সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অধিকার লাভ করবেন, তাঁরা সংশ্লিষ্ট সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতে সংরক্ষিত ও অ-সংরক্ষিত উভয়বিধ আসনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারবেন। সেই চূড়ান্ত নির্বাচন হবে সকল সম্প্রদায়ের অর্থাৎ 'তপশীলী' ও 'অ-তপশীলী' সর্বশ্রেণীর ভোটার কর্তৃক প্রদত্ত ভোটের বনিয়াদে যৌথ নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ১৮ ভাগ আসন সংরক্ষিত থাকবে। পূর্বোক্ত নিয়মে নির্বাচন হবে। পূর্বোক্তরূপ প্রাইমারী নির্বাচনের দ্বারা প্রার্থীমনোনয়ন প্রথা ১০ বৎসরকাল বহাল থাকবে, তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ঐ ১০ বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে ঐ প্রথা রহিত করা যেতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যপদ লাভে কিংবা সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোন প্রকার বাধা বা নিষেধ আরোপিত হবে না। প্রতি প্রদেশের বাজেটে 'শিক্ষা' খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে তা থেকে একটা উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ (adequate sum) অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির জন্য পৃথক (earmark) করে রাখতে হবে।

পুণাচুক্তিব শর্তসমূহ ও তার তাৎপর্য

পূর্বোক্তরূপ চুক্তি সকল সম্প্রদায়ের কাছেই 'সন্তোষজনক' বলে বিবেচিত হয়েছিল। তবে বিভিন্ন প্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংবক্ষিত আসনের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিকরণের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সমালোচনা হয়েছিল। কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের ২৪ নং প্যারাগ্রাফ অনুসারে, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় সংরক্ষিত সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল ১৮। পুণাচুক্তির বলে সেই সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়ে দাঁড়ায় ৩০-এ। বোম্বাই প্রদেশে অনুরূপ ভাবে ঐ সংখ্যা ১০ থেকে বাড়িয়ে ১৫ করা হয়। বিহার ও উড়িষ্যায় ঐ সংখ্যা ৭ থেকে বাড়িয়ে করা হয় ১৮। এইভাবে সকল প্রদেশেই কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডে সংরক্ষিত আসনের যে সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল, পুনা চুক্তির বলে তা অনেকখানি বাড়ানো হল। তার ফলে প্রতি প্রদেশেই অ-তপশীলী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা হ্রাস পায়। অবিভক্ত বঙ্গদেশ সম্পর্কে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড তপশীলীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ছিল না। শুধু উল্লেখ করা ছিল যে ঃ "as regards seats allocated to the depressed classes in Bengal the number, which will not exceed ten, has not yet been fixed." সুতরাং বঙ্গদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ১০, এটা

কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডে ঘোষিত ছিল। 'পুনা চুক্তি' অনুসারে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে ৩০ করা হয়। অথচ মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশের অস্পৃশ্যতার কুৎসিত ও বীভৎস প্রথাসমূহ বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। সেক্ষেত্রে কোন্ যুক্তিতে বঙ্গদেশে দশকে তিরিশ করা হল তা দুর্বোধ্য। বঙ্গদেশে সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী সমূহের জন্য কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড অনুসারে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ছিল ৮০। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা পুণা চুক্তিতে অতিশায়িতরূপে বৃদ্ধি করণের ফলে বঙ্গদেশে অ-তপশীলী হিন্দুদের আসন সংখ্যা ৭০ থেকে ৫০-এ নেমে এলো। তৎকালীন স্থিতাবস্থায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মোট সভ্য সংখ্যা ১৩৯-এর মধ্যে অমুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ৪৬টি আঞ্চলিক আসন (territorial seats)। মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আঞ্চলিক আসনের সংখ্যা ছিল ৩৯। অ্যাওয়ার্ডে সেক্ষেত্রে ভাবী ব্যবস্থাপক সভার জন্য সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ১৩৯ থেকে বাড়িয়ে ২৫০-এ দাঁড় করানো সত্ত্বেও মুসলমানদের আসন সংখ্যা ৩৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯-এ দাঁড়ালো। আর অ-তপশীলী হিন্দুদের সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা আগের চেয়ে চারজন মাত্র বাড়িয়ে সীমিত করা হল ৫০-এ। অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মোট সভ্যসংখ্যা বেড়ে ১৩৯ থেকে ২৫০ হল। মুসলমান আসন আগের চেয়ে ৮০টি বেশী হল অ-তপশীলী হিন্দুদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিসংখ্যা মাত্র ৪। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, যে শ্রেণীর মানুষেরা বঙ্গদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে অর্দ্ধশতাব্দীকাল সক্রিয়তা ও তৎপরতা প্রদর্শন করেছে নূতন ব্যবস্থাপক সভায় তাদেরকে 'চিরস্থায়ী' মাইনরিটিতে পরিণত করা হল। বস্তুত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে গঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অ-তপশীলী হিন্দুদেরকে এক নগণ্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত করা হল, তার ফলে যে শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ছিল, বাংলার পরিষদীয় রাজনীতিতে তাদের প্রভাব অতিশয়িতরূপে খর্ব করা হল। বঙ্গীয় আইনসভায় বাঙ্গালী স্বদেশীওয়ালাদেরকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করে লাভবান হল একমাত্র ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদল। তপশীলী হিন্দু সম্প্রদায়ের আসনসংখ্যা ১০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০-এ দাঁড় করানোর ব্যবস্থা যে তপশীলী হিন্দুদের স্বার্থে হয় নাই, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটা দিবালোকেব মত স্পষ্ট। পুণা চুক্তির ব্যাপারে ডঃ আম্বেদকরের যে ভূমিকা তার পিছনে যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অশুভ প্রস্তাব নিরন্তর সক্রিয় ছিল এই অনুমান (inference)-ও একান্তভাবে যুক্তিশাস্ত্র সম্মত।

এতৎসত্ত্বেও পুণা চুক্তির শুভফল অনুপেক্ষণীয়। ভারতীয় জাতিকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করবার যে কূটকল্পনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিদের মস্তিষ্কপ্রসূত হয়ে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে সুপরিস্ফুট ছিল, গান্ধীজীর জীবনপণ অনশন তাকে বহুলাংশে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল।

কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড ভারতীয় জনমতকে প্রচন্ড রূপে আহত করে। ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ তারিখে ভাবতবর্ষের রাজ্যসভায় (Council of State-এ) পাঞ্জাবের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও রাসবিহারী বসুর অন্তরঙ্গ সহকর্মী লালা রামশরণ দাস কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের প্রত্যাহার দাবি করে এক বে-সরকারি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ছিল : "It be

recommended to His Majesty's Government that in the Council's opinion the Premier's communal Award is unacceptable and that it should be withdrawn." লালাজী অ্যাওয়ার্ডের বিভিন্ন অংশের সমালোচনা করেন ও বিশেষ করে পৃথক নির্বাচন প্রথার নিন্দা করেন ও বলেন যে "Muslims also are now veering round the view of a joint electorates.....Democracy can only survive on the basis of nationality without distinction of caste, cread or community."[১৫] বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য চৌধুরী জাফরুল্লা খাঁ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাবের জন্যই 'পৃথক নির্বাচন' ও 'ওয়েটেজ' আমদানি করতে হয়েছে। লালা রামশরণ দাস বঙ্গদেশের হিন্দুদের প্রতি অবিচারের ব্যাপার নিয়ে চৌধুরী সাহেবকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ "Here, I do concede the objection. ..but we can modify the scheme...." মিঃ ভুটা সিং শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অ্যাওয়ার্ডের প্রতিবাদ করেন। মিঃ হাসান ইমাম, যিনি এককালে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, স্বীকার করেন যে অ্যাওয়ার্ডের সংশোধন প্রয়োজন। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় ঐ প্রস্তাবের উপরে যে সকল আলোচনা হল তার বিবরণী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ৫ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনুরূপ নিন্দা প্রস্তাব তোলেন সর্দার সন্ত সিং। স্যার হরি সিং গৌর, মিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ও মিঃ এম. সি রাজা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। স্যার আব্দুর রহিম ও মি শাহ্ নওয়াজ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবের উপরে বিতর্ক শেষ না হওয়ায় প্রস্তাবটি (talked out) হয়ে যায়। ১লা আগস্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মৌলবী আবদুর সামাদ একটি বে-সরকারি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ছিল ঃ "It be conveyed to proper authorities that in the opinion of the council the system of seperate electorate is anti-national, and inconsistent with a responsible form of government, and is also highly prejudical to the minority communities, and therefore in the future constitution of the country, it should be replaced by a system of joint electorates."[১৬]

কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড ও ভারতীয় জনমত

তমিজউদ্দিন খাঁ একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সংশোধনী প্রস্তাবে মিঃ সামাদের প্রস্তাব থেকে দু একটি ছত্র বাদ দেওয়া হয় ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সহ যৌথ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়। পরেরদিন অর্থাৎ, ২রা অক্টোবরের অধিবেশনে অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি ও ভারতীয় খৃস্টান সম্প্রদায়ের নেতা রেভারেণ্ড বি. এ. নাগ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ইউরোপীয় সদস্য মিঃ টমসন, খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন ও এইচ. এস্ সরোয়ার্দি। স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ রীড্ ঘোষণা করেন যে সরকারি সদস্যগণ এই প্রস্তাবের উপরে ভোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ করবেন না। মিঃ তামিজউদ্দিন খাঁ-এর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের বিরোধী ছিল। ৭ই নভেম্বর ১৯৩২, পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন শুরু

হওয়ার সাথে সাথে রাজা নরেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে হিন্দু ও শিখ সদস্যদের তরফ থেকে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের প্রতিবাদ করে একটি বিবৃতি (statement) সভার সমক্ষে উপস্থিত করবার জন্য সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করেন। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি স্যার সাহাবউদ্দিন অনুমতি প্রদান না করে রাজা সাহেবকে বসে পড়তে নির্দেশ দেন। সভাপতির এই নির্দেশের প্রতিবাদে সভায় উপস্থিত নির্বাচিত হিন্দু ও শিখ সদস্যদের মধ্যে দুই জন ছাড়া আর সকলে সভা ত্যাগ (walkout) করেন এবং তাঁরা কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের প্রতিবাদ করে সংবাদপত্রে এক যৌথ বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন : "Our communities have expressed their dissatisfaction at the Communal Award in the press and from a thousand platforms. We condemn and place on record our emphatic protest agaisnt the communal decision."[১৭]

নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের ২০শে ও ২১শে আগস্টের অধিবেশনে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর খ্যাতনামা মিঃ নরসিংহ চিন্তামণি কেলকারের সভাপতিত্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার বার্ষিক অধিবেশনেও অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ২১শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম পার্টির তরফ থেকে অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ৩০শে অক্টোবর লক্ষ্ণৌ শহরে রাজা গজনফর আলিখান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিয়া রাজনৈতিক সম্মেলনও অ্যাওয়ার্ডের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ভারতীয় খৃস্টান সভা ১০ই অক্টোবর তারিখে একটি প্রেস বিবৃতি প্রচার করে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের নিন্দা করেন এবং বলেন "The award will act as a disruptive force within the christian church itself"। বিবৃতিটি *Times of India* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৪শে আগস্ট সংযুক্ত প্রদেশের লিবার‍্যাল (মডারেট) সভা থেকে অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রকৃতপক্ষে শুধু লীগপন্থী মুসলিম নেতৃবৃন্দ, ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় এবং একদল নৈষ্ঠিক ইংরেজভক্ত স্বয়ংনিযুক্ত নেতা ছাড়া ভারতের জনগণের অপর কোন দায়িত্বশীল অংশ কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন নি। কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে স্পষ্টত ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্যবোধকে বিপর্যস্ত করবার দুরভিসন্ধি লুকিয়ে ছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও caste ভিত্তিক গোষ্ঠীচেতনা শুধু যে পরাধীন জাতির জাতীয় ঐক্যবোধ, সংগঠন ও পুষ্টির পথ রুদ্ধ করে, তাই নয়, সম্প্রদায়গত স্বাজাত্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষকে পুষ্ট করে। তার ফলে যেমন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য সংগঠনের পথ রুদ্ধ হয়, তেমনি মেহনতকারী জনশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীচেতনার (class consciousness) বিকাশ ও পুষ্টির পথে দেয়াল খাড়া হয়। সাম্প্রদায়িক স্বার্থচেতনা শ্রেণীবোধকে ঢেকে রাখে। আলোচ্য সময়ে ভারতবর্ষে শ্রেণীবোধের বিকাশ ও পুষ্টি শুরু হয়েছে। কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড যখন ঘোষিত হয়, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা তখনও বিচারাধীন। ইংরেজেরা এক ঢিলে দুই পাখী মারার কৌশল হিসাবেই কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড রচনা করেছিল। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসার দূষিত গ্যাস্ (gas) যে সারাদেশে

পরিব্যাপ্ত হয়ে পরিণামে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে, তারও উৎস লুকানো ছিল কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে। ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো রিকর্মসের মাধ্যমে ভেদনীতিরূপে যে বিষবৃক্ষের রোপনপর্ব সমাধা হয়, কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড সেই বিষবৃক্ষ জাত পরিণত ফল। সিমুল গাছের ফল ফেটে গিয়ে যেমন চারিদিকে তুলার আঁস ছড়িয়ে দেয়, সেই প্রকার ঐ বিষবৃক্ষজাত কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডরূপ ফলগুলি ফেটে গিয়ে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও বিদ্বেষের বিষাক্ত তুলার আঁশ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। তারই পরিণতিতে দেশবিভাগ, রক্ত ও অশ্রুর প্লাবন, ব্যাপক নরমেধ ও দুঃসহ ক্লেশের সমুদ্রে অগণিত নিরপরাধ মানুষের নিমজ্জন।

কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে দোদুল্যমান মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন তা কংগ্রেস নেতৃবর্গের সাময়িক রাজনৈতিক বুদ্ধি লোপের পরিচায়ক।

কম্যুন্যাল অ্যাওযার্ড সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দোদুল্যমান মনোভাব

১৯৩২-এর আগষ্টে যখন কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড প্রকাশিত হয়, তখন কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী কারাগারে আবদ্ধ। যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁরা অন্তর্বর্তী ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দেশ অনুসরণ করে আইন-অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়নে নিরত ছিলেন। এদিকে অ্যাওয়ার্ড প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী অ্যাওয়ার্ডের অংশবিশেষ পরিবর্তনের দাবিতে অনশন ঘোষণা করেন। ঐ উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে মূল অ্যাওয়ার্ড নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন অভিমত প্রকাশ করা হয়নি। ১৯৩৩-এর ১৮ই মে ভারত সরকার গান্ধীজীকে মুক্তির আদেশ দেন। গান্ধীজী বাইরে এসে হরিজনদের সামাজিক মর্য্যাদাবৃদ্ধি ও সামাজিক বাধানিষেধের শৃঙ্খল জাল থেকে তাদের মুক্তি অর্জনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেস সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিপজ্জনক হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৩৪ সালের ১৪ই জুলাই তার কারামুক্তির আদেশ দান করেন। ইতোমধ্যে ভাবী শাসনতন্ত্রের খসড়া রূপরেখা সম্বলিত এক 'শ্বেতপত্র' (White paper) প্রকাশ করেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। পুনা চুক্তি অনুযায়ী সংশোধন সহ কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড ঐ শ্বেতপত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৩৪-এর মাঝামাঝি। এর পব কংগ্রেস একসাথে 'শ্বেতপত্র' ও কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত প্রকাশে উদ্যোগী হন। বোম্বাই শহরে ১৭ই ও ১৮ই জুন, ১৯৩৪-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে 'শ্বেতপত্র' ও কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে কংগ্রেসের মতামত ঘোষিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটীতে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় "ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্বেতপত্রে' ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় নাই এবং ঐ শ্বেতপত্রে ভাবী শাসনতন্ত্রের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের দ্বারাই নিন্দিত হয়েছে এবং ঐ পরিকল্পনা কংগ্রেসের ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর সহায়ক হবে না। একমাত্র সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংবিধান-প্রণয়নকারী সংসদ বা Constituent Assembly-র দ্বারা প্রণীত শাসন-পরিকল্পনাই 'শ্বেতপত্রেব' সন্তোষজনক বিকল্প হতে পারে।" পরবর্তী প্যারাগ্রাফে বলা হল ঃ

"The white paper lapsing the Communal Award would lapse automatically. Among other things, it will be the duty of the Constituent

Assembly to determine the representation of the important minorities and make provisions for otherewise safeguarding their intests."[১৮]

অতঃপর ঐ প্রস্তাবের মধ্যেই বলা হল যে ঃ "যেহেতু ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে তীব্র মতবিরোধ বর্তমান, অতএব ঐ সম্পর্কে কংগ্রেসের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করবার প্রয়োজন আছে। কংগ্রেস যেহেতু সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, সেই-হেতু, যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে মতবিরোধ অটুট থাকবে, ততদিন কংগ্রেস কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড গ্রহণও করতে পারে না, আবার তাকে বর্জনও করতে পারে না (can neither accept nor reject the Communal Award so long as the divisions of opinion lasts)।"

পরবর্তী অংশে আবার বলা হল ঃ "Judged by the national standard the Communal Award is wholly unsatisfactory besides being open to serious objections on other grounds."[১৯]

শেষ প্যারাগ্রাফে বলা হল ঃ "বিদেশী রাজশক্তির কাছে আবেদন করে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের কুফল সমূহকে প্রতিরোধ করা যাবে না। কেবলমাত্র সর্বসম্মত সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের দ্বারাই তার প্রতিরোধ সম্ভব।"

ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত পূর্বোক্ত প্রস্তাবের মধ্যেই দোদুল্যমানতা ও অস্থিরমস্তিষ্ক স্পষ্টত প্রতিফলিত! প্রস্তাবের এক অংশের সাথে অপর অংশের সামঞ্জস্য নাই, প্রস্তাবের বিভিন্ন অংশ পরস্পর বিরোধী। কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড যদি 'সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক' ও 'ক্ষতিকর'ই হয়ে থাকে তা হলে তাকে সোজাসুজি 'বর্জন' (reject) করতে অসুবিধা কি ছিল? 'ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ' ত প্রায় সর্বব্যাপারেই ঘটে থাকে। তার জন্য জাতীয় কংগ্রেস হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? যা 'বর্জনীয়' তাকে সরাসরি 'বর্জন' করতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে কেন কংগ্রেস? স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যমত ছিল না। আর, কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষ কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড সমর্থন করে, এ প্রকার অবস্থা ত ঘটে নি। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী অংশ কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের নিন্দা করেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা করে ইংরেজভক্ত 'সেক্টর' ছিল। তারা কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড সমর্থন করেছে। অন্য সকল ব্যাপারে যদি কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকগণকে উপেক্ষা করে থাকে, তবে এই ব্যাপারে ঐ সব গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড 'বর্জনের' অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণে বাধা ছিল কোথায়? বস্তুত কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড 'না-গ্রহণ-না বর্জনের' সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতাদের বুদ্ধিভ্রংশের পরিচায়ক। ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস জাতির প্রতি কর্তব্য পালনে অমার্জনীয় শৈথিল্য প্রদর্শন করেছিলেন।

'না-গ্রহণ-না বর্জন' প্রস্তাব কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী মহলে ও উচ্চ পর্যায়ের নেতৃমহলেও প্রচন্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বর্ষীয়ান নেতা পন্ডিত মদনমোহন মালব্য ও এম্. এস্. অ্যানে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৪-এর শেষে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার যে সাধারণ নির্বাচন হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে মালব্যজী

ও মিঃ অ্যানে কংগ্রেসের মধ্যে 'কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল' (Congress Nationalist Party) নাম দিয়ে একটি দল গঠন করেন ও ঘোষণা করেন যে ঐ দল কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড ছাড়া অন্য সর্ববিষয়ে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত অফিসিয়াল প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ঐ দল প্রার্থী দাঁড় করাবে। ঐ দলের যে সকল প্রার্থী নির্বাচিত হবেন তাঁরা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড বর্জনের দাবি তুলে ধরবেন এবং 'না-গ্রহণ-না-বর্জন' নীতির বিরুদ্ধতা করবে, অন্য সকল বিষয়ে ঐ দলের নির্বাচিত প্রার্থীরা কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে চলবে। ১৯৩৪-এর নির্বাচনে বঙ্গদেশের মোট পাঁচটি 'অমুসলমান' আসনের সবগুলিতেই 'কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল' প্রার্থী দাঁড় করান এবং সবগুলিতেই ঐ দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। অফিসিয়াল কংগ্রেসের প্রার্থীরা সকলেই পরাজিত হয়।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যে

১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে। ঐ অধিবেশনেও কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের সম্পর্কে 'না-গ্রহণ-না-বর্জন' প্রস্তাবের উপরে প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবই অনুমোদিত হয়। ঐ কংগ্রেসের মুসলিম ডেলিগেটদের মধ্যে একমাত্র মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী মিঃ আবদুল সামাদ 'না-গ্রহণ-না-বর্জন' নীতির বিরুদ্ধে ও কম্যান্যাল অ্যাওয়ার্ড সম্পূর্ণ বর্জনের অনুকূলে জোরালো বক্তৃতা করেন।

সূত্র নির্দেশ

১। Quoted from Dr P Sitaramaiya, *History of Indian National Congress*, Vol. I, p. 519.
২। *Op. cit.*
৩। *Op. cit.*, p. 520.
৪। *Op. cit*
৫। Sitaramaiya, *History of Indian National Congress*, Vol. I, p. 518.
৬। *Op. cit.*, p. 526.
৭। *Op. cit.*, p. 528
৮। *Op. cit.*, p. 538.
৯। *Op. cit.*
৯ক। Quoted from Home. Pol. File No. 3/13/33.
১০। Sitaramaiya, *History of Indian National Congress*. Vol. I, p. 528.
১১। Dr. Rajendra Prasad, *India Divided*, p. 136.
১২। Quoted from Dr. H. N. Dasgupta, *The Indian National Congress* p 180.
১৩। *Indian Annual Register 1932*, Vol. II, pp. 237-238.
১৪। *Op. cit.*, p. 239.

১৫। *Indian Annual Register, 1932*, Vol. II, p ৪1

১৬। *Op. cit.*, p. 153.

১৭। *Op. cit.*, p. 212-213.

১৮। Sitaramaiya, *History of Indian National Congress*, Vol I, p. 575.

১৯। *Op. cit.*

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভারত ভাগের পটভূমি

ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে হিন্দু বা মুসলমানের গরিষ্ঠতা লঘিষ্ঠতার বনিয়াদে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে—যারা পুরুষানুক্রমে 'ভারতীয়' বলে পরিচিত—তাদের কতক লোক অপর কতক লোকের কাছে 'বিদেশী' হয়ে যাবে। ভারতের একাংশ অপরাংশের অধিবাসীদের কাছে 'বিদেশ' বলে গণ্য হবে—এই প্রকার একটা উদ্ভট কথা ঐরূপ ঘটনা ঘটবার বিশবছর আগেও যে কেও উচ্চারণ করলে অপর লোকেরা সেটা পাগলের উদ্ভট খেয়াল বলে হেসে উড়িয়ে দিত। বস্তুত ত্রিশের দশকের প্রথম ভাগে হায়দ্রাবাদের অধ্যাপক আবদুল লতিফ অথবা বিলাতপ্রবাসী কেম্ব্রিজের ছাত্র রহমত আলির লেখনী প্রসূত হয়ে যখন 'পাকিস্তান' শব্দটি সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে তখন আমরা তাকে একটা উদ্ভট পাগলামী বলেই মনে করেছিলাম (অধ্যাপক লতিফ এবং রহমত আলি এঁদের মধ্যে কে যে পরিকল্পনাটি আগে উপস্থিত করেন তা এখন ঠিক স্মরণ হচ্ছে না)। অবশ্য ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট Independence of India Act পাশ করে যে পাকিস্তানের জন্ম দেন রহমত আলি ও অধ্যাপক লতিফের পরিকল্পিত 'পাকিস্তান'-এর সাথে তার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। লতিফ ও রহমত আলির পরিকল্পনায় ইংরাজী PAKISTAN শব্দটির মধ্যে ব্যবহৃত অক্ষরগুলি ছিল কয়েকটি ভৌগোলিক এলাকার নামের আদ্যাক্ষরের দ্যোতক। 'P' বলতে পেশোয়ার, A-তে আফগানিস্তান, K-তে কাশ্মীর, 'I' দিয়ে ইন্ডান্ (অর্থাৎ পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ) এবং 'Stan' দিয়ে বেলুচীস্থান বোঝানো হয়েছিল। অর্থাৎ ওঁদের প্রস্তাব ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচীস্থানের সাথে আফ্‌গান মুলুককে যুক্ত করে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা। এর সাথে দ্বিজাতিতত্ত্বের কোন সংস্রব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে দ্বিজাতিতত্ত্বের থিয়োরী তখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নি। ভৌগোলিক দিক দিয়ে পরস্পর সন্নিহিত কয়েকটি এলাকার জনগোষ্ঠী যারা একই ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ, একই প্রকার আচার-আচরণে অভ্যস্ত, সদৃশাত্মক ঐহিত্যের উত্তরাধিকারী, তাদেরকে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা ছিল ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। লতিফ নিজেই পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ পরিকল্পিত পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের আগে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকেও কখনও সরকারিভাবে দেশবিভাগের দাবি উত্থাপিত হয় নাই। ১৯৩৭-এও মুসলিম লীগ কতকগুলি গণপ্রজাতন্ত্রী ইউনিটের সমবায়ে গঠিত সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ফর্মূলা অনুমোদন করেন, যদিও কংগ্রেস পরিকল্পিত

'গণপরিষদের' মাধ্যমে ঐরূপ ফেডারেশন গঠন মুসলিম লীগের অভিপ্রেত ছিল না। ১৯৪০-এর পূর্বে কখনও কখনও লীগপন্থী নেতাদের কণ্ঠে ভারত ভাগের জিগীর শোনা গিয়েছে বটে কিন্তু সে শুধুই কংগ্রেসের কাছ থেকে বেশী সুযোগ-সুবিধা আদায়ের দরকষাকষির কৌশল হিসাবে।

১৯৪০ সালের ২১শে মার্চ মুসলিম লীগের বিখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হয় সারা ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে। ঐ প্রস্তাবের মধ্যে কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দের উল্লেখ ছিল না। প্রস্তাবের কার্য্যকরী অংশ অর্থাৎ ৩নং প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছিল ঃ

"......Geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial adjustments as may be necessary that the areas in which muslims are numerically in a majority, as in the north-western and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে লাহোর প্রস্তাবে যে সকল মুসলিম গরিষ্ঠতা সম্পন্ন এলাকা পরস্পর সন্নিহিত (contiguous) শুধু সেই সব এলাকা নিয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে একটি এবং পূর্বভারতে একটি—এইরূপ দুইটি বা ততোধিক পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনার মধ্যে ছিল।

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অল্পদিন পরে ডঃ আম্বেদকর তাঁর *Pakistan and Partition of India* নামক গ্রন্থে পূর্বোক্ত অভিমতের সমর্থনে বলেন ঃ

"A reference to para 3 of the resolution will show that the resolution contemplates that the areas in which the Muslims predominate shall be incorporated into independent states. In concrete terms it means that the Punjab, the N.W.F. provinces, Beluchistan and Sind in the North-West, and Bengal in the east in stead of remaining provinces of British India, shall be incorporated or independent states outside British India."

মুসলিম লীগ-রাজনীতি অকস্মাৎ পৃথক রাষ্ট্র দাবির আবর্ত্তে পতিত হল কেন সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ঐ সংস্থা গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ। স্যার সৈয়দ যে মুসলমান সমাজের নবজাগরণের একজন পুরোধা একথা অনস্বীকার্য। মুসলমানগণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং দেশের প্রশাসনিক কর্মে ও বৈষয়িক উদ্যোগে মুসলমানদের যোগ্য অংশ প্রাপ্তির আন্দোলনের তিনি প্রবর্ত্তক বললেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন শিক্ষিত হিন্দু সমাজের রাজানুগত্য সম্পর্কে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়কে সন্দেহাতুর করে তোলে এবং তাঁরা কংগ্রেসের একটা পাল্টা প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। মুসলিম লীগের জন্মকাল থেকেই ইংরেজেরা লীগকে কংগ্রেসবিরোধী পাল্টা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে পুরোপুরি কাজে লাগানোর সুযোগ লাভ করেন। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বিশেষ অবস্থা খুবই

তাৎপর্যপূর্ণ। সে অবস্থা হ'ল এই যা এ দেশে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রায়শঃ ইংরেজের অনুগত মহল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কি মুসলিম লীগ, কি হিন্দু মহাসভা—উভয় প্রতিষ্ঠানেই রক্ত যুগিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং রায়বাহাদুর, খাঁ-বাহাদুর প্রভৃতি খয়ের খাঁ শ্রেণীর লোক। সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্ম দেশের ক্রমবর্দ্ধমান স্বাধীনতা সচেতনতার প্রতিষেধক হিসাবে বরাবর কাজ করেছে। হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ উভয় সংস্থা সম্পর্কেই একথা বলা চলে। সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ছিল উচ্চ-মধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমানের শ্রেণীস্বার্থের আন্দোলন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইংরেজপ্রভুর অনুগ্রহদত্ত পিষ্টকখন্ডের ভাগবাঁটোয়ারার। সরকারি চাকুরী প্রশাসনিক উচ্চপদ, বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা কে কতটা হাতিয়ে নেবে—তারই কাড়াকাড়ি। উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক নেতারা ইংরেজের দুই বগলের তলায় থেকে ইংরেজের দেওয়া পিঠার টুকরা ভাগ করে খেয়ে আহ্লাদে আপ্লুত হয়েছে এবং উভয়েই সমস্বরে ইংরেজের জয়গান করেছে। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দলে টানতে পারে নাই। পক্ষান্তরে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী বরাবরই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এ অবস্থায় কংগ্রেস পরিচালিত ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভের আন্দোলনের প্রতিষেধক হিসাবে মুসলিম লীগকেই কোল দিতে বাধ্য হয়েছেন।

লীগ রাজনীতি বরাবর যে ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, তা হল মুসলিম সমাজকে কংগ্রেসের প্রভাবের বাইরে রাখা। কংগ্রেসের দ্বারা উত্থাপিত দাবিদাওয়ার উপরে মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাবি দাওয়ার চাপ সৃষ্টি করে কংগ্রেসের দাবিকে যতটা সম্ভব ভোঁতা করে দেওয়া এবং পরিণামে কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক ও বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা যেটুকু ভারতবাসীর ভাগ্যে আসবে, ইংরেজের অনুগ্রহের মাধ্যমে তার একটা মোটা অংশ মুসলিমদের জন্য কব্জা করে নেওয়া। ইংরেজেরাও বরাবর মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গকে এই আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে কংগ্রেসের মাধ্যমে তোমরা যেটুকু পাবে, আমরা তোমাদেরকে তার চেয়ে বেশী দেবো, তোমবা শুধু কংগ্রেসী আন্দোলনে রাশ টেনে ধরে আমাদের সাহায্য কর। উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজের অনুগ্রহের আওতায় সুখময় সুখসম্পদ ভোগ করা। তাই কংগ্রেসের প্রতি লীগ নেতারা যত বিষোদ্‌গার করেছেন হিন্দুমহাসভার প্রতি তার শতাংশের একাংশও করেন নি।

যতদিন পর্যন্ত লীগ নেতাদের মনে ইংরেজের আশ্রয় ও অনুগ্রহলাভের নিশ্চয়তা ছিল ততদিন পর্যন্ত দেশকে দুটুকরো করবার কল্পনা তাঁদের মনে উদিত হয় নি।

লীগ রাজনীতিতে মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাও মুসলিম লীগের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। মিঃ জিন্না প্রথমে ছিলেন লীগবিরোধী। স্যার সৈয়দের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধবাদী। ১৯১৩ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁর বিদ্যাবত্তা, প্রখর বুদ্ধি ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব তাঁকে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন করে তুলেছিল। তাই ধনবান্ প্রতিষ্ঠাবান্ ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতাদের ভীড়ের মধ্যে তিনি সুখী হতে পারেন নাই। তিনি এলেন কংগ্রেসে। সেই কংগ্রেস ১৯২০ সালে গণ-আন্দোলনে নেমে পড়লো।

গান্ধীজীর প্রভাবে কংগ্রেস রাজনীতিতে এক তাৎপর্য্যপূর্ণ পট পরিবর্তন ঘটলো। তখন কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃপদ রাখতে গেলে অনেক কিছু ছাড়তে হয়, অনেক ক্লেশ সহনের পথে নামতে হয়। মিঃ জিন্না এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯২০-র পরবর্তী কংগ্রেসে নেতৃপদ বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁকে কংগ্রেস ছাড়তে হল। এদিকে ঐ সময়ে লীগ নেতৃত্বে আসীন থাকাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো। কারণ কংগ্রেস ১৯২০ সালে খিলাফৎ আন্দোলনকে নিজেদের প্রোগ্রামভুক্ত করে নেওয়ায় সাময়িকভাবে লীগ নেতৃত্বেরও পরিবর্তন ঘটলো। লীগের কর্তৃত্ব এসে গেল জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দখলে। বাধ্য হয়ে জিন্না সাহেবকে প্রকাশ্য রাজনীতির মঞ্চ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে নিতে হল। কিন্তু মিঃ জিন্নার মত আত্মসচেতন ও প্রচুর ক্ষমতাশালী নেতার পক্ষে দীর্ঘদিন এই প্রকার নিঃসঙ্গ নির্বাসনের ভার বহন সম্ভব নয়। তিনি স্থির করলেন তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাবেন এবং বিলাতে গিয়ে আইন ব্যবসার পরিচালনা করবেন। এদিকে কামালপাশা গ্রীসের হাত থেকে তুর্কীরাজ্য উদ্ধার করে নিজেই খালিফাকে অপসৃত করলেন। অসহযোগ আন্দোলনে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং কামালপাশা কর্তৃক তুর্কীর খিলাফতের উচ্ছেদ ঘটায় অসহযোগ জোয়ারে যে সব মুসলিম নেতা জাতীয়তাবাদী মঞ্চে এসে ভীড় জমিয়েছিলেন তাঁরা একে একে ঝরে পড়তে লাগলেন। এই অবস্থা মিঃ জিন্নার সম্মুখে প্রকাশ্য রাজনীতির মঞ্চে পুনঃপ্রবেশের সুযোগ এনে দিল। তিনি লীগ রাজনীতির মঞ্চে এসে নূতন রাজনীতিক জীবন শুরু করলেন। এই সময়ে স্যার ফজ্‌লে হোসেন, স্যার মহম্মদ শফী, মৌলানা মহম্মদ আলি প্রভৃতির মৃত্যু ঘটায় লীগের উপরে মিঃ জিন্নার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কৃত হল।

কিন্তু জিন্না-নেতৃত্বাধীন লীগও দীর্ঘদিন দেশভাগের দাবি তোলে নি। ক্রমাগত অবাস্তব সাম্প্রদায়িক দাবি উত্থাপন ও দেশের মধ্যে সর্বদা তপ্ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বজায় রেখে বিপক্ষদলের স্নায়ুকেন্দ্রের উপর দুঃসহ চাপ সৃষ্টি করবার প্রাচীন রণকৌশলের মধ্যে তিনি নূতন বেগ সঞ্চার করলেন মাত্র।

১৯৩৫-এর নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৩৭-এ। এই নির্বাচনে লীগের সভাপতিরূপে মিঃ জিন্না মুসলিম সমাজের সর্বভারতীয় অবিসংবাদী নেতৃত্বে নিজের প্রতিষ্ঠাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য প্রচণ্ডবেগে আসরে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু নির্বাচনী ফল তাঁর বিপক্ষে গেল। মুসলিম লীগ প্রার্থীগণ কোথাও গরিষ্ঠসংখ্যক মুসলিম আসন সংগ্রহ করতে পারলেন না। বাংলায় ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি লীগের চেয়ে বেশী আসন লাভ করলো। পাঞ্জাবে মুসলিম আসনের গরিষ্ঠাংশ গেল মিঃ খিজির হায়াৎ খাঁর পার্টির কবলে। বিহারে মিঃ ইউনুসের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি পেলো বেশী সংখ্যক মুসলিম আসন। সংযুক্ত প্রদেশে ছত্রীর নবাব বাহাদুরের কৃষক পার্টি এবং আসামে স্যার মহম্মদ সাদুল্লার ইউনিয়নিস্ট পার্টি গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলিম আসন লাভে সমর্থ হল। কিন্তু এই অসাফল্যে দৃঢ়চেতা মিঃ জিন্না ভেঙ্গে পড়লেন না। তিনি নূতন রণনীতির মহড়া দিতে লাগলেন। সে নূতন নীতি হল বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রী মন্ডলীর বিরুদ্ধে নানা কল্পিত অভিযোগ সৃষ্টি করে ক্রমাগত মুসলিম জনগণের চিত্তে বিদ্বেষের বীজ বপন করা, কংগ্রেসীদের সব কাজের

মধ্যে মুসলিম বিরোধিতার ভূত আবিষ্কার করে মুসলিম জনমনে নিরাপত্তাবোধের অভাব সৃষ্টি করে তাদেরকে মরিয়া করে তোলা এবং ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের মনে ভারতের হিন্দু-মুসলিম বিরোধের চিরস্থায়িত্ব এবং ভয়াবহত্বের কৃত্রিম চিত্র এঁকে দেওয়া। মিঃ জিন্নার এই নূতন রণকৌশল বহুল পরিমাণে সফল হল। কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই রণকৌশলের উপযুক্ত মোকাবিলার কোন পথ আবিষ্কার করতে পারলেন না। কংগ্রেস নেতৃবর্গের এই ব্যর্থতার ফলে মুসলিম জনমনে বিদ্বেষ-বিষের পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠলো।

এই অবস্থায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে সারা বিশ্বের রাজনৈতিক স্থিতিস্থাপকতাকে বিপর্য্যস্ত করে তুললো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক পটভূমি ওলটপালট করে দেয়। গ্রেট ব্রিটেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নূতন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দীর্ঘকাল পূর্ব থেকে ভারতবর্ষের রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ইংরেজ যদি আবার একটা বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তা হলে ভারতবর্ষকে আর অধীনতাপাশে আবদ্ধ রাখা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলতি থাকাকালে অথবা তার নিবৃত্তির অব্যবহিত পরে ভারত স্বাধীন হবেই। কংগ্রেসী এবং অকংগ্রেসী রাজনীতিকেরা সমভাবেই এ বিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতারা (যাঁরা লীগ রাজনীতির খুঁটি ছিলেন) তাদের নিঃসঙ্গতা এবং অসহায়ত্ববোধ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁরা বুঝতে পারলেন, ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন, ইংরেজ আর থাকছে না। তাঁরা এও বুঝতে পারলেন যে স্বাধীনতা যেভাবে আসুক না কেন, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে কংগ্রেসের হাতে। যদি সংগ্রামের চাপে স্বাধীনতা আসে তা হলে ক্ষমতা হস্তান্তর একমাত্র কংগ্রেসের হাতেই হতে পারে, কারণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে এবং করছে কংগ্রেস। আর যদি ইংরেজ বে-কায়দায় পড়ে নিজে থেকে দেশের শাসনভার দেশবাসীর হাতে হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হয় তা হলে সে কংগ্রেসের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে, কারণ অপর কারও হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করলে ভারতবর্ষের জাতীয় মানসকে তুষ্ট করা যাবে না এবং তা না করতে পারলে ইংরেজের কোন লাভ হবে না। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ চলে যাচ্ছে এবং কংগ্রেসের হাতে ভারতবর্ষের সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত হতে চলেছে। লীগ নেতারা দেখতে পেলেন তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। এতদিন ইংরেজ ছিল তাঁদের খুঁটি। সেই খুঁটি সরে গেলে তাঁরা দাঁড়াবেন কোথায়। ইংরেজ চলে যাওয়ার ফলে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যোগ ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির যে বিরাট সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে সেখানে লীগপন্থী উচ্চবিত্ত মুসলিম নেতাদের প্রবেশের পথ থাকবে না। তার যে অংশটুকু মুসলিমদের হাতে যাবে তা পাবে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা। বুর্জোয়া অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এমনিতেই হিন্দুরা এগিয়ে রয়েছে। পর-শাসনমুক্ত ভারতে বুর্জোয়া অর্থ বিনিয়োগের যে নূতন ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে তা সহজেই হিন্দুরা দখল করে ফেলবে, ২/৪ জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান হবে তার জুনিয়র পার্টনার। পর-শাসনমুক্ত ভারতে যে আর্থিক দৌড় শুরু হবে, তাতে মুসলিম বুর্জোয়া ও মুসলিম উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশ পিছু হঠতে বাধ্য হবে এবং

বুর্জোয়া অর্থনীতির আমোঘ নিয়মে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই অবস্থায় অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত মুসলিম নেতাদের মনে এলাকা ভাগাভাগি করে নেওয়ার থিওরীটা বেশ সাড়া জাগালো। তাঁরা দেখলেন ঐ থিয়োরীর মধ্যেই রয়েছে তাঁদের জীয়নকাঠি। ভারতবর্ষ থেকে খানিকটা এলাকা পৃথক করে নিয়ে সেখানে মুসলমানের নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সেই এলাকাটা মুসলিম বুর্জোয়া ও হবু বুর্জোয়াদের পক্ষে পুঁজিবাদী অর্থ বিনিয়োগের একটা নিরাপদ ক্ষেত্র হতে পারে। অতএব দ্বিজাতিতত্ত্বের বনিয়াদে ভারত বিভাগ চাই। ভারত বিভাগই সঙ্কট মোচনের একমাত্র পন্থা। ১৯৪০ সালের ২৪শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই ব্যবস্থাটি অনুমোদিত হল।

গোড়ার দিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও ভারত ভাগের প্রস্তাবকে আমল দেন নাই। এদিকে ১৯৪২-এর আগষ্টে কংগ্রেস অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ব্যাপক গণ-সংগ্রামের ডাক দিল। নেতারা কারারুদ্ধ হলেন, জনতা নিজের হাতে লড়াইয়ের ঝান্ডা তুলে নিল। সংগ্রাম শুরু করবার প্রাক্কালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের দিল্লী প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন ঃ

"The Congress cannot agree to any proposal to disintegrate India by giving liberty to any component state or territorial unit to secede from the Indian union or federation. The congress has been wedded to Indian freedom and unity and any break in the unity.....will be injurious to all concerned and exceedingly painful to contemplate."

কংগ্রেসের এই সুস্পষ্ট অভিমতকে উপেক্ষা করে ইংরেজরা ছেলের হাতের মোয়ার মত লীগের হাতে পাকিস্তান তুলে দেবে এমন অবাস্তব আশা মুসলিম লীগের নেতারা পোষণ করতেন না। সুতরাং তাদের হতাশা ও অসহায়ত্ববোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। কংগ্রেসকে নেয়াতে না পারলে ইংরেজের হাত থেকে 'সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র' পাওয়া যাবে না—এটা তাঁরা জানতেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মুখে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ব্যাটারীতে তীব্রতর বেগ সঞ্চারের দ্বারা কংগ্রেসের স্নায়ুকেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টির রণকৌশলও তেমন কার্য্যকরী হল না। অতএব লীগের রাজনীতি প্রায় চড়ায় আটকে পড়ার মত অবস্থায় উপনীত হল।

এই অবস্থার কথা বর্ণনা করে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির লিখেছেন ঃ

"The fortunes of the League seemed to be very low in the first half of 1944, but events took a dramatic turn after the release of Mahatma Gandhi in the summer..... After incarceration of congress leaders, the Muslim League steadily lost ground and Mr Jinna's personal prestige had suffered..... Nationalist forces amongst Muslims were everywhere becoming stronger when Mahatma Gandhi's decision to deal with Mr. Jinna on equal terms transformed the scene."

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারে উদ্যোগী হয়েছিলেন গান্ধীজী নিজে। তাঁর পক্ষে এ কাজ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সুবিবেচনাপ্রসূত হয়েছিল কি না তা নিয়ে

অবশ্যই তর্কের অবকাশ আছে। এই সাক্ষাৎকারের একমাত্র ফল হয়েছিল জিন্না সাহেবের হারানো প্রেস্টিজের পুনরুদ্ধার এবং লীগ রাজনীতির ধমনীতে নূতন রক্ত প্রবাহের সঞ্চার। ভারতবর্ষে আর একটি শক্তিও এ সময়ে (কিসের তাগিদে জানি না) ভারত বিভাগের দাবির পিছনে মদত যুগিয়েছিল। এই শক্তি হল তৎকালীন 'জনযুদ্ধ'বাদী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি। ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই পার্টি 'কংগ্রেস-লীগ এক হউক' স্লোগানে চীৎকারপ্রবণ হয়ে ওঠে। এই স্লোগানের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হল কংগ্রেস হিন্দু পক্ষ এবং লীগ মুসলিম পক্ষ। স্বাধীনতা পেতে হলে এই দুই পক্ষকে সমঝোতায় আসতে হবে। এই পার্টি প্রকাশ্যে ভারত বিভাগ সমর্থন করে। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের ব্যর্থতার পর এই পার্টি 'পুনরায় জিন্না-গান্ধী সাক্ষাৎকার চাই' নাম দিয়ে পুস্তিকা ছাপিয়ে বিতরণ করে। সেই পুস্তকে ভারত বিভাগ সমর্থন করা হয় এবং 'পূর্ববঙ্গের মুসলমান'-কে একটা পৃথক জাতি বলে বর্ণনা করা হয়।

১৯৪০-এ ভারত ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা স্বত্বেও ঐ প্রস্তাব যে কার্য্যকরী করা হবে, এমন ভরসা লীগ নেতাদের ছিল না। ১৯৪২-এ ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময়ে মিঃ জিন্না ভারত ভাগের দাবি উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু তার পিছনে তাঁর নিজের মনের জোর ছিল না। কারণ তিনি সাথে সাথে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস যদি ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবে সম্মতি ঘোষণা করে তবে লীগও সেটা মেনে নেবে। তার অর্থই এই যে পার্টিশনের দাবিটা উপস্থিত করা হয়েছিল শুধু দরকষাকষির কৌশল হিসাবে। ১৯৪৬-এ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মেনে নিতেও জিন্না সাহেব রাজী ছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল অখন্ড ভারতের ভিত্তিতে। কিন্তু সংকটের পরিস্থিতিতে দ্বিধাগ্রস্ত কংগ্রেস সংগ্রামী আত্মপ্রত্যয় হারালো। তার মনোভঙ্গি যেন এমন হলো যে ঐক্যবদ্ধ ভারত অবশ্যই যাচনীয় হলেও, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতাকে স্থগিত রাখার চেয়ে ভারতের এক বৃহৎ অংশের অনুকূলে স্বাধীনতা হস্তগত করাই কাম্য। কাজেই, পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিরোধিতা দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে।

কংগ্রেস নেতাদের এই মনোভাব মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন তাঁর প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে আর সে খবর জিন্না সাহেবের কানে পৌঁছানোর পক্ষেও কোন বাধা রইলো না। জিন্নাসাহেব স্থির নিশ্চিত হলেন যে কংগ্রেসের এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্নায়ুকেন্দ্রের উপর আর একটু চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই তাঁর আশা সফল হবে। এই উপলব্ধির ফল ডিরেক্ট অ্যাক্‌সন—পাঞ্জাবে বাংলায় সাম্প্রদায়িক হিংসার নারকীয় বীভৎসতা—আকস্মিক নয় সুপরিকল্পিত। কংগ্রেস নেতাদের চিত্তদৌর্বল্যের ফাঁক দিয়েই ভারতখন্ডন কার্য্যকর হয়। কংগ্রেস নেতারা যদি দেশ ভাগের বিরোধিতা বিষয়ে তাঁদের পূর্বের দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারতেন তবে দেশ দ্বিখন্ডিত হত না।

এখানে গান্ধীজীর ভূমিকার কথা একটু উল্লেখ না করলে প্রসঙ্গের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। গান্ধীজী কোনদিনই দেশ বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। কংগ্রেস নেতারা দেশ ভাগ স্বীকার করে নেওয়ার আগে ও পরে কোন সময়েই গান্ধীজী বিভাগ সমর্থন করেন নাই। তিনি ছয়মাস সময় চেয়েছিলেন। অবশ্য গান্ধীজী তাঁর নিজ পরিকল্পনা অনুসারে ছয়

মাস বা একবছর মুসলিম প্রধান এলাকায় ঘুরে ঘুরে তাৎকালিক মুসলিম মনোভঙ্গীর পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করলেই যে সে চেষ্টা সফল হ'ত এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু কংগ্রেস যদি দেশ ভাগ বিরোধিতার ব্যাপারে আগের দৃঢ়তা বজায় রাখত তবে কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করে দেশের উপর ভাগ চাপিয়ে দেওয়ার সাহস ইংরেজের হ'ত না। সে ক্ষেত্রে অবিভক্ত ভারতের কাঠামো ঠিক রেখেই ইংরেজরা ভারতের সাথে চূড়ান্ত ফয়সালা করতে বাধ্য হতেন। মিঃ এটলীর অস্থিরতা থেকেই প্রমাণিত হয় যে ঐ ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থের তাগিদেই ভারতের সাথে অবিলম্বে চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলতে সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

অধৈর্য্য কংগ্রেস নেতারা যখন বুঝলেন দেশকে ভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে গান্ধীজীর সম্মতি কিছুতেই আদায় করা যাবে না তখন তাঁরা গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে লাগলেন। দেশ ভাগ প্রস্তাবে সম্মতি দান করবার পর রাত্রি আটটায় নেহরু ও প্যাটেল মোটরে করে এসে গান্ধীজীকে জানিয়ে গেলেন—'আমরা দেশ ভাগ প্রস্তাব মেনে নিয়েছি'। গান্ধীজী বিস্মিত, ব্যথিত হতবাক্। নেহরু ও প্যাটেল ঐ সংবাদ জানিয়েই আর কালবিলম্ব না করে স্থানত্যাগ করলেন। গান্ধীজী ব্যথিত চিত্তে কিছুকাল চুপ করে থেকে 'কুছ্ তো কবনাই হোগা' বলে গাড়ী নিয়ে ছুটলেন মাউন্টব্যাটেনের কাছে। গান্ধীজী দেশ ভাগ প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার কথা তুলতেই মাউন্টব্যাটেন হেসে বললেন : "But Mr Gandhi. don't you see that the Congress is not with you today—it is with me!"*

গান্ধীজীর শেষ চেষ্টা শেষ হয়ে গেল! দেশ দ্বিখণ্ডিত হল। ৩রা জুন ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন, নেহরু, জিন্না এবং সর্দার বলদেব সিং একযোগে রেডিও মারফত ঘোষণা করলেন—ভারত ভাগের প্রস্তাব সকল পক্ষ মেনে নিয়েছেন।

২০শে জুলাই ১৯৪৭ গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় লিখলেন :

"Neither the Hindus nor the Muslims are happy over what is happening before their heepless selves. This is first hand evidence under the Hindus and Muslims who daily see me or correspond with me, are deceiving me. But—it is a big 'but'—I seem to be aiming at the impossible. Now that British intervention has done the trick, how can the League be expected to come down to their advesεries and produce an agreed settlement as between brother and friends."

অনেকে অভিযোগ করেছেন—ঐ সময়ে গান্ধীজী দেশ ভাগ রদ করবার জন্য প্রায়োপবেশন করলেন না কেন? ১৫ই তারিখের হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজী এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। ঐ জবাব যে খুব যুক্তিসহ তা নয়। ঐ জবাব উল্লেখ করে অধ্যাপক নির্মল বসু বলেছেন : "He felt that he must be steadfast in the midst of fire raging round

* এইসব ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ আমি প্রখ্যাত গান্ধীবাদী দার্শনিক অধ্যাপক নির্মল বসুর মুখে যেমন শুনেছি তেমন লিখলাম। নির্মলবাবু ঐ সময়ে গান্ধীজীর একান্ত সচিব ছিলেন এবং সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর সামনেই ঘটেছে।

him, and prove his faith in the ultimate triuph of truth."

এ ভাষা হতাশার ভাষা। যে গান্ধীজী আজীবন দৃঢ়চেতা, সংগ্রামী, যার উদাত্ত আহ্বানে বারে বারে ভারতের জনসমুদ্র উথ্‌লে উঠেছে—দেশভাগের প্রাক্কালে তিনি আপন বিশ্বস্ত শিষ্যবর্গের দ্বারা পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত, আশাহত, ভগ্নহৃদয়—আপন অতীতের কঙ্কালমাত্র!

দেশ দুভাগ হল—তার জন্য দায়ী করব কাকে? ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের তাগিদ জনিত অস্থিরতা? উপরতলার কংগ্রেস নেতাদের ধৈর্যহীনতা এবং অবিলম্বে গদী দখলের লোভ? স্নায়ুযুদ্ধ পরিচালনায় জিন্না সাহেবের সময়োচিত ও সতর্ক পদক্ষেপ? অথবা এ সব কিছুর যোগফল?